NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

ELECTIVE ZOOLOGY
HONOURS

EZO - 09

Biophysics and Biometry

Blocks - 1 & 2

প্রাক্‌কথন

নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণের লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই, ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয়ঃ প্রাণীবিদ্যা

সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম : পর্যায় : EZO 09 : 01

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1	ড. সুপ্রীতি সরকার	ড. বিভাস গুহ
একক 2-7	ঐ	ড. সুকন্যা সিন্‌হা

পাঠক্রম : পর্যায় : EZO 09 : 02

একক 8	ড. নির্মল কুমার সরকার	ড. বুদ্ধদেব মান্না
একক 9-11	ড. দীপক কুমার সোম	ঐ
একক 12-14	ড. সুজয় কুমার মুখোটি	ঐ

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EZO – 09

(সাম্মানিক স্তর)

পর্যায় 1

প্রাণ-পদার্থবিদ্যা

একক 1 ❑ প্রাণ-পদার্থবিদ্যা সম্পর্কিত ধারণা 7 – 17

একক 2 ❑ তাপগতিবিদ্যা 18 – 26

একক 3 ❑ আলোক অণুবীক্ষণ তত্ত্ব 27 – 39

একক 4 ❑ ফ্রেজ কনট্রাস্ট ও প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ তত্ত্ব 40 – 54

একক 5 ❑ ট্রান্সমিশন এবং স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ তত্ত্ব 55 – 70

একক 6 ❑ ইলেকট্রোফোরেসিস এবং ক্রোমাটোগ্রাফি 71 – 88

একক 7 ❑ কোষ ভগ্নাংশকরণ 89 – 96

পর্যায় 2

প্রাণমিতি

একক 8 ❑ জৈব পরিসংখ্যান ঃ নমুনা ও সমগ্রক 97 – 115

একক 9 ❑ মধ্যগামিতা ও তার পরিমাপকসমূহ 116 – 133

একক 10 ❑ বিস্তৃতি ও সমক ভ্রান্তি 134 – 147
একক 11 ❑ সম্ভাবনা 148 – 155
একক 12 ❑ প্রস্তাবনা ও পরীক্ষণ 156 – 166
একক 13 ❑ সহগতি ও নির্ভরণ 167 – 173
একক 14 ❑ ডেস্কটপ প্রক্রিয়া পরিগণনা 174 – 179

একক 1 ❐ প্রাণ-পদার্থবিদ্যা সম্পর্কিত ধারণা

গঠন ঃ

1.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

1.2 পদার্থের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও জীববিজ্ঞানে উদাহরণ

- 1.2.1 দশা ও উপাদান
- 1.2.2 ব্যাপন
- 1.2.3 ব্রাউনীয় গতি
- 1.2.4 সান্দ্রতা
- 1.2.5 থিতানো
- 1.2.6 পৃষ্ঠটান
- 1.2.7 দ্বিতড়িৎ ধ্রুবক
- 1.2.8 কোলয়েড
- 1.2.9 তেজস্ক্রিয়তা
- 1.2.10 হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব

1.3 জীবপদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত কিছু কলাকৌশল ও জীববিজ্ঞানে তাদের প্রয়োগ

- 1.3.1 এক্স-রশ্মি আবর্তন
- 1.3.2 এন.এম.আর স্পেকট্রোস্কোপ
- 1.3.3 অটো রেডিওগ্রাফি
- 1.3.4 অণুবীক্ষণ তত্ত্ব
- 1.3.5 ক্রোমাটোগ্রাফি
- 1.3.6 ইলেকট্রোফোরেসিস
- 1.3.7 কোষ ভগ্নকরণ
- 1.3.8 তাপগতিবিদ্যা
- 1.3.9 লেসার রশ্মি ও হলোগ্রাফি

1.4 প্রশ্নাবলী

1.5 উত্তরমালা

1.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা ঃ জীববিজ্ঞানে পদার্থবিদ্যার ভূমিকা সংক্রান্ত আলোচ্য বিষয়কে এককথায় বায়োফিজিক্স (Biophysics) বা জীবপদার্থবিদ্যা বলা যায়। এই বিষয়কে জীববিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা যায় না, বরং জীবপদার্থবিদ্যা উক্ত দুই বিষয়ের মধ্যে সেতুর ভূমিকা পালন করে। এই বিষয়ের সাহায্যে প্রধানত কোষের বিভিন্ন অংশের আণবিক গঠন, তাদের পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ ; কোষের বিভিন্ন ভৌত কার্যাবলীর পরিবর্তন প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। বিংশ শতকে জীববিজ্ঞান প্রবেশ করে তার নবতম অধ্যায়ে। জীববিজ্ঞানের এই অভূতপূর্ব উন্নতির সাথে সাথে এই বিষয়ের চর্চা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জীববিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত পদার্থবিদ্যার বিষয় আলোচনা, জীববিদ্যারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গৃহিত হয়েছে। কোষের সাধারণ গঠন ও বর্ণনা যেমন জীববিজ্ঞান থেকে জানা যায়, সেরকম কোষের বিভিন্ন যৌগ ও পদার্থরা কিভাবে সজ্জিত আছে বা তাদের সজ্জাবিন্যাসের পেছনে কি নীতি আছে, এসব আমরা জীব পদার্থবিদ্যার সাহায্যে জানতে পারি। এই অধ্যায়ে পদার্থের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচিত হবে যা জীবদেহের সর্বত্র প্রযোজ্য। এছাড়া, পদার্থবিদ্যার নীতিতে প্রতিষ্ঠিত কিছু কলাকৌশল জানতে পারব, যাদের সাহায্যে কোষের গঠন পর্যবেক্ষণ করা যায়, কোষের বিভিন্ন অংশদের পৃথক করা যায় এবং কোষের অংশদের ও কার্যপ্রণালীকে পরিমাপ করা যায়।

উদ্দেশ্য ঃ কোন বিষয় সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানকে ঐ বিষয়ের বিজ্ঞান বলা হয়। বিষয় সম্পর্কিত বিশদ জ্ঞান কোনও নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। যেমন, পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা জানতে হলে সেই সময়কার পৃথিবীর ভৌগোলিক পরিবেশ জানা উচিত, কেননা নির্দিষ্ট ভৌগলিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল একটি বিশেষ সভ্যতা। এইভাবে ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যে যেমন রয়েছে পারস্পরিক যোগাযোগ, সেইভাবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়সমূহের মধ্যেও আছে নিকট সম্পর্ক। প্রাণযুক্ত জীব নিয়ে মূলত আলোচনা করে জীববিদ্যা আবার পদার্থবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হল পদার্থ ও শক্তি ; রসায়নবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হল যৌগের গঠন ও বিক্রিয়া প্রভৃতি। জীবদেহের বহিরাকৃতি বর্ণনার পর ক্রমশ গভীরতার দিকে প্রবেশ করলে দেখা যায় যে প্রতিটি জীবদেহেই রয়েছে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব যৌগ এবং মৌল। এদের মধ্যে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে একাধিক বিক্রিয়া ও শক্তির রূপান্তর। এসব জানতে হলে অবশ্যই চাই পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার সাহায্য। বর্তমান অধ্যায়ে জীববিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার সম্পর্ক ও সহায়তার কথা আলোচনা করা হবে।

1.2 পদার্থের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও জীববিজ্ঞানের উদাহরণ (Common Properties of Matter and Biological Examples)

1.2.1 দশা ও উপাদান (Phase and Components)

প্রতিটি পদার্থই ভৌতভাবে অন্য পদার্থ থেকে পৃথক কোনও একটি নির্দিষ্ট দশা বা অবস্থায় থাকে। যেমন—তরল বা কঠিন বা গ্যাসীয় দশা। এক বা একাধিক পদার্থের স্বতন্ত্র সম্বন্ধকে সিস্টেম বলা হয়।

সমসত্ত্ব সিস্টেমে একই উপাদান, একই দশায় অবস্থান করে কিন্তু অসমসত্ত্ব সিস্টেমের উপাদানেরা বিভিন্ন দশায় অবস্থান করতে পারে।

জীবজগতে উদাহরণ (Biological Example) : প্রতিটি জীব প্রকৃতপক্ষে বহু উপাদানে গঠিত অসমসত্ত্ব একটি সিস্টেম, যার মধ্যে বিভিন্ন উপাদান বিভিন্ন দশায় অবস্থিত থাকে। তবে জীবের স্বাভাবিক কাজকর্ম বজায় রাখার জন্য, জৈব অণুরা সবসময় একটি নির্দিষ্ট দশায় বর্তমান থাকে। যেমন—বিপাকীয় কাজে দ্রাবকের ভূমিকা পালনের সময় জল তরলরূপে থাকে। কিন্তু তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় সেই জল বাষ্পাকারে ত্বক থেকে নির্গত হয়।

1.2.2 ব্যাপন (Diffusion)

পদার্থের অণু বা আয়ন, তাদের নিজস্ব গতিশক্তির ফলে ঘনতর অংশ থেকে লঘুতর অংশের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাকে ব্যাপন বলে। প্রাপ্তস্থানের সর্বত্র ঘনত্ব এক না হওয়া পর্যন্ত ব্যাপন চলতে থাকে। পদার্থের কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় সব অবস্থাতেই ব্যাপন হয়। সংশ্লিষ্ট পদার্থের চাপ, অণুর সংখ্যা, আয়নের পরিমাণ প্রভৃতির পার্থক্য হলেই ব্যাপন ঘটতে পারে।

জীবজগতের উদাহরণ : জীবদেহের বিভিন্ন কাজ ব্যাপন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যেমন, শ্বাসকার্যের সময় ফুসফুসীয় বায়ুথলির বায়ু ও রক্তজালিকার রক্তের মধ্যে CO_2 এবং O_2-এর আংশিক চাপের পার্থক্যের জন্য ব্যাপনের মাধ্যমে এই গ্যাসের আদান-প্রদান হয়। ব্যাপনের মাধ্যমেই কোষসমূহের মধ্যে খাদ্যকণা, হরমোন ও অন্যান্য বস্তু প্রবেশ করে। আবার কোষপর্দার মধ্য দিয়ে আয়নের পরিবহন নির্দিষ্ট কিছু প্রোটিনের (আয়ন গেটেড চ্যানেল ion gated channel) সাহায্যে হয়ে থাকে। ঘনত্বের বিপরীতে অর্থাৎ লঘুতর অংশ থেকে ঘনতর অংশের দিকে বস্তুর ব্যাপন প্রধানত শক্তির (ATP) বিনিময়ে বিশেষ কিছু প্রোটিনের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। উদ্ভিদদেহে জলের সংবহন সম্পূর্ণভাবে ব্যাপনের ওপর নির্ভরশীল।

1.2.3 ব্রাউনীয় গতি (Brownian Movement)

বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রাউন প্রত্যক্ষ করেন যে পদার্থের অণুগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বদাই বিশৃঙ্খল গতিতে থাকে। এই গতির দিক সর্বদাই পরিবর্তিত হয়। এই গতি ব্রাউনীয় গতি নামে পরিচিত। পদার্থের ব্যাপন ধর্মের সঙ্গে ব্রাউনীয় গতি সম্পর্কযুক্ত।

জীবজগতের উদাহরণ : বিভিন্ন জৈব যৌগ, যেমন—প্রোটিন, লিপিড, লাইপোপ্রোটিন, নিউক্লীয় অম্ল, রাইবোজোম প্রভৃতি ব্রাউনীয় গতির কারণেই কোষের প্রোটোপ্লাজমের সল (Sol) অংশে সমানভাবে ছড়িয়ে থাকে ; এক জায়গায় ঘনীভূত হয় না।

1.2.4 সান্দ্রতা (Viscosity)

যে অন্তঃবাধা তরল পদার্থের অণুদের স্বাধীনপ্রবাহে বাধা দেয় তাকে সান্দ্রতা বলা যায়। তরল

পদার্থের বিভিন্ন স্তরে ঘর্ষণজনিত বাধার ফলেই সান্দ্রতা সৃষ্টি হয়। সান্দ্রতা তরলের তাপমাত্র, ঘনত্ব এবং দ্রবণে দ্রাবের অনুপাত, আয়তন ও আকার, দ্রবণের কলয়েড অবস্থা প্রভৃতির ওপর নির্ভরশীল।

জীবজগতের উদাহরণ ঃ রক্তরসের সান্দ্রতা, বিশেষ কিছু প্রোটিনের (যেমন-ফ্রাইব্রিনোজেন) পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। রক্তরসের সান্দ্রতা পরিমাপ করে বিভিন্ন রোগ নির্ণয় করা সম্ভব। যেমন, ভার্টিগো (vertigo), রেটিনাতে রক্তক্ষরণ, হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে রক্তরাসের সান্দ্রতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবে রক্তরসের সান্দ্রতা ও লোহিত কণিকার সংখ্যার ওপর রক্তের সান্দ্রতা বিশেষভাবে নির্ভর করে। পলিসাইথেমিয়া রোগে, রক্তের সান্দ্রতা ও লোহিত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু রক্তাল্পতা রোগে উভয়ই হ্রাস পায়। রক্তের সান্দ্রতা, হৃৎপিণ্ডের কার্যক্ষমতা ও রক্তনালীতে রক্তের গতিবেগকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

1.2.5 থিতানো (Sedimentation)

অভিকর্ষ বলের টানে সব পদার্থের কণার মধ্যেই এক নাগাড়ে নীচের দিকে তাদের ঘনত্বের মাত্রা অনুসারে থিতিয়ে পড়ার প্রবণতা থাকে। বস্তুর থিতিয়ে পড়ার বৈশিষ্ট্য, কণাদের ভরের (mass) সাথে সমানুপাতে কিন্তু পরমশূন্য তাপমাত্রা ও সান্দ্রতার সাথে ব্যাস্তানুপাতে সম্পর্কিত। যেমন—কণার ভর বৃদ্ধি পেলে বস্তু তাড়াতাড়ি থিতিয়ে পড়ে। প্রতি একক পরিমাপের উচ্চতা বৃদ্ধিতে (unit rise in height), কোনো বস্তুর থিতিয়ে পড়ার পরিবর্তনকে থিতানোর হার (rate of sedimentation) বলা হয়।

জীববিদ্যায় উদাহরণ ঃ লোহিত কণিকার থিতানোর হার (erthrocyte sedimentation rate বা ESR), বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন জীবাণু সংক্রমণে রক্তরসে ফাইব্রিনোজেন ও গ্লোবিউলিন প্রোটিনের বৃদ্ধিতে, অতিকায় লোহিত কণিকার উপস্থিতিতে রক্তরসে লোহিত কণিকার থিতানোর হার অস্বাভাবিক হয়। এই অস্বাভাবিকত্ব বিভিন্ন রোগের উপস্থিতি নির্দেশ করে।

1.2.6 পৃষ্ঠটান (Surface Tension) ঃ

কোনও তরলকণার পৃষ্ঠতলের অন্তর্ভাগে লম্বভাবে পতিত যে বল পৃষ্ঠতলকে কণার কেন্দ্রের দিকে টেনে রাখে তাকে পৃষ্ঠটান বলা হয়। পৃষ্ঠটানের জন্যই তরল পদার্থের কণারা প্রায় গোলাকার থাকে।

জীবজগতে উদাহরণ ঃ পিত্তলবণ, ফ্যাটকণার পৃষ্ঠটানকে কমিয়ে ফ্যাটকণা ও গ্রহণীর জলীয় অবস্থার মধ্যে আকর্ষণকে কমায়। এইভাবে পিত্তলবণের সাহায্যে ফ্যাটকণার অবদ্রব (emulsion) গঠিত হয় যা সহজেই ক্ষুদ্রান্ত্র দিয়ে পাচিত ও শোষিত হতে পারে। শ্বাসক্রিয়ার সময় ফুসফুসীয় বায়ুথলি সংলগ্ন জলস্তরের পৃষ্ঠটানের সঠিক পরিবর্তনের জন্যই বক্ষগহ্বরের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় ফুসফুসের আয়তন ঠিক থাকে, ফুসফুস কখনোই একেবারে চুপসিয়ে (collapse) যায় না।

1.2.7 দ্বিতড়িৎ ধ্রুবক (Dielectric Constant) ঃ

যে ক্ষমতার বলে কোনও বস্তু তার মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত তড়িৎক্ষেত্রকে হ্রাস করে, তাকে দ্বিতড়িৎ ধ্রুবক বলা যায়। কোনও মাধ্যমের দুটি আধানের মধ্যবর্তী স্থিরতড়িৎ বল ঐ মাধ্যমের দ্বিতড়িৎ ধ্রুবকের সঙ্গে সমানুপাতিক।

জীবজগতের উদাহরণ ঃ জলের দ্বিতড়িৎ ধ্রুবক বেশি হওয়ার জন্যই দেহস্থ জল সহজেই খনিজ লবণকে আয়নিত ও দ্রবীভূত করতে পারে। এর ফলে দেহরসের মধ্যে খনিজ আয়নের সহজ ও স্বাধীন চলাচল সম্ভব হয়। জলের এই ধর্মের জন্যই দেহরসের মধ্যে বিভিন্ন প্রোটিন অণু বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে থাকে।

1.2.8 কোলয়েড (Colloid)

কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থা ছাড়া পদার্থের একটি বিশেষ অবস্থাকে কোলয়েড বলে। এই অবস্থায় কোনও দ্রাব, দ্রাবকের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে দ্রবীভূত বা ব্যাপিত হতে পারে না। কোলয়েডীয় সিস্টেমে বস্তুর দুটি অবস্থা বা দশা দেখা যায়। যথা—একটি বস্তুর অবিচ্ছিন্ন দশা (continuous phase) এবং অন্য বস্তুর বিস্তার দশা (dipserse phase)। একটি বস্তুর অবিচ্ছিন্ন দশার মধ্যে অন্য বস্তুকণা বিস্তার দশায় অবস্থান করে। প্রকৃতপক্ষে, কোলয়েডের মধ্যে অবস্থিত বিস্তার দশার বস্তুকণার আয়তন, দ্রাবক অণুর আয়তন অপেক্ষা বড় হয়। কোলয়েড সল (sol), জেল (gel), অবদ্রব (emulsion), ফোম (Foam) প্রভৃতি প্রকৃতির হয়।

ডায়ালাইসিস্ (Dialysis) একটি বিশেষ পদ্ধতি, যেখানে অর্ধভেদ্য পর্দার সাহায্যে কোলয়েডের উপাদানদের পরস্পর পৃথক করা যায়।

জীবজগতে উদাহরণ ঃ কোষের প্রোটোপ্লাজম একটি কোলয়েড জাতীয় পদার্থ যা জেলির মতো অর্ধতরল অবস্থা বা জেলরূপে এবং অধিকতর তরল বা সলরূপে অবস্থান করে। কোলয়েড প্রকৃতির জন্যই কোষের মধ্যে বিভিন্ন জৈব যৌগ ও প্রোটিন অণু ভাসমান থাকতে পারে।

বৃক্কের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হ্রাস পেলে কৃত্রিমভাবে ডায়ালাইসিস্ পদ্ধতিতে রক্তের পরিস্রাবণ করা হয়।

1.2.9 তেজস্ক্রিয়তা (Radioactivity)

মৌলের অস্থির নিউক্লিয়াস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কণার নির্গমন (emission) এবং তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ (electromagnetic radiation) কে তেজস্ক্রিয়া বলা হয়। সংশ্লিষ্ট মৌলদের তেজস্ক্রিয় মৌল বলা হয়। যেমন—কার্বন, রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি। তেজস্ক্রিয় মৌলের একাধিক রূপ আছে। এই মৌলগুলির পরমাণুতে সমান সংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রন কণা থাকলেও নিউট্রন ভিন্ন সংখ্যায় থাকে। এদের আইসোটোপ (isotope) বলা হয়। তেজস্ক্রিয় মৌলরা X-রশ্মির সমতুল্য গামা-রশ্মি (γ-ray), আলফা-রশ্মি (α- ray) এবং বিটা-রশ্মি (β- ray) নির্গত করে। এই সকল রশ্মি ছবি তোলার ফিল্মে চিহ্ন (spot) তৈরি করে এবং অন্য বস্তুদের সহজেই আয়নিত করতে পারে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত বিকিরণকে বিভিন্ন যন্ত্র যেমন—গামা কাউন্টার, বিটা কাউন্টারের সাহায্যে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায়।

জীবজগতের প্রয়োগ ঃ বিভিন্ন গবেষণাগার কাজে এবং রোগ নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপদের ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। এসব ক্ষেত্রে কোনও যৌগের সাথে নির্দিষ্ট তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সংযোজন ঘটিয়ে, পরীক্ষাধীন প্রাণীর দেহে ঐ সংযুক্ত যৌগকে প্রবেশ করানো হয়। তারপর ঐ প্রাণীর কলাকোষের নমুনাতে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অবস্থান, অন্যান্য যৌগের সাথে তার বিক্রিয়া ইত্যাদি শনাক্ত

করা হয়। এইভাবে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্বনের স্থিতিকরণ, যকৃতে গ্লাইকোজেনের বিশ্লেষণ, জেনেটিক বস্তুরূপে DNA-এর ভূমিকা (বিপাকীয় কাজে উৎসেচকের ভূমিকা) ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থদের বিকিরণের সাহায্যে ক্যানসার ও অস্থি মজ্জার রোগ চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া, হরমোনের পরিমাপ, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে দিয়ে রক্তপ্রবাহের গতি নির্ণয় এবং মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহের গতি নির্ণয় প্রভৃতি কাজেও বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থকে কাজে লাগানো হয়।

1.2.10 হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব (Hydrogen Ion Concentration)

হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব দিয়ে কোনও বস্তুর আপেক্ষিক আম্লিকতা (relative acidity) পরিমাপ করা হয়। কোনও বস্তুর pH বলতে, তার হাইড্রোজেন আয়ন ঘনত্বের ঋণাত্মক লগ-মূল্য (log value) কে বোঝানো হয়। pH-এর সাহায্যে বস্তুর আম্লিক বা ক্ষারীয় বা প্রশম অবস্থা বোঝা যায়। কোনও বস্তুর pH 7 হলে বস্তুটির প্রশম অবস্থা, 7-এর বেশি হলে ক্ষারীয় এবং 7-এর কম হলে আম্লিক অবস্থা নির্দেশিত হয়।

জৈবিক গুরুত্ব ঃ জীবদেহে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় যৌগের গঠন ও কাজ pH-এর ওপর নির্ভরশীল। যেমন নিউক্লীয় অম্লের শৃঙ্খলাকার গঠন, উৎসেচক প্রোটিনের গঠন ও অনুঘটকরূপে এর কাজ প্রধানত pH-এর উপর নির্ভর করে। খাদ্যনালীর বিভিন্ন অংশে ক্ষরিত উৎসেচকরা খাদ্যনালীর আভ্যন্তরীণ মাধ্যমের pH-এর মানের ভিত্তিতে পাচন কাজ সম্পন্ন করে। যেমন পাকস্থলিতে ক্ষরিত পেপসিন কেবলমাত্র আম্লিক pH-এর মাধ্যমে কাজ করে। কোষের মধ্যে বিভিন্ন আয়নের চলাচল, কোষস্থ ও কোষবহিঃস্থ তরলের pH-এর মানের ওপর নির্ভর করে। এইভাবে কোনো মাধ্যমের pH সেই মাধ্যমের বিভিন্ন কাজকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

পদার্থের বিভিন্ন ধর্মাবলীর আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে জীবকোষের গঠন ও শারীরবৃত্তীয় কাজে কোষের ভূমিকা, পদার্থের বিভিন্ন ধর্মকে অনুসরণ করেই পালিত হয়। এইভাবে জীবপদার্থবিদ্যার সাহায্যে পদার্থের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তথা সেই সম্পর্কিত জীবদেহের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি স্তরে এক বা একাধিক কলাকৌশল (technique) অবলম্বন করতে হয়। অধিকাংশ কলাকৌশলের মূলে আছে জীবপদার্থবিদ্যার নীতি ও বিশ্লেষণ। নীচে এমনই কিছু বহুলপ্রচলিত কলাকৌশলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

1.3 জীবপদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত কিছু কলাকৌশল ও জীববিজ্ঞানে তাদের প্রয়োগ (Some Biophysical Techniques and their application in Life Science)

1.3.1 এক্স-রশ্মি অপবর্তন (X-ray defraction)

কেলাসিত বা প্রায় কেলাসিত বস্তুর ওপর নির্দিষ্ট মাত্রায় এক্স-রশ্মি প্রয়োগ করলে, কিছু রশ্মি বস্তুর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়, এবং কিছু রশ্মি কেলাসের চারধার থেকে আঘাত পেয়ে ছড়িয়ে পড়ে

(scattered) বা অপবর্তিত হয়। এই ছড়িয়ে পড়া বা অপবর্তিত রশ্মিরা সহজেই বস্তুর পেছনে রাখা ছবিতোলার ফিল্মের (photographic film) ওপর আপতিত হয়ে ছাপ বা চিহ্ন (spot) সৃষ্টি করে। ফিল্মের ওপর আপতিত রশ্মিদের ঘনত্ব ও অবস্থান, প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষিত বস্তুর পরমাণুর মধ্যে অবস্থিত ইলেকট্রন কণার ঘনত্ব ও অবস্থানকেই নির্দেশ করে। এইভাবে বিভিন্ন ফিল্মে সংগৃহীত অপবর্তনের নির্দশন থেকে পরীক্ষাধীন বস্তুর ত্রৈমাত্রিক গঠন (three dimensional) বর্ণনা করা যায়।

প্রয়োগ ঃ X-রশ্মি—অপবর্তন, একটি শক্তিশালী কৌশলরূপে বর্তমান কালে গবেষণা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অস্থিসংক্রান্ত রোগ, টিউমার, ফুসফুসের রোগ, ইত্যাদি শনাক্ত করতে X-রশ্মি প্রয়োগ করা হয়। জীবদেহের একাধিক জৈব অণুর গঠনের ধারণা এই পদ্ধতির সাহায্যে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানী ওয়াটসন ও ক্রিক ডি. এন.এ. অণুর দ্বিতন্ত্রী গঠন এই পদ্ধতির সাহায্যেই বর্ণনা করেন। মায়োগ্লোবিন সহ একাধিক প্রোটিন অণু, টি-আর.এন.এ (tRNA)-র ত্রৈমাত্রিক গঠন, এ.টি.পি. এজ (ATPase), কোলাজেন প্রভৃতির অণুর গঠনচিত্র আমরা X-রশ্মির সাহায্যেই পেয়েছি।

1.3.2 এন.এম. আর স্পেকট্রোস্কোপ (N.M.R Spectroscope)

ক্ষুদ্রাকৃতির যৌগ যেমন, প্রোটিনের অ্যামাইনো অ্যাসিড, প্রভৃতির গঠন জানার জন্য এন. এম. আর (NMR = Nuclear Magnetic Resonance) একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এইক্ষেত্রে, পরীক্ষাধীন বস্তুর কেলাস প্রয়োজন হয় না ; পরিবর্তে বস্তুর একটি দ্রবণকে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করা হয়। বস্তুকণার হাইড্রোজেন মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রস্থ চৌম্বকশক্তি, বাইরের চৌম্বক ক্ষেত্রের সাথে প্রতিক্রিয়া করে, ফলে ঐ মৌলের পরমাণুরা বিশেষভাবে সজ্জিত হয়। এইসময় বাইরে থেকে ঐ বস্তুর মধ্যে তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ (electromagnetic radiation) প্রয়োগ করা হলে মৌলের পরমাণু-কেন্দ্রের (nucleus) বিন্যাস ব্যাহত হয় এবং তারা উত্তেজিত হয়ে রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সি (Radio frequence) বিকিরণ নির্গত করে। এই বিকিরণকে বর্ণালীর আকারে পরিমাপ করা যায়। রাসায়নিক গঠন অনুসারে পরীক্ষাধীন বস্তুতে বর্তমান হাইড্রোজেন মৌলের সংখ্যা ও অবস্থান পৃথক হয়। ফলে মৌল কর্তৃক নির্গত রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির মাত্রাও পৃথক হয়। এইভাবে কোনও বস্তু, বিশেষত প্রোটিন অণুতে অবস্থিত বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডের অবস্থান ও ত্রৈমাত্রিক গঠন নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

প্রয়োগ ঃ ক্ষুদ্রাকার প্রোটিন অণু, গ্লাইকোপ্রোটিন অণুর সাথে যুক্ত শর্করা শৃঙ্খল প্রভৃতির ত্রৈমাত্রিক গঠন এবং প্রোটিন অণুতে অবস্থিত অ্যামাইনো অ্যাসিডের বিন্যাস খুব সহজভাবে এই কৌশলের সাহায্যে জানা যায়।

1.3.3 অটোরেডিওগ্রাফি (Autoradiography)

এই কৌশলের সাহায্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে দেহকোষে সংঘটিত বিভিন্ন কার্যপ্রণালীর সূক্ষ্ম ঘটনাসমূহ ও সময় নির্ণয় করা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতিতে পরীক্ষাধীন কোষের নমুনাকে প্রথমে তেজস্ক্রিয় মৌলযুক্ত দ্রবণে নিমজ্জিত করা হয়। তারপর ঐ নমুনাকে তেজস্ক্রিয় পদার্থবিহীন মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে কোষের নমুনার ওপর ছবিতোলার ফিল্ম বা প্রয়োজনীয়

দ্রবণ (photographic emulsion) লেপন করে, সমগ্র ব্যবস্থাকে অন্ধকার স্থানে রাখা হয়। এই সময়, নমুনা থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছবি তোলার ফিল্মে বা দ্রবণে তাদের চিহ্ন (spot) তৈরি করে। এই চিহ্ন পরবর্তীকালে উপযুক্ত দ্রবণের সাহায্যে (wash) দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এইভাবে কোষের নমুনার নির্দিষ্ট স্থানে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতি ও সময় নির্ণয় করা যায়।

প্রয়োগ ঃ কোষ বিভাজনকালে ক্রোমোজোমের পরিবর্তন, এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকায় প্রস্তুত প্রোটিন অণুর কোষের বাইরে নিঃসরণ ও তার জন্য প্রয়োজনীয় সময়, নিউক্লিয়াসে ডি. এন.এ অণুর বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি প্রভৃতি তথ্য অটোরেডিওগ্রাফির সাহায্যে বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায়।

1.3.4 অণুবীক্ষণ তত্ত্ব (Microscopy)

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুকণা, কোষ ও তার অঙ্গাণুদের পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের অণুবীক্ষণযন্ত্র ব্যবৃত হয়। অণুবীক্ষণের বিস্তারিত গঠন ও কার্যপ্রণালী NIT-3, 4 এবং 5 অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

1.3.5 ক্রোমাটোগ্রাফি (Chromatography)

বিভিন্ন পদার্থের মিশ্র দ্রবণ থেকে প্রতিটি পদার্থের অণুদের পৃথক করার একটি নির্ভরযোগ্য কলাকৌশল হল ক্রোমাটোগ্রাফি। পৃথকীকরণ পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট পদার্থের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগানো হয়। যেমন (1) জেল ফিলট্রেশন ক্রোমোটোগ্রাফিতে আণবিক আয়তনের (molecular size) ভিত্তিতে পৃথক করা হয়। (2) আয়ন এক্সচেঞ্জ ক্রোমাটোগ্রাফিতে পদার্থদের আয়নের পার্থক্যের ভিত্তিতে পদার্থদের পৃথক করা হয়। (3) অ্যাফিনিটি ক্রোমাটোগ্রাফিতে, বিশেষ বস্তুর প্রতি পদার্থর আসক্তিকে (affinity) পৃথকীকরণের জন্য গণ্য করা হয়। (4) অ্যাড্সরব্শন ক্রোমাটোগ্রাফিতে বিশেষ বস্তুর মধ্যে শোষিত হবার ক্ষমতাকে কাজে লাগানো হয়। এইভাবে বিভিন্ন ক্রোমাটোগ্রাফি পদ্ধতিতে প্রোটিন, লিপিড, নিউক্লীয় অম্ল, হরমোন, উৎসেচক ইত্যাদির মিশ্রদ্রবণ থেকে নির্দিষ্ট বা প্রয়োজনীয় পদার্থকে পৃথক করা যায়। বিস্তারিত বিবরণ UNIT-6 তে দেওয়া হয়েছে।

1.3.6 ইলেকট্রোফোরেসিস (Electrophoresis)

জৈব অণুর মিশ্র দ্রবণকে তড়িৎক্ষেত্রে স্থাপন করে বা দ্রবণের মধ্যে দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ চালনা করে, পদার্থদের পৃথক করার পদ্ধতিকে ইলেকট্রফোরেসিস বলে। মিশ্রিত বস্তুদের তড়িতাধান (charge), আণবিক ওজন (molecular weight) ও আয়তন (size) প্রভৃতির পার্থক্যের ভিত্তিতে তড়িৎক্ষেত্রের মাধ্যম থেকে পদার্থদের পৃথক করা য়। বিভিন্ন প্রোটিনের মিশ্রণ থেকে নির্দিষ্ট বা আকাঙ্ক্ষিত প্রোটিনকে পৃথক করা এবং তাদের আণবিক ওজন নির্ণয় করার জন্য ইলেকট্রফোরেসিস পদ্ধতি খুবই কার্যকরী। বিস্তারিত বিবরণের জন্য UNIT-6 দেখুন।

1.3.7 কোষ ভগ্নকরণ (Cell fractionation)

কোষতত্ত্ববিদ্যার ক্রমোন্নতির সাথে সাথে কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুর গঠন ও জৈবরাসায়নিক বিশ্লেষণ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। এই কাজের জন্য সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র কোষকে ভেঙে তার বিভিন্ন অংশ

সংগ্রহ করা হয়। কোষ ভগ্নকরণের জন্য প্রথমে কলাকোষকে হোমোজিনাইজেশ্ন (Homogenisation) পদ্ধতিতে সমসত্ত্ব মিশ্রণে পরিণত করা হয় বা লঘুসারক দ্রবণ বা অন্য কোনও বস্তুর সাহায্যে কোষপর্দাকে বিদীর্ণ করা হয়। তারপর বিভিন্ন গতিসম্পন্ন সেন্ট্রিফিউজ (Centrifuge) যন্ত্রে কোষের মিশ্রণকে ঘুরিয়ে তার বিভিন্ন অঙ্গাণুদের পৃথক করা হয়। ঘনত্ব অনুসারে বিভিন্ন অঙ্গাণুরা বিভিন্ন গতির ঘূর্ণনমাত্রায় বিশেষ আধারে সংগৃহীত হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য UNIT-7 দ্রষ্টব্য।

1.3.8 তাপগতিবিদ্যা (Thermodynamics)

কোনও সিস্টেমে বিক্রিয়ার সময় শক্তির ব্যবহার, যথা—রূপান্তর, পরিণতি ইত্যাদির আলোচনা করা হয় তাপগতি সংক্রান্ত বিষয়ে। সাধারণভাবে, উষ্ণতা পরিবর্তনতন্ত্রে যে ভৌত পরিবর্তন হয়, তা স্থির করা এবং সাধারণ নিয়ম থেকে তাদের ব্যাখ্যা করা—তাপগতিতত্ত্বের অধিতব্য বিষয়। তাপগতিবিদ্যার নীতি ও জীববিজ্ঞানে তাদের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে UNIT-2 এ।

1.3.9 লেসার রশ্মি ও হলোগ্রাফি (Lasers and Holography)

আলোক বিকিরণের সবচেয়ে সুসংগত বা সামঞ্জস্যপূর্ণ (coherent) এবং একবর্ণীয় (monochromatic) বিকিরণকে লেসার বলা যায়। এই রশ্মির গতিবেগ, শূন্যমাধ্যমে আলোর গতিবেগের প্রায় সমান হয়। এই বিভিন্ন ধরনের রশ্মিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করা হয়।

যে পদ্ধতিতে, বস্তু কর্তৃক বিচ্ছুরিত আলোকতরঙ্গের দশা এবং বস্তুর নিজস্ব তরঙ্গ-দশার বর্ণনা নির্ণয় করা হয়, তাকে হলোগ্রাফী বলা হয়। লেসার রশ্মির সাহায্যেই প্রধানত হলোগ্রাফি পদ্ধতি কার্যকরী হয়।

প্রয়োগ ঃ লেসার রশ্মির প্রয়োগের মাধ্যমে ন্যূনতম ক্ষত ঘটিয়ে সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হয়েছে। একইভাবে এই রশ্মিকে বিভিন্ন মাত্রায় প্রয়োগ করে, টিউমার, অস্থি, দাঁত সংক্রান্ত রোগে বিনা রক্তপাতে অস্ত্রোপচার করা হয়। অন্যদিকে কম মাত্রায় এই রশ্মিকে ব্যবহার করে ব্যথা; কলাকোষের ক্ষত, চোখের ছানি প্রভৃতি নিরাময় করা যায়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যেসব ভাসমান বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করা যায় না, হলোগ্রাফির কৌশলকে কাজে লাগিয়ে তাদের গঠন ও গতিবেগকে নির্ণয় করা সম্ভব হয়। এই পদ্ধতিতে তরল মাধ্যমে ভাসমান ব্যাকটেরিয়া বা জীবাণুদের দেখা সম্ভব হয়।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে কিভাবে জীবপদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন কলাকৌশল জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে এবং জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানকে সর্বাঙ্গীণ করে তুলছে। এইভাবেই পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যার জ্ঞানের পারস্পরিক আদান-প্রদানে জীবপদার্থবিদ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজকের ভূমিকা পালন করে।

1.4 প্রশ্নাবলী

ক। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

1. এক কথায় উত্তর দিন ঃ

(1) শ্বাসকার্যের সময় ফুসফুসের আয়তন ঠিক থাকে পদার্থের কোন্ ধর্মের জন্য ?

(2) জীবদেহে ব্রাউনীয় গতির একটি উদাহরণ দিন।

(3) বস্তুদের থিতানো কিসের ওপর নির্ভর করে ?

(4) কোলয়েডের দুটি দশার নাম কি ?

(5) কোন্ রোগে রক্তের সান্দ্রতা বৃদ্ধি পায় ?

(6) কোন্ ধরনের ব্যাপনে শক্তির প্রয়োজন হয় ?

(7) ডায়ালাইসিস্ পদ্ধতিতে কোন্ ধরনের পর্দা ব্যবহার করা হয় ?

(8) নিউক্লীয় অম্লের ত্রৈমাত্রিক গঠন কোন্ পদ্ধতির সাহায্যে জানা যায় ?

(9) মিশ্র প্রোটিন দ্রবণ থেকে কি কি পদ্ধতির সাহায্যে প্রোটিনদের পৃথক করা যায় ?

(10) লেসার কি ?

2. ঠিক বা ভুল শনাক্ত করুন ঃ

(1) এন. এম. আর-এর ক্ষেত্রে যৌগে অক্সিজেন মৌলের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়।

(2) pH-এর মাত্রা 7-এর বেশি বলে সংশ্লিষ্ট বস্তু ক্ষারীয় হবে।

(3) বিটা-রশ্মি ও এক্স-রশ্মি সমতুল্য।

(4) তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত বিকিরণকে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে মাপা যায়।

(5) প্রোটোপ্লাজম একটি তরল দ্রবণ।

(6) কোলয়েডে বিস্তার দশার বস্তু কণার আয়তন দ্রাবক অণুর আয়তন অপেক্ষা বড় হয়।

(7) সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্র কোষের বিভিন্ন অংশ সংগ্রহে প্রয়োজন হয়।

(8) জেল ফিলট্রেশন ক্রোমাটোগ্রাফীতে বস্তুর আয়নের পার্থক্যকে কাজে লাগানো হয়।

(9) লেসার রশ্মি একটি বহু বর্ণের বিকিরণ।

(10) অপবর্তিত এক্স-রশ্মি পদার্থের প্রোটিন কণার ঘনত্ব ও অবস্থান নির্দেশ করে।

খ। মাঝারি প্রশ্ন ঃ

(1) বস্তুর হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব কিভাবে জীবদেহে বিভিন্ন কাজকে প্রভাবিত করে ?

(2) এক্স-রশ্মি অপবর্তনের প্রক্রিয়া সংক্ষেপে লিখুন।

(3) তেজস্ক্রিয়তা কি ? কিভাবে তেজস্ক্রিয় মৌলদের চিকিৎসার কাজে ব্যবার করা হয় ?

(4) পৃষ্ঠটান কাকে বলে ? জীবদেহে পদার্থের এই ধর্ম কিভাবে কাজ করে ?

(5) জীবদেহে ব্যাপনের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

গ। বড় প্রশ্ন ঃ

(1) জীবপদার্থবিদ্যা জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজে কিভাবে সাহায্য করে ?

(2) জীবদেহে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পদার্থের পাঁচটি ধর্ম ও তাদের প্রয়োগ বর্ণনা করুন।

(3) এন.এম.আর. কি ? NMR স্পেক্ট্রোস্কোপ সম্পর্কে যা জানেন

(4) অটোরেডিওগ্রাফি ও ক্রোমাটোগ্রাফি প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(5) জীববিজ্ঞানে, জীবপদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন কলাকৌশলের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

1.5 উত্তরমালা

ক. 1(1) পৃষ্ঠটানের জন্য। (2) প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে প্রোটিন, নিউক্লীয় অম্ল, রাইবোজোম প্রভৃতির সমবিস্তার। (3) ঘনত্বের ওপর। (4) অবিচ্ছিন্ন দশা ও বিস্তার দশা। (5) পলিসাইথেমিয়া। (6) লঘুতর অংশ থেকে উচ্চতর অংশের দিকে বস্তুর ব্যাপনের সময় শক্তির প্রয়োজন হয়। (7) অর্ধভেদ্য পর্দা। (8) এক্স-রশ্মি অপবর্তন পদ্ধতি। (9) ক্রোমাটোগ্রাফি ও ইলেকট্রফোরেসিস্। (10) আলোক বিকিরণের সবচেয়ে সুসংগত ও একবর্ণীয় বিকিরণ।

2 (1) ভুল, (2) ঠিক, (3) ভুল, (4) ভুল, (5) ভুল, (6) ঠিক, (7) ঠিক, (8) ভুল, (9) ভুল, (10) ভুল।

খ. (1) অনুচ্ছেদ 1.2 এর 10 নম্বর পয়েন্ট দেখুন।

(2) অনুচ্ছেদ 1.3 এর 1 নম্বর পয়েন্ট দেখুন।

(3) অনুচ্ছেদ 1.2 এর 9 নম্বর পয়েন্ট ও অনুচ্ছেদের 1.3 এর 3 নং পয়েন্ট দেখুন।

(4) অনুচ্ছেদ 1.2 এর 6 নম্বর পয়েন্ট দেখুন।

(5) অনুচ্ছেদ 1.2 এর 2 নম্বর পয়েন্ট দেখুন।

গ. (1) অনুচ্ছেদ 1.2 ও 1.3 দেখুন।

(2) অনুচ্ছেদ 1.2 এর 2, 4, 5, 6 ও 9 নম্বর পয়েন্ট দেখুন।

(3) অনুচ্ছেদ 1.3 এর 2 নম্বর পয়েন্ট দেখুন।

(4) অনুচ্ছেদ 1.3 এর 3 ও 5 নম্বর পয়েন্ট দেখুন।

(5) অনুচ্ছেদ 1.3 দেখুন।

একক 2 ❐ তাপগতিবিদ্যা (Thermodynamics)

গঠন ঃ

2.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

2.2 সিস্টেম

2.2.1 সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য

2.2.2 সিস্টেমের সাম্যাবস্থা এবং পদ্ধতি

2.3 তাপগতি সংক্রান্ত প্রথম সূত্র

2.4 তাপগতি সংক্রান্ত দ্বিতীয় সূত্র

2.5 তাপগতি সংক্রান্ত তৃতীয় সূত্র

2.6 জীববিদ্যায় তাপগতি সংক্রান্ত সূত্রের প্রয়োগ

2.7 অনুশীলনী

2.8 উত্তরমালা

2.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা ঃ অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই একাধিক বিজ্ঞানী, যেমন—রামফোর্ড (Rumford), মেয়ার (Mayer), জুল (Joule), ক্লসিয়াস্ (Clausius) প্রমুখরা, রাসায়নিক, জৈবরাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়ার সময় সংঘটিত শক্তির রূপান্তর সম্পর্কে আলোকপাত করেন। ভূমণ্ডলের যাবতীয় সজীব ও অজীব উপাদান একাধিক পদার্থ (matter) নিয়ে গঠিত। প্রতিনিয়ত জীব ও তার পরিবেশের মধ্যে শক্তি ও পদার্থের বিনিময় চলছে, এই বিনিময়ের সময় এবং স্বতন্ত্রভাবে জীবদেহ ও পরিবেশে সংঘঠিত বিভিন্ন বিক্রিয়ার সময় শক্তির যে রূপান্তর হয়, তা বিশেষ কিছু নীতি অবলম্বন করেই হয়ে থাকে। পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে, বিজ্ঞানীরা তিনটি নীতির উল্লেখ করেছেন। এই নীতিসমূহ অনুসরণ করেই বিক্রিয়াকালীন সব শক্তির রূপান্তর ঘটে। তাপগতি সংক্রান্ত নীতি তিনটি কোনও বিশেষ বিক্রিয়া বা কোনও বিশেষ পদার্থের জন্য নির্দিষ্ট নয়। বাষ্পীয় ইঞ্জিন চলাকালীন যেসব বিক্রিয়া হয়, তা থেকে শুরু করে জীবকোষে সংঘঠিত উৎসেচক নির্ভর জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়া—সর্বত্রই তাপগতিবিদ্যার নীতি প্রযোজ্য। তাপগতি সংক্রান্ত নীতির সাহায্যে কোনও বিক্রিয়ার ফলাফল (শক্তি সম্পর্কিত) অর্থাৎ মোট শক্তির উৎপাদন, শক্তির হ্রাস ইত্যাদি নির্ণয় সম্ভব কিন্তু বিক্রিয়ার গতি (rate) বা কার্যনীতি (mechanism of reaction) জানা সম্ভব নয়। তাপগতিবিদ্যার মূল নীতি আলোচনার পূর্বে, এই অধ্যায়ে তাপগতিবিদ্যার ভাষায় সিস্টেম, সিস্টেমের বিভিন্ন অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

উদ্দেশ্য ঃ বিজ্ঞানের যে শাখায় পদার্থের অন্তঃস্থ শক্তির রূপান্তর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে তাপগতিবিদ্যা (Thermodynamics) বলা হয়। বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজ, যথা—চলন, গমন, শ্বসন, সংবহন, খাদ্যপাচন, কোষীয় বিপাক প্রভৃতি সম্পন্ন করা জীবের বৈশিষ্ট্য। এই সব কাজ চলার সময় জীবের দেহে বিভিন্ন ধরনের শক্তির রূপান্তর ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পদার্থের অন্তঃস্থ তাপশক্তি, কার্যে রূপান্তরিত হয়। তবে বিপরীতভাবে কার্যও তাপশক্তিতে পরিণত হতে পারে। জীবদেহের মতো পরিবেশেও প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে চলেছে ; যেমন—বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, খরস্রোতা নদীর প্রবাহ, সূর্যালোকের তাপে জলাশয় থেকে জলের বাষ্পীভবন ইত্যাদি। বিক্রিয়া, তা ভৌত, রাসায়নিক বা জৈবরাসায়নিক—যাই হোক না কেন, প্রতিটি বিক্রিয়ার সাথেই শক্তি ও শক্তির রূপান্তর ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তাপগতিবিদ্যা, জীবপদার্থবিদ্যার একটি ফলিত শাখা, তাত্ত্বিক শাখা নয়। তাপগতিবিদ্যা সংক্রান্ত এই অধ্যায়ে শক্তির বহুরূপতা, কোনও বিক্রিয়াকালীন শক্তির রূপান্তর বিক্রিয়া শেষে শক্তির পরিণতি—এই সব সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

2.2 সিস্টেম (System)

তাপগতিবিদ্যায় কোনও সিস্টেম বলতে এক বা একাধিক পদার্থের এমন এক সমন্বয়কে বোঝায়, যা তার চারপাশের পরিবেশ থেকে কোনও সীমারেখা দিয়ে পৃথক করা আছে। এই সীমারেখার বাস্তব অস্তিত্ব থাকতে বা না থাকতে পারে। যেমন—কোনও সিলিন্ডারের মধ্যে অবস্থিত গ্যাসের একটি বাস্তব ও নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে। কিন্তু গ্যাসটি যদি ধীরে ধীরে তার চারপাশের পরিবেশে মুক্ত হয়, তখন তার চারপাশে একটি কল্পিত সীমারেখা থাকবে অর্থাৎ গ্যাসটি যতদূর পর্যন্ত বিস্তারলাভ করবে সেটাই হবে সেই অবস্থায় তার সীমারেখা। তাপগতিবিদ্যায় আলোচিত সিস্টেমের কোনও নির্দিষ্ট আকার, আয়তন ও সমসত্ত্বতা থাকে না, কেননা কোনও সিস্টেম ও তার চারপাশের মধ্যে সর্বদাই শক্তি ও পদার্থের বিনিময় হয়।

তাপগতিসংক্রান্ত সিস্টেমদের তিনভাবে ভাগ করা যায়।

যথা— (ক) পৃথকীকৃত সিস্টেম (Isolated System) : যেসব সিস্টেম তার চারপাশের পরিবেশের সাথে পদার্থ বা শক্তির বিনিময় করে না, তাদের পৃথকীকৃত সিস্টেম বলা হয়।

(খ) বন্ধ সিস্টেম (Closed System) : যেসব সিস্টেম পরিবেশের সাথে শক্তি বিনিময় করলেও পদার্থের বিনিময় ঘটায় না, তাদের বন্ধ সিস্টেম বলে। যে কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় বিক্রিয়াধীন সিস্টেমরা বন্ধ সিস্টেম রূপে থাকে।

(গ) মুক্ত সিস্টেম (Open System) : পরিবেশ ও সিস্টেমের মধ্যে শক্তি ও পদার্থ উভয়ের বিনিময় ঘটলে, সংশ্লিষ্ট সিস্টেমদের মুক্ত সিস্টেম বলা যায়। যে কোনও জৈবিক বিক্রিয়ার সময়, বিক্রিয়াধীন সিস্টেমরা মুক্ত সিস্টেমরূপে থাকে।

2.2.1 সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য

কোনও সিস্টেমের তাপগতি সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য বলতে প্রধানত তার আয়তন, চাপ, তাপমাত্রা ও উপাদানকে বোঝানো হয়। তবে সিস্টেমের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল অন্তঃস্থ (internal energy) শক্তি। সিস্টেমের অন্তঃস্থ শক্তিকে সব সময় বাইরে থেকে অনুভব করা যায় না। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে ঐ শক্তির উপস্থিতি প্রমাণ করা সম্ভব হয়। যেমন—0°C তাপমাত্রায় একখণ্ড বরফের গলনের জন্য 80 ক্যালোরি তাপের প্রয়োজন হয়। শূন্য ডিগ্রী তাপমাত্রায় বরফ খণ্ডটি জলে পরিণত হবার পর ঐ 80 ক্যালোরি তাপের পরিণতি কি হয়? প্রকৃতপক্ষে ঐ তাপ তখন বরফগলা জলের মধ্যেই অন্তঃস্থ শক্তিরূপে অবস্থান করে। সিস্টেমের অন্তঃস্থ শক্তি বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে। যেমন, ড্যানিয়েল বর্ণিত তড়িৎকোষের মধ্যে তামা ও জিঙ্ক সালফেট রাখলে, তারা পরস্পর বিক্রিয়া করে তড়িৎশক্তি উৎপন্ন করে। প্রশ্ন জাগে, উৎপন্ন তড়িৎ শক্তি পূর্বে কি শক্তি রূপে ছিল? এক্ষেত্রে, তামা ও জিঙ্ক সালফেট—এই সিস্টেম দুইটির অন্তঃস্থ শক্তিই তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এইভাবে বোঝা যায় যে, কোনও সিস্টেমের মধ্যে যেমন কিছু পদার্থ থাকে, সেইরকম ঐসব পদার্থের মধ্যে কিছু অন্তঃস্থ শক্তি সঞ্চিত থাকে।

সিস্টেমের অন্তঃস্থ শক্তি, তার চাপ, আয়তন ও তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল, এই শক্তিকে সবসময় সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। সাধারণত 'U' অক্ষর দিয়ে এই শক্তিকে চিহ্নিত করা হয়। সবশেষে বলা যায় যে সিস্টেমের দুটি অংশ—পদার্থ ও অন্তঃস্থ শক্তি।

2.2.2 সিস্টেমের সাম্যাবস্থা এবং পদ্ধতি (Equilibrium and process of a system)

সাধারণ অবস্থায় কোনও সিস্টেমের প্রতিটি অংশের তাপমাত্রা, চাপ, উপাদান প্রভৃতি অভিন্ন থাকার চেষ্টা করে। যে অবস্থায় কোনও সিস্টেমের প্রতিটি অংশের চাপ, তাপমাত্রা ও উপাদান সমমাত্রায় থাকে, ঐ অবস্থাকে তখন ঐ সিস্টেমের সাম্যাবস্থা বলা হয়।

কোনওভাবে সিস্টেমের ওপরে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটলে সিস্টেমের সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয় এবং সিস্টেমের দশা বা অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। সিস্টেমটি তখন পদ্ধতি (process) বা বিক্রিয়াতে (reaction) প্রবেশ করে।

2.3 তাপগতি সংক্রান্ত প্রথম সূত্র (First law of Thermodynamics)

অষ্টাদশ শতকে বিভিন্ন পদার্থবিদ্, যেমন—কাউন্ট রামর্ফোড , ডেভি (Davy), মেয়ার প্রমুখরা বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন যে কার্য ও তাপ উভয়ই শক্তি এবং তাপ ও কার্যের পারস্পরিক রূপান্তরের মধ্যে একটি পরিমাণগত সম্পর্ক থাকে। বিজ্ঞানী জুল (Joule) তাপ ও কার্যের সম্পর্ককে আরও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেন। তার ব্যাখ্যানুসারে বলা যায় যে, যদি বা যখন কোনও কাজের ফলে তাপ উৎপন্ন হয়, তখন উৎপন্ন তাপের পরিমাণ ব্যয়িত কার্যের পরিমাণের সমানুপাতিক হয়। বিপরীতে, কোনও তাপ যদি কার্যে পরিণত হয়, তখন ব্যয়িত তাপ ও উৎপন্ন কার্যের মধ্যেও সমপরিমাণতা দেখা যায়। তাপ ও কার্যের এই সম্পর্কভিত্তিক ব্যাখ্যাই তাপগতি বিদ্যার প্রথম সূত্রের সূচনা করে।

বিজ্ঞানী হেমহোজ (Helmholtz) তাপশক্তি ও কার্যশক্তির পরস্পরের সম্পর্কের মূলনীতিকে সরলভাবে বর্ণনা করেন যা তাপগতি বিদ্যার প্রথম সূত্রের সরলীকৃত রূপ তার মতে—'শক্তির বিভিন্ন রূপ পরস্পর পরিবর্তনশীল ; যখন কোনও একটি শক্তির কিছু অংশ অদৃশ্য হয়, তখনই সমপরিমাণের শক্তি অন্য কোনও শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়।" এর থেকে জানা যায় যে—"শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে কখনই সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না।" বিজ্ঞানী ক্লসিয়াস তাই বলেন যে—"পৃথিবীতে শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট।" সৃষ্টির পর থেকে কোনও শক্তিরই ধ্বংস বা নতুন কোনও শক্তির উৎপন্ন হয়নি। শুধুমাত্র বিভিন্ন শক্তির একরূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তন ঘটেছে। এই অর্থে তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রটি "শক্তির রূপান্তর সংক্রান্ত" একটি নীতি (Law of convertion of energy)।

প্রথম সূত্রানুসারে ধরা হয় যে কোনও সিস্টেমের ক্ষেত্রে—

$\Delta E = \Delta Q - \Delta W$

যেখানে ΔQ = তাপ বা সমতুল্য কোনও শক্তি, যা সিস্টেমে গৃহীত বা সিস্টেম থেকে বর্জিত হয়, তার পরিমাণ।

ΔW = সিস্টেম দিয়ে বা সিস্টেমের ওপর সংঘটিত যান্ত্রিক কার্যশক্তির পরিমাণ।

ΔE = সিস্টেমের অন্তঃস্থ শক্তির পরিমাণ।

এখানে ΔW = ধনাত্মক হবে, যদি সিস্টেম তার পার্শ্ববর্তী পরিবেশের ওপর কোনও কাজ করে, অন্যদিকে ΔW ঋণাত্মক হবে, যখন সিস্টেমের ওপর কোনও কাজ করা হয়।

এনথ্যালপি (Enthalpy) : প্রথম সূত্র প্রসঙ্গে কোনও সিস্টেমের এনথ্যালপি সম্পর্কে ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

স্থির চাপে, কোনও সিস্টেমের মোট তাপশক্তিকে এনথ্যালপি বলা হয়। এই তাপশক্তি, সিস্টেমের দশা, তাপমাত্রা, রাসায়নিক উপাদান, চাপ ও আয়তনের ওপর নির্ভরশীল।

ধরা হয় যে, $H = E + PV$, এখানে H = মোট তাপশক্তি, P = চাপ, V = আয়তন।

বিজ্ঞানীদের মতে এনথ্যালপিতর পরিবর্তন বলতে সিস্টেমের মোট অন্তঃস্থ শক্তির পরিমাণের পরিবর্তনকেই বোঝায়। এই পরিবর্তন, ভৌত বা রাসায়নিক যে কোনও বিক্রিয়ার সময়, তাপগ্রহণ বা তাপ বর্জনের মাধ্যমে সম্ভব। যদি কোনও বিক্রিয়ার সময় কোনও যান্ত্রিক কাজ সম্পন্ন না হয় এবং সিস্টেমের চাপ (P) ও আয়তন (V), উভয়ই অপরিবর্তিত থাকে, তখন ΔH (অন্তঃস্থ তাপশক্তি) ΔE (অন্তঃস্থ শক্তি) এর সমান হয়।

কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়া, বিশেষত গ্যাসীয় বিক্রিয়ার সময়, P স্থির থাকলেও 'V' পরিবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে স্থির চাপ ও পরিবর্তিত আয়তন বা $P\Delta W$ এ, সংঘটিত কাজ বা ΔW-কেই বোঝায়। সংঘটিত কাজ বলতে এখানে গ্যাসের আয়তনের সংকোচন ($-\Delta W$) বা গ্যাসের আয়তনের বৃদ্ধি ($+\Delta W$) হতে পারে। ফলে এই ক্ষেত্রে ΔH কখনোই ΔE এর সমান হয় না।

অন্যথায় লেখা যায় যে $\Delta H = \Delta E + P\Delta W$

বা $\Delta H = \Delta E + \Delta W$

এখন যেহেতু, $\Delta E = \Delta Q + \Delta W$ (প্রথম সূত্রানুসারে)

সুতরাং $\Delta H = \Delta E + \Delta W = \Delta Q$

এই সম্পর্ক থেকে বোঝা যায় যে কোনও সিস্টেমের এনথ্যালপির পরিবর্তন, স্থির চাপে ঐ সিস্টেমের ভৌত বা রাসায়নিক বিক্রিয়াকালীন উৎপন্ন বা বর্জিত তাপের পরিমাণের সমান।

2.4 তাপগতি সংক্রান্ত দ্বিতীয় সূত্র (Second law of thermodynamics)

বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেন যে, কোনও বিক্রিয়া চলার সময় কোনও স্থায়ী পরিবর্তন ছাড়া কোনও সিস্টেমের তাপশক্তি সম্পূর্ণরূপে কার্যে রূপান্তরিত হয় না, অন্যভাবে বলা যায় যে, কোনও বিক্রিয়া পদ্ধতিতেই উৎস থেকে শুধুমাত্র তাপ সংগ্রহ এবং সংগৃহীত তাপের সম্পূর্ণরূপে কার্যে রূপান্তর ঘটে না।

তাপগতি সংক্রান্ত দ্বিতীয় সূত্রানুসারে—"প্রতিটি সিস্টেমই স্বতঃস্ফূর্তভাবে কম সম্ভাবনাময় (lower probability) অবস্থা থেকে উচ্চ সম্ভাবনাময় (higher probability) দশায় পরিবর্তিত হয়।" কম সম্ভাবনাময় দশায় কোনও সিস্টেম বেশি শৃঙ্খলাবদ্ধ (ordered) থাকে, অন্যদিকে উচ্চ সম্ভাবনাময় দশায় সিস্টেম কম শৃঙ্খলাবদ্ধ (disordered) থাকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সর্বদাই কম শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থার দিকে পরিবর্তিত হচ্ছে। শক্তির এরূপ পরিবর্তনের জন্য বিক্রিয়াকালীন সময়ে, সিস্টেমের কিছু শক্তি ব্যয় হয়, যা আমরা পরিমাপ করতে পারি না।

প্রথম সূত্রের মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা দেখা যায় বা দ্বিতীয় সূত্রের সাহায্যে অতিক্রম করা সম্ভব। বিক্রিয়াকালীন শক্তি রূপান্তরের দিক এবং সময়, প্রথম সূত্র থেকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্তু দ্বিতীয় সূত্রানুসারে বলা যায় যে—(1) কোনও ভৌত বা রাসায়নক বিক্রিয়া তখনই ঘটবে, যখন কোনও সিস্টেম ও তার পরিবেশের মোট এনট্রপির (পরবর্তী অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

(2) বিক্রিয়ার দিক সম্পর্কে বলা যায় যে—প্রতিটি বিক্রিয়াই স্বাধীন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে কোনও দিকে সংঘটিত হতে পারে। তবে সিস্টেমের অন্তঃস্থ শক্তির মধ্যে সর্বদাই ক্রমশ কম সুসংবদ্ধ অবস্থার (randomized) দিকে এগিয়ে যাবার একটা প্রবণতা আছে যার ফলে সিস্টেমের এনট্রপির পরিমাণেরও বৃদ্ধি ঘটে।

2.5 তাপগতি সংক্রান্ত তৃতীয় সূত্র (Third law of thermodynamics)

তাপগতিবিদ্যার তৃতীয় সূত্রটি দ্বিতীয় সূত্রেরই বর্ধিত অংশ। এই সূত্রানুসারে কোনও যৌগের (প্রকৃত কেলাসিত অবস্থায়) তাপমাত্রা কেলভিন স্কেলের শূন্য মাত্রা (0°K অথবা – 273°C) থেকে বৃদ্ধি পাবার সাথে সাথে তার এনট্রপিও বৃদ্ধি পায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সিস্টেমের মধ্যে শৃঙ্খলতা কমার সাথে সাথে তার এনট্রপিও বাড়তে থাকে।

এনট্রপি (Entropy) : এনট্রপি হল সিস্টেমের অন্তঃস্থ শক্তির সেই অংশ, যা শুধুমাত্র শৃঙ্খলা কমাতে সাহায্য করে। এনট্রপিকে সিস্টেমের 'ক্ষয়ের সূচক' (index of exhaustion) রূপে ধরা হয়। সব সিস্টেমের এনট্রপিই ক্রমশ বাড়তে থাকে। তাই একক অবস্থাতেও কোনও সিস্টেমে ক্রমশ পরিবর্তিত হবার প্রবণতা দেখা যায়। অর্থাৎ কোনও সিস্টেমের স্থায়িত্ব (stability) তার এনট্রপির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এনট্রপি কম থাকলে, ঐ সিস্টেমরে মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা বেশি হবে।

দ্বিতীয় সূত্রানুসারে জানা যায় যে তাপ বা অন্য কোনও শক্তির সংযোজন সিস্টেমের এনট্রপিকে বৃদ্ধি করে।

সাম্যাবস্থায় $\Delta Q = T\,\Delta S$, যেখানে ΔQ = গৃহীত বা অর্জিত তাপের পরিমাণ, ΔS = প্রতি মোল পরিমাণের সিস্টেমে এনট্রপির পরিবর্তন, T = পরম তাপমাত্র (absolute temperature)।

যতক্ষণ না অবধি কোনও সিস্টেম সাম্যাবস্থায় পৌঁছায়, ততক্ষণ অবধি তার এনট্রপি ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং ততক্ষণ অবধি $T\,\Delta S > \Delta Q$ হয়।

প্রথম সূত্রানুসারে জানা যায় যে, $\Delta Q = \Delta H$ (অর্থাৎ এনথ্যালপির পরিবর্তন বা ΔH, গৃহীত বা বর্জিত শক্তির পরিমাণ বা ΔQ-এর সমান)। অর্থাৎ লেখা যায় যে $T\Delta S > \Delta H$ বা $\Delta H = T\Delta S - \Delta W$।

যে কোনও আদর্শ উভমুখী (ideal reversible) বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সিস্টেমের এনট্রপি পরিবর্তনের মান হয় শূন্য অর্থাৎ উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এনট্রপি অপরিবর্তিত থাকে। কার্যত, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কোনও বিক্রিয়া সর্বোচ্চ এনট্রপির দিকে সংঘটিত হয় কিন্তু পরিবেশ থেকে কিছু তাপ বা শক্তি বিক্রিয়াতে সংযোজিত হয়ে এনট্রপির পরিমাপ কমিয়ে দেয়, ফলে বিক্রিয়াটি পুনরায় বিপরীত মুখে সংঘটিত হবার চেষ্টা করে বা উভমুখী হয়ে যায়। এনট্রপির এরূপ পরিবর্তন, জীবদেহের শারীরবৃত্তীয় সাম্যাবস্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

এক কথায় তাপগতিবিদ্যার নীতিগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায়—

প্রথম সূত্র—শক্তির রূপান্তর।

দ্বিতীয় সূত্র—স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়ার সময় ও দিক।

তৃতীয় সূত্র—বিক্রিয়ার সাথে পরমশূন্য তাপমাত্রার সম্পর্ক।

2.6 জীববিদ্যায় তাপগতি সংক্রান্ত সূত্রের প্রয়োগ

(1) জীবদেহের অধিকাংশ বিপাকীয় প্রক্রিয়া, জলীয় দ্রবণে এবং স্থির চাপে সংঘটিত হয়। যেহেতু এসব ক্ষেত্রে চাপ (p) এবং আয়তন (v) প্রায় অপরিবর্তিত থাকে, তাই প্রথম সূত্রানুসারে বলা যায় যে বিপাকীয় কাজের সময় এনথ্যলপি বা ΔH, অন্তঃস্থ শক্তির পরিবর্তন বা ΔE এর সমান হয়, অর্থাৎ $\Delta H = \Delta E$ হয়।

(2) এক অণু গ্লুকোজের সম্পূর্ণ দহনে বা গ্লাইকোলাইসিসের সময় CO_2 ও জল উৎপন্নের সময় যে তাপশক্তি পাওয়া যায় তার পরিমাণ হয় -686 kcal mol^{-1}। অনুরূপভাবে এক অণু ল্যাকটেট বা ল্যাকটিক অ্যাসিডের দহনের সময় উৎপন্ন তাপশক্তির পরিমাণ হয় -326 kcal mol^{-1}। গ্লুকোজ ও ল্যাকটিক অ্যাসিডের এনথ্যালপি পৃথক হওয়ায় এবং তাদের দহনের পথ ভিন্ন হওয়ায়, এক অণু গ্লুকোজ থেকে দুই অণু ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হবার সময় তাদের এনথ্যালপির যে পার্থক্য হয়, তাকে আমরা নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করতে পারি—

$$\Delta H_{\text{গ্লাইকোলাইসিস}} = \Delta H_{\text{গ্লুকোজ}} - 2\Delta H_{\text{ল্যাকটেট}}$$

অথবা $\Delta H_{\text{গ্লাইকোলাইসিস}} = -686 - 2(-326)$ kcal $mol^{-1} = -34$ kcal mol^{-1} ।

কার্যত দেখা যায় যে কোষীয় বিপাকে, এক অণু গ্লুকোজ জারণে 34 kcal তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। এই তাপশক্তি উচ্চশক্তিসম্পন্ন ATP যৌগ গঠনে ব্যয় হয়। এইভাবে প্রথম সূত্রানুসারে দেখা যায় যে বিপাকীয় প্রক্রিয়ার এনথ্যালপি, আভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তনের সমান হয়।

(3) দ্বিতীয় সূত্রানুসারে সিস্টেম সর্বদাই কম শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থার দিকে এগিয়ে চলে। কিন্তু, কার্যতঃ দেখা যায় যে দেহের কলাকোষের মধ্যে সুশৃঙ্খলতা বা সাম্যাবস্থা বিদ্যমান। কিভাবে এই বৈপরিত্য সম্ভব হয়? জীবকোষে বিভিন্ন বিক্রিয়ার সময় নির্গত তাপশক্তির (তাপ হল শক্তির সর্বাপেক্ষা শৃঙ্খলহীন অবস্থার বহিঃপ্রকাশ) সাহায্যেই প্রকৃতপক্ষে কোষের শৃঙ্খলতা বজায় থাকে, অন্যদিকে কোষে উৎপন্ন তাপ, কোষের বাইরের পরিবেশে বেশি পরিমাণে বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করে। এইভাবেই কোষের মধ্যে সাম্যাবস্থা বজায় থাকে। কোষের মধ্যে শৃঙ্খলতা বজায় রাখার জন্য উদ্ভিদরা সূর্যালোক থেকে এবং প্রাণীরা খাদ্যবস্তু থেকে জ্বালানী বা শক্তির উৎস সংগ্রহ করে। বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্যে দিয়ে যখন এই শক্তি প্রবাহিত হয়, তখন উৎপাদক বা উদ্ভিদ থেকে শাকাশি (Harbivore) এবং শাকাশি থেকে মাংসাশি (Carnivore) স্তরে প্রবাহিত শক্তির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পায়। প্রকৃতপক্ষে হ্রাসপ্রাপ্ত শক্তির কিছু শক্তি প্রতি স্তরের জীবের জীবনধারণে ব্যয় হয় ও অবশিষ্ট শক্তি তাপশক্তি রূপে মুক্ত হয়। এইভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মোট শক্তির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে।

2.7 অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

1. এক কথায় উত্তর দিন ঃ

(1) জীব ও তার পরিবেশের মধ্যে কিসের বিনিময় ঘটে?

(2) তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র থেকে কি জানা যায়?

(3) রাসায়নিক বিক্রিয়াধীন সিস্টেম কোন্ অবস্থায় থাকে?

(4) সিস্টেমে কি কি অংশ থাকে?

(5) সিস্টেম কখন পদ্ধতিতে পরিণত হয়?

2. ভুল বা সঠিক নির্দেশ করুন ঃ

(1) উৎপন্ন কাজ সর্বদাই ব্যয়িত তাপের সমানুপাতিক হয় না।

(2) তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র থেকে বিক্রিয়ার গতি ও সময় জানা যায়।

(3) সিস্টেম সর্বদাই কম শৃঙ্খলাময় অবস্থা থেকে বেশি শৃঙ্খলাময় অবস্থার দিকে এগিয়ে চলে।

(4) এনট্রপি কোনও সিস্টেমের শৃঙ্খলা বাড়াতে সাহায্য করে।

(5) উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এনট্রপির মান শূন্য হয়।

(খ) মাঝারি প্রশ্ন ঃ

(1) সিস্টেম কি ? সিস্টেমের সাম্যাবস্থা বলতে কি বোঝায় ?

(2) বিজ্ঞানী হেমহোজ বর্ণিত তাপ ও কার্যশক্তির সম্পর্কের ব্যাখ্যা দিন।

(3) এনথ্যালপি কি ?

(4) কিভাবে $\Delta H = \Delta Q$ হয় ?

(5) এনট্রপি কি ? উভমুখী বিক্রিয়ার এনট্রপির অবস্থা কিরূপ হয় ?

(6) তাপগতি বিদ্যার তৃতীয় সূত্রের মূল কথা কি ?

(গ) বড় প্রশ্ন ঃ

(1) তাপগতিবিদ্যার ভাষায় সিস্টেম কাকে বলে ? বিভিন্ন ধরনের সিস্টেমের উদাহরণ ও সিস্টেমের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করুন।

(2) তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র থেকে কিভাবে বলা যায় যে শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই।

(3) কোনও সিস্টেম কখন পরিবর্তিত হয় ? সিস্টেমের এনট্রপি কিভাবে কোনও সিস্টেমকে প্রভাবিত করে ?

(4) জীববিদ্যার ক্ষেত্রে প্রথম সূত্রের প্রয়োগের উদাহরণ দিন।

(5) তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের সীমাবদ্ধতা কিভাবে কোন্ সূত্র দিয়ে অতিক্রম করা যায় ?

2.8 উত্তরাবলী

ক. (i) (1) পদার্থ ও শক্তির বিনিময় ঘটে।

(2) শক্তির রূপান্তর সম্পর্কে জানা যায়।

(3) বন্ধ সিস্টেমরূপে থাকে।

(4) পদার্থ ও অন্তঃস্থ শক্তি।

(5) সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হলে।

(ii) (1) ভুল, (2) সঠিক, (3) ভুল, (4) ভুল, (5) সঠিক।

খ. (1) অনুচ্ছেদ 2.2 ও 2.2.2 দ্রষ্টব্য।

(2) অনুচ্ছেদ 2.3 দ্রষ্টব্য।

(3) অনুচ্ছেদ 2.3 এর পরবর্তী অংশ দ্রষ্টব্য।

(4) 2.3 অনুচ্ছেদের এনথ্যালপি অংশ দেখুন।

(5) অনুচ্ছেদ 2.5 দ্রষ্টব্য।

(6) অনুচ্ছেদ 2.5 দেখুন।

গ. (1) অনুচ্ছেদ 2.2 ও 2.2.1 দেখুন।

(2) অনুচ্ছেদ 2.3 এবং অনুচ্ছেদ 2.6 এবং 3 নং উদাহরণের অংশ দেখুন।

(3) অনুচ্ছেদ 2.5 দেখুন।

(4) অনুচ্ছেদ 2.6 এবং প্রথম দুটি উদাহরণ দেখুন।

(5) অনুচ্ছেদ 2.4 দেখুন।

একক 3 ❐ আলোক অণুবীক্ষণ তত্ত্ব (Optical Microscopy)

গঠন ঃ

3.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

3.2 সংজ্ঞা

3.3 আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যক্ষমতা

3.1 বিবর্ধক ক্ষমতা

3.2 বিশ্লেষক ক্ষমতা

3.4 যৌগিক অণুবীক্ষণের গঠন

3.4.1 যৌগিক অণুবীক্ষণের ব্যবহার বিধি

3.4.2 যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যপ্রণালী

3.4.3 যৌগিক অণুবীক্ষণের জীবদেহাংশ পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সমূহ

3.5 আলোক অণুবীক্ষণের প্রয়োগ

3.6 কিছু বিশেষ আলোক অণুবীক্ষণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

3.7 অনুশীলনী

3.8 উত্তরাবলী

3.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা ঃ আনুমানিক 1590 সালে প্রথম কার্যকরী অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন এফ্ জ্যানসেন ও জেড্ জ্যানসেন (F. Janssen and Z. Janseen)। ঐ যন্ত্রের সাহায্যে প্রধানত ফ্লি (flea) জাতীয় পতঙ্গদের পূর্ণ অবয়ব পর্যবেক্ষণ করা হত বলে ঐ অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি ফ্লি-গ্লাসেস্ ("Flea glasses") নামে পরিচিত ছিল। ক্রমশ পূর্ণাঙ্গ জীব থেকে জীবদেহের অভ্যন্তরের গঠন ও কার্যকারিতা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, বিশেষত কোষবিদদের (Cytologist) অনুসন্ধিৎসার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গঠন ও কার্যকারিতায় বিবর্তন ঘটেছে। এই বিবর্তন আজও অব্যাহত।

শুধুমাত্র দৃশ্যমান আলোকশক্তি কাজে লাগিয়েই তৈরি হয়েছে বিভিন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্র। প্রতিটির বিবর্ধক ক্ষমতা (magnifying power) বিশ্লেষণ ক্ষমতা (resolving power) ভিন্ন ভিন্ন। আলোক

শক্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ; দর্পণ ও লেন্সের বিবিধ গঠন, তাদের প্রতিফলন ও প্রতিসরণ, বিবর্ধন ক্ষমতা ইত্যাদিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে অণুবীক্ষণের গঠন ও কার্যপ্রণালীতে। এই হিসেবে জীবপদার্থবিদ্যার একটি সফল ও মৌলিক পদক্ষেপ হল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার ও তার বিচিত্র প্রয়োগ।

পৃথিবীর সব জীবের দেহই এক বা একাধিক কোষ দিয়ে গঠিত। সাধারণতভাবে জীবকোষ এত ক্ষুদ্র হয় যে এককভাবে কোষের আকার বা আয়তন (Size), গঠন (Structure) মানুষের দৃষ্টির অগোচর, অধিকাংশ কোষের ব্যাস 0.2 μm থেকে 50μm এর মধ্যে হয়। অথচ 200μm-এর চেয়ে ক্ষুদ্রাকারের বস্তুকে মানুষ চোখের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। ক্ষুদ্রাকারের প্রতিটি কোষের মধ্যে রয়েছে আবার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অঙ্গাণু যাদের সাহায্যে জীবদেহের বিভিন্ন জৈবনিক কাজ সম্পন্ন হয়। কোষ ও কোষস্থ অঙ্গাণু বা অন্যান্য ক্ষুদ্রাকারের বস্তুকণাদের গঠন, কার্যাবলী ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করার জন্য প্রয়োজন বিশেষ ধরনের যন্ত্র।

উদ্দেশ্য ঃ অণুবীক্ষণ যন্ত্র হল এমনই এক প্রকারের যন্ত্র, যার সাহায্যে জীবকোষের সূক্ষ্ম গঠন প্রণালী সহ বিভিন্ন জৈব, অজৈব পদার্থের সূক্ষ্ম কণাদের (অণু—ক্ষুদ্র, বীক্ষণ—দেখা) বিবর্ধিত আয়তনের স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়।

বিভিন্ন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সজীব কোষের গঠনপ্রণালী, সংরক্ষিত ও রঞ্জিত কলাকোষের দীর্ঘস্থায়ী পর্যবেক্ষণ, কোষস্থ রাসায়নিক যৌগের প্রকৃতি ও অবস্থান নির্ণয়, কলাকোষে প্রবিষ্ট জীবাণু বা বহিরাগত কণার প্রকৃতি ও অবস্থান— ইত্যাদি কাজ অতি সহজেই সম্ভবপর হয়েছে। এইভাবে আলোক-অণুবীক্ষণ যন্ত্র কোষবিদ্যা, কলারাসায়নিক বিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে জীবদেহের সূক্ষ্ম গঠনপ্রণালীকে চোখের সামনে তুলে ধরেছে।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোনও বস্তুকে দেখার সময় বস্তুটিকে উজ্জ্বল করার প্রয়োজন হয়। এই অধ্যায়ে এমন কিছু অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গঠন ও কার্যপ্রণালী আলোচিত হবে, যাদের ক্ষেত্রে পরীক্ষাধীন বস্তুকে সূর্যলোক বা বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে উজ্জ্বল করা হয়। এই সব যন্ত্র, কিভাবে আলোকশক্তিকে ব্যবহার করে বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠন করে এবং আলোকশক্তির সাথের অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কি সম্পর্ক তা বিস্তারিতভাবে এই অধ্যায় থেকে জানা যাবে। আলোক-নির্ভর অণুবীক্ষণের প্রকারভেদ, বৈশিষ্ট্য তাদের প্রয়োগ ইত্যাদি সম্পর্কেও কিছু মৌলিক ধারণা ছাত্রছাত্রীরা এই অধ্যায় থেকে পাবেন।

3.2 সংজ্ঞা

যে যন্ত্রের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণাদর বহুগুণ বড় আকার বা আয়তনে (size) এবং পৃথক ও স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলা হয়। যে সকল অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষাধীন বস্তুদের উজ্জ্বল করার জন্য দৃশ্যমান সূর্যালোক বা বৈদ্যুতিক আলোক শক্তিকে ব্যবহার করা হয়, তাদের আলোক-নির্ভর অণুবীক্ষণ বা আলোক অণুবীক্ষণ (optical microscope) বলা হয়। এই অণুবীক্ষণের গঠন ও কার্যপ্রণালী সম্পর্কিত বিশেষ জ্ঞানকে আলোক অণুবীক্ষণ তত্ত্ব (optical microscope) বলা হয়।

আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র বিভিন্ন প্রকারের হয়। যথা—

(1) সরল ও যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিস্তারিত গঠন ও কার্যপ্রণালী পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচিত হবে),

(2) প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Unit-4 দ্রষ্টব্য),

(3) ফেজ-কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Unit-4 দ্রষ্টব্য),

(4) পোলারাইজেশন অণুবীক্ষণ যন্ত্র,

(5) ইন্টারফেরেন্স অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি।

3.3 আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যক্ষমতা

সব প্রকার আলোকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রেই দুই ধরনের মৌলিক ও সাধারণ কার্যক্ষমতা থাকে। যথা—(ক) বিবর্ধক ক্ষমতা (magnifying power) ও (খ) বিশ্লেষক ক্ষমতা (resolving power)।

3.3.1 (ক) বিবর্ধক ক্ষমতা

যে ক্ষমতার জন্য কোনও অণুবীক্ষণ যন্ত্র, খালি চোখে দর্শনঅযোগ্য কোনও বস্তুকণার আকার বা আয়তনকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে দৃশ্যমান করে তোলে, সেই ক্ষমতাকে অণুবীক্ষণের বিবর্ধক ক্ষমতা বলা হয়। বস্তুর আয়তনের বিবর্ধনকে (magnification) নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়—

$$\text{বিবর্ধন} = \frac{\text{অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা প্রতিবিম্বের আয়তন}}{\text{খালি চোখে দেখা প্রতিবিম্বের আয়তন}}$$

মানুষের চোখে অবস্থিত লেন্সের দর্শনক্ষমতা থাকলেও কোনও বিবর্ধক ক্ষমতা নেই। তাই একটি নির্দিষ্ট আয়তনের চেয়ে ক্ষুদ্র আয়তনের বস্তুকে খালি চোখে দেখা সম্ভব নয়। কোনও আলোক অণুবীক্ষণে ব্যবহৃত বিভিন্ন লেন্সের বিবর্ধক ক্ষমতার গুণফলকে ঐ অণুবীক্ষণের বিবর্ধক ক্ষমতা ধরা হয়। যদি কোনও অণুবীক্ষণের অভিলক্ষ্য লেন্সের (objective lens) বিবর্ধক ক্ষমতা $10\times$ (বা 10 গুণ) এবং অভিনেত্র লেন্সের (eyepiece lens) বিবর্ধক ক্ষমতা $5\times$ (বা 5 গুণ) হয়, তবে ঐ অণুবীক্ষণের বিবর্ধক ক্ষমতা হবে $10\times5=50\times$ বা 50 গুণ। অর্থাৎ পরীক্ষিত বস্তুকে তার প্রকৃত আয়তনের চেয়ে 50 গুণ বড় আকারে ঐ অণুবীক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করা যাবে।

3.3.2 (খ) বিশ্লেষক ক্ষমতা

যে ক্ষমতার জন্য কোনও অণুবীক্ষণ যন্ত্র, কাছাকাছি বা পাশাপাশি অবস্থিত বস্তুকণাদের মধ্যে যে ন্যূনতম ব্যবধান থাকে, তা দৃশ্যমান করার পর বিবর্ধিত প্রতিবিম্বের প্রতিটি সূক্ষ্মকণার পৃথক ও স্পষ্ট অবস্থানকে বিশ্লেষণ করতে পারে, সেই ক্ষমতাকে অণুবীক্ষণের বিশ্লেষক ক্ষমতা (resolving power) বলা হয়।

বস্তুকণার মধ্যে যে ন্যূনতম দূরত্ব (minimum distance) থাকলে, ঐ বস্তুকণাদের স্পষ্ট ও পৃথক পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা যায়, সেই দূরত্বকে বিশ্লেষণ মাত্রা (limit of resolution) বলা হয়। অণুবীক্ষণের বিশ্লেষক ক্ষমতা, বিশ্লেষণ মাত্রার সাথে ব্যস্তানুপাত সম্পর্কিত। অর্থাৎ অণুবীক্ষণের বিশ্লেষক ক্ষমতার যত বেশি হয়, বস্তুকণার বিশ্লেষণ মাত্রা তত কম হয়। বিশ্লেষণ মাত্রা কম হবার অর্থ বস্তুকণাদুটি পরস্পরের খুবই কাছে অবস্থিত বা তাদের মধ্যকার দূরত্ব খুবই কম। অণুবীক্ষণের বিশ্লেষক ক্ষমতা বেশি হবার অর্থ বস্তুকণাদুটি অতি নিকটে অবস্থান করলেও অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি তাদের পৃথক স্পষ্টরূপে দৃশ্যমান করে তুলতে সক্ষম। কোনও অণুবীক্ষণের বিশ্লেষক ক্ষমতা, তার বিবর্ধক ক্ষমতা দিয়ে প্রভাবিত হয় না।

কোনও অণুবীক্ষণের বিশ্লেষক ক্ষমতা, তার লেন্সের মধ্যে দিয়ে প্রবিষ্ট আলোক রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (wave length) এবং ঐ লেন্সের নিউম্যারিকাল অ্যাপারচার (numerical aperture)-এর ওপর নির্ভরশীল। বিশ্লেষক ক্ষমতাকে নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যায়—

$$\text{বিশ্লেষক ক্ষমতা} = \frac{0.61\lambda}{n \sin \theta}$$

এখানে $n \sin = \theta$ নিউম্যারিকাল অ্যাপারচার যা সাধারণভাবে কোনও লেন্সের আলোক সংগ্রহের ক্ষমতাকে নির্দেশ করে, n = অভিলক্ষ্য লেন্স, পরীক্ষাধীন বস্তুকে কনডেনসার লেন্স থেকে যে মাধ্যম দিয়ে পৃথক রাখে, সেই মাধ্যমের প্রতিসরণ গুণাঙ্ককে বোঝায়। বায়ুর ক্ষেত্রে প্রতিসরণ গুণাঙ্ক হয়।

θ (থিটা) = পরীক্ষাধীন বস্তু থেকে নির্গত আলোকরশ্মি শঙ্কু, অভিলক্ষ্য লেন্সের অক্ষের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে (চিত্র নং 1) λ (ল্যামডা) = ব্যবহৃত আলোকরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য। সাদা আলোর দৈর্ঘ্য 0.53μm ধরা হয়।

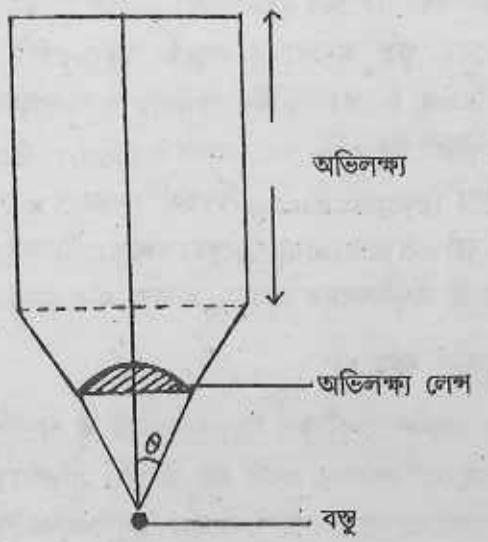

চিত্র নং 1 : অভিলক্ষ্য লেন্সের অক্ষের সাথে পরীক্ষাধীন বস্তু থেকে নির্গত আলোকরশ্মির (থিটা) কোণ উৎপাদন।

এই প্রসঙ্গে জানা ভালো যে, দৃশ্যমান আলোক বা বর্ণালী (visible spectrum), তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে কম তরঙ্গদৈর্ঘ্য সম্পন্ন বস্তুদের পৃথক পৃথক রূপে দৃশ্যমান করতে পারে না। এই কারণে আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষক ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অবধি সম্ভব। দৃশ্যমান আলোক বা বর্ণালীর মধ্যে বেগুনি রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম 0.4 μm বা 400nm হয়, অন্যদিকে গাঢ় লাল রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি 0.7μm বা 700nm হয়। এই হিসেবে কোনও বস্তু বা কোষাঙ্গাণুর আয়তন 400 থেকে 700nm-এর মধ্যে থাকলে তাদের সাধারণ আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পৃথক ও স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ সম্ভব। সাধারণত ব্যাকটেরিয়া, মাইটোকনড্রিয়া প্রভৃতির আয়তন 500nm-এর কাছাকাছি হয় বলে আলোক অণুবীক্ষণে এইসব কণাদের পৃথক ও স্পষ্ট প্রতিবিম্ব পাওয়া সম্ভব।

3.4 যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গঠন

যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে, অভিনেত্র, (eyepiece), অভিলক্ষ্য (objective) ও কনডেনসার বা সমাহরক (condenser) প্রভৃতি লেন্স ব্যবহার করা হয় এবং সূর্যালোক বা বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে বস্তুকে উজ্জ্বল করা হয় তাকে যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র (compound microscope) বলা হয়। গঠনগতভাবে এই অণুবীক্ষণে দুই ধরনের যন্ত্রাংশ থাকে। যথা (ক) যান্ত্রিক অংশ (mechanical parts) ও (খ) আলোক নিয়ন্ত্রক অংশ (optical parts)।

(ক) যান্ত্রিক অংশ ঃ

(1) **পাদদেশ (foot or base)** ঃ সাধারণত 'U' বা 'V' আকৃতির যে ধাতব অংশের ওপর সমগ্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি অবস্থিত থাকে, তাকে পাদদেশ বলে।

(2) **স্তম্ভ (pillar)** ঃ পাদদেশের ওপর সোজাভাবে দাঁড়ানো স্বল্প দৈর্ঘ্যের যে দণ্ড থাকে তাকে স্তম্ভ বলে।

(3) **হাতল বা বাহু (arm)** ঃ স্তম্ভের সাথে সংযুক্ত বাঁকানো যে অংশের সাহায্যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রটিকে ধরা হয়, তাকে হাত বলে।

(4) **হেলানো স্ক্রু (inclination screw)** ঃ হাতল ও স্তম্ভের সংযোগস্থলে অবস্থিত এই স্ক্রুর সাহায্যে যন্ত্রের মূল অংশকে পিছনে হেলানো যায়।

(5) **দেহনল (body tube)** ঃ হাতলের সামনের দিকে লম্বভাবে যে নলটি যুক্ত থাকে, তাকে দেহনল বলে।

(6) **টানা নল (draw tube)** ঃ দেহনলের মধ্যে অবস্থিত যে নলটিকে প্রয়োজনানুসারে ওঠানো বা নামানো যায়, তাকে টানানল বলে। এর ওপরিভাগে অভিনেত্র লেন্স সংযুক্ত থাকে।

(7) **স্থূল সন্নিবেশক স্ক্রু (coarse adjustment screw)** ঃ দেহনলের ঠিক পেছনে একজোড়া বড় গোলাকারের স্ক্রু থাকে, যাদের সাহায্যে টানানলকে দ্রুত ওঠানো-নামানো যায়।

(8) সূক্ষ্ম সন্নিবেশক স্ক্রু (fine adjustment screw) : উপরিউক্ত স্ক্রু দুটির নীচে, হাতলের ওপরে ছোট, গোলাকারের একজোড়া স্ক্রু থাকে, যাদের টানানলটিকে খুব সূক্ষ্মভাবে ওপর-নীচ করা যায়।

(9) নাসিকা চাকতি (nose piece) : দেহনলের নীচের দিকে একটি ধাতব চাকতি থাকে, যার তলার দিকে সাধারণত দুটি প্যাঁচ যুক্ত গর্ত থাকে। এই গর্তের মধ্যে অভিলক্ষ্য লেন্স দুটিকে সংযোগ করা হয়।

(10) মঞ্চ (stage) : স্তম্ভের ওপর, আয়তাকারের ও মসৃণ ধাতু নির্মিত যে অংশ থাকে তাকে মঞ্চ বলা হয়। মঞ্চের মধ্যভাগে একটি গোলাকার ছিদ্র থাকে। কাঁচের পাত বা স্লাইডের (Slide) ওপর স্থাপিত বস্তুকে ঐ ছিদ্রের ওপর রাখা হয়।

(11) ক্লিপ (Clip) : মঞ্চের ছিদ্রের দুপাশে ক্লিপ থাকে, যাদের সাহায্যে পরীক্ষাধীন বস্তুর স্লাইডকে নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির রাখা হয়।

(খ) আলোক নিয়ন্ত্রক অংশ :

(1) অভিনেত্র (eye piece) : টানানলের ওপরদিকে অবস্থিত যে ছোট ফাঁপা নলের ওপর চোখ রাখা হয়, তাকে অভিনেত্র বলে। অভিনেত্রর দুপ্রান্তেই উত্তল (concave) লেন্স লাগানো থাকে। এই লেন্সের মোট বিবর্ধক ক্ষমতা, অভিনেত্রর গায়ে লেখা থাকে, সাধারণত এই ক্ষমতা $5\times$ বা $10\times$ হয়।

(2) অভিলক্ষ্য (objecticve) : নাসিকার চাকতির গর্তে ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্যের যে ক্ষুদ্রাকারের নল সংযুক্ত থাকে তাদের অভিলক্ষ্য বলে। এদের মুক্ত প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন বিবর্ধক ক্ষমতা যুক্ত উত্তল লেন্স লাগানো থাকে। সাধারণভাবে খর্বাকারের অভিলক্ষ্যটি কম শক্তি সম্পন্ন (low power) এবং দীর্ঘাকারের অভিলক্ষ্যটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন (high power) হয়। কম ও উচ্চ বিবর্ধকক্ষমতা সম্পন্ন অভিলক্ষ্য লেন্সের বিবর্ধক ক্ষমতা যথাক্রমে $10\times$ ও $40\times$ হয়।

(3) দর্পণ (mirror) : পাদদেশের ওপরে এবং মঞ্চের নীচে স্তম্ভের সঙ্গে সামনের দিকে একটি গোলাকার, সঞ্চালনশীল সমাবতল (plano-concave) দর্পণ থাকে। দর্পণটিকে আলোক উৎসের দিকে ঘুরিয়ে পর্যাপ্ত আলোকরশ্মিকে মঞ্চের ছিদ্রপথে পরীক্ষাধীন বস্তুর দিকে প্রতিফলিত করা হয়।

(4) কনডেনসার বা সমাহরক (condenser) : মঞ্চের ঠিক নীচে দুটি লেন্স সমন্বয়ে গঠিত যে যন্ত্রাংশ দর্পণ কর্তৃক প্রতিফলিত রশ্মিকে বস্তুর দিকে অভিমুখী (convergent) করে, তাকে কনডেনসার বলে।

(5) মধ্যচ্ছদা বা ডায়াফ্রাম (diaphragm) : কনডেনসারের সাথে যুক্ত কয়েকটি ছিদ্রসহ গোলাকারের ধাতুপাত। এর সাহায্যে মঞ্চের ছিদ্রপথে কম বা বেশি আলো প্রবেশ করানো যায় (চিত্র নং 2)।

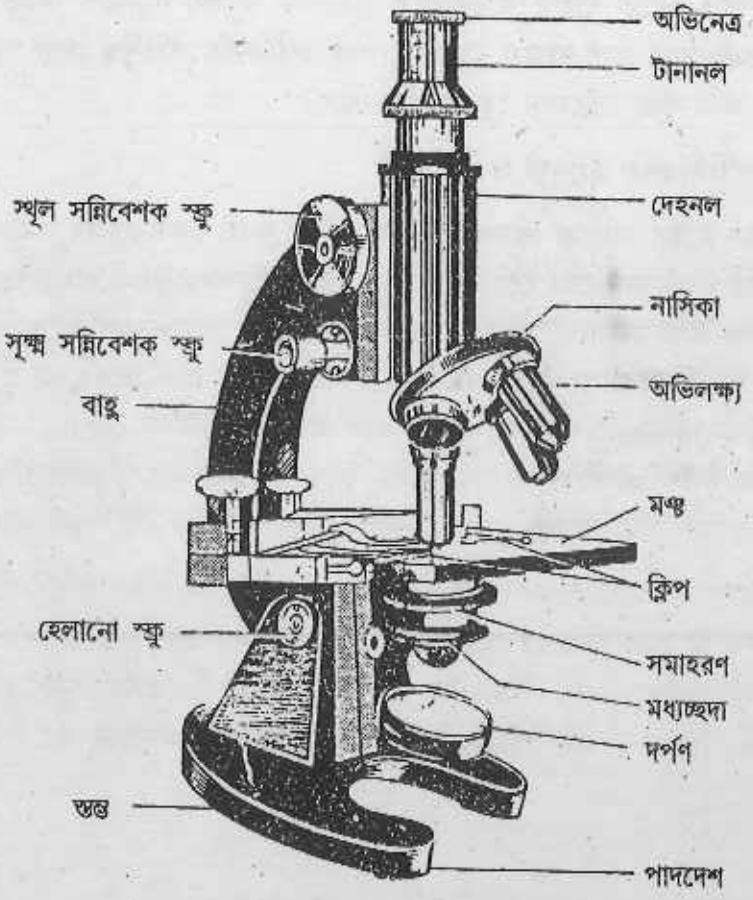

চিত্র নং 2 : যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্র

3.4.1 যৌগিক অণুবীক্ষণের ব্যবহার বিধি

যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য কোনও বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করার সময় কিছু সাধারণ নিয়মাবলী অনুসরণ করা উচিত। যন্ত্রের সাথে আলোক উৎস সংযুক্ত না থাকলে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রটিকে একটি আলোকপূর্ণ অনুভূমিক স্থানে রাখতে হবে। এরপর, অভিনেত্রর ওপর চোখ রেখে, নিম্নশক্তি সম্পন্ন অভিলক্ষ্যকে ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে মঞ্চের ছিদ্রের সাথে একই লম্বরেখায় আনতে হবে। পরীক্ষাধীন নমুনাকে (কাচের স্লাইড বা অন্য কোনও স্বচ্ছ পাতের একই লম্বরেখায় আনতে হবে)। পরীক্ষাধীন নমুনাকে (কাচের স্লাইড বা অন্য কোনও স্বচ্ছ পাতের ওপর স্থাপিত) মঞ্চের ওপর এমনভাবে রাখতে হবে যে নমুনাটি যেন অভিলক্ষ্য লেন্সের ঠিক নীচে এবং মঞ্চের ছিদ্রের ঠিক ওপরে থাকে। এরপর অভিনেত্রর ওপর চোখ রেখে, দর্পণের অবতল দিককে আলোর উৎসের দিকে এমনভাবে ঘোরাতে হবে যেন আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে মধ্যচ্ছদা, কনডেনসার ও মঞ্চের ছিদ্র হয়ে নমুনাতে প্রবেশ করে।

তারপর, স্থূল সন্নিবেশক স্ক্রুকে ঘুরিয়ে অভিলক্ষ্যকে ওঠা-নামা করিয়ে নমুনাকে ঠিকভাবে ফোকাস করতে হবে, যাতে অভিনেত্রে চোখ রাখলে নমুনাটির স্পষ্ট ও বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব দেখা যায়। নমুনাকে আরও স্পষ্ট দেখার জন্য সূক্ষ্ম সন্নিবেশন স্ক্রু ঘোরাতে হবে।

3.4.2 যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যপ্রণালী

যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কোনও নমুনাকে পরীক্ষা করার সময় প্রথমে সমাবতল দর্পণের সাহায্যে আলোকরশ্মিকে কনডেনসারের মধ্যে প্রেরণ করা হয়। কনডেনসারটি আলোকরশ্মিকে অভিসারী রশ্মিরূপে, মঞ্চের ওপর রাখা নমুনাতে প্রেরণ করে। অভিলক্ষ্য লেন্স তখন নমুনা থেকে প্রেরিত বিভিন্ন রশ্মিকে সংগ্রহ করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দেহনলের মধ্যে একটি প্রতিবিম্ব গঠন করে। এই প্রতিবিম্বটি সদ্ (real) অদৃশ্য, অবশীর্ষ (inverted) ও বিবর্ধিত হয়। একে প্রাথমিক প্রতিবিম্ব (primary image) বলা হয়। Abbe প্রবর্তিত নীতি অনুসারে, নমুনার বিভিন্ন অংশ থেকে নির্গত আলোকরশ্মি, অভিলক্ষ্য লেন্সের পশ্চাতে কিন্তু অভিনেত্র লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মধ্যে প্রাথমিক প্রতিবিম্বটি গঠন করে।

পরবর্তী পর্যায়ে, অভিনেত্র লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মধ্যে গঠিত প্রাথমিক প্রতিবিম্বটি, অভিনেত্রর বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়। এই প্রতিবিম্ব থেকে রশ্মি তখন অভিনেত্র লেন্সের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করে নমুনা বা বস্তুর একটি অসদ্ (virtual), অবশীর্ষ ও আরও বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠন করে, যা গৌণ প্রতিবিম্ব (secondary image) নামে পরিচিত। এই অসদ্ প্রতিবিম্বই মানুষের চোখে দৃশ্যমান হয় (চিত্র নং 3)।

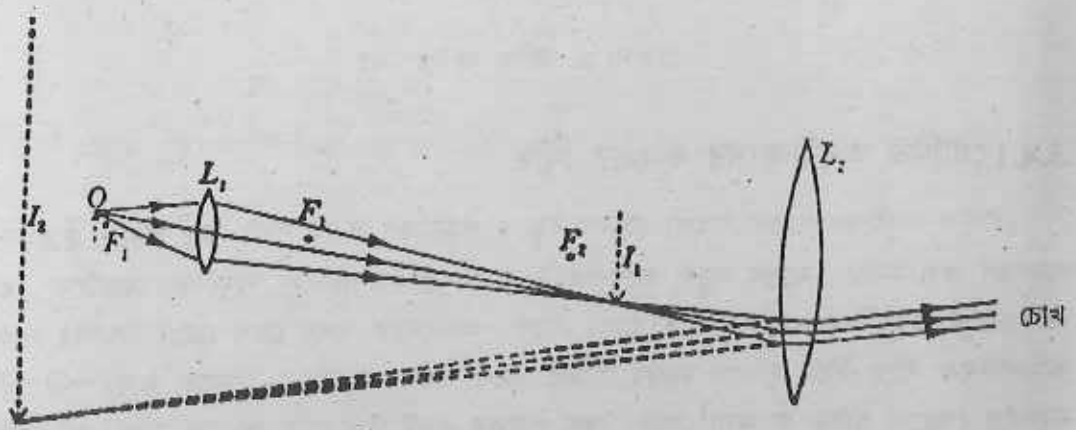

চিত্র নং 3 :যৌগিক আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্র কর্তৃক বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন। O = বস্তু, L_1 = অভিলক্ষ্য লেন্স, L_2 = অভিনেত্র লেন্স I_1 = প্রাথমিক সদ প্রতিবিম্ব, I_2 = বিবর্ধিত অসদ্ গৌণ প্রতিবিম্ব। F_1 = অভিলক্ষ্য লেন্সের মুখ্য ফোকাস, F_2 = অভিনেত্র লেন্সের মুখ্য ফোকাস।

3.4.3 যৌগিক অণুবীক্ষণে জীবদেহাংশ পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সমূহ

যৌগিক আলোক অণুবীক্ষণের সাহায্যে ক্ষুদ্রাকারের পূর্ণাঙ্গ জীব বা জীবদেহের অংশবিশেষ বা কলাকোষকে পর্যবেক্ষণ করার পূর্বে ঐসব নমুনাদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়। প্রধানত নিম্নলিখিত পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে পরীক্ষাধীন নমুনাদের অতিবাহিত করা হয়।

(ক) সংজ্ঞাহীন অবস্থা বা হত্যা **(killing)** ঃ প্রথমে সদ্যমৃত বা সংজ্ঞাহীন জীবদেহ থেকে পরীক্ষাধীন বা সংজ্ঞাহীন নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

(খ) সংরক্ষণ **(fixation)** ঃ সংগৃহীত নমুনাকে তৎক্ষণাৎ কিছু রাসায়নিক দ্রবণে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখা হয়। এর ফলে, সংগৃহীত কলার নমুনা জীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় ; তাদের আয়তন ও জৈব যৌগের প্রকৃতি ঠিক থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুয়িন্স ফ্লুয়িড (Bouin's fluid) নামক সংরক্ষক ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে সম্পৃক্ত পিকরিক অ্যাসিড, ফরমালিন ও গ্লেসিয়াল অ্যাসেটিক অ্যাসিড থাকে যথাক্রমে 75 মিলি, 25 মিলি ও 5 মিলি এই অনুপাতে।

(গ) জল দূরীকরণ **(dehydration)** ঃ এই পর্যায়ে সংরক্ষিত নমুনাদের অ্যালকোহলের ক্রমঊর্ধ্বমুখী ধাপের (যেমন 50% → 70% → 90% → 100%) মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করে কলাকোষ বা নমুনা থেকে জল অপসারিত করা হয়।

(ঘ) প্রতিস্থাপন ও ছেদন **(embedding and sectioning)** ঃ এই পর্যায়ে নমুনাকে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্যারাফিন জাতীয় পদার্থের মধ্যে স্থাপিত করা হয় এবং মাইক্রোটোম (microtome) নামক যন্ত্রের সাহায্যে কলাকেষসহ প্যারাফিন খণ্ড (block) থেকে অতি পাতলা (5 – 7 μm পুরু) স্তর (section) তৈরি করা হয় ও কাচের স্লাইডের ওপর কলাকোষের পাতলা স্তরটিকে (section) আটকানো হয়।

(ঙ) রঞ্জন **(staining)** ঃ বিভিন্ন রঞ্জক যেমন ইওসিন (Eosin), হিমাটক্সিলিন (Haematoxylin), লাইট গ্রিন (light green) প্রভৃতির সাহায্যে কলাকোষের প্রকৃতি অনুসারে তাদের রঞ্জিত করা হয়।

রঞ্জিত নমুনাকে অণুবীক্ষণের বিভিন্ন বিবর্ধনে পর্যবেক্ষণ করা হয়। উপরিউক্ত প্রক্রিয়া ছাড়াও বিভিন্ন নমুনাদের তাৎক্ষণিক ভাবে এবং বর্ণহীন অবস্থায়, অণুবীক্ষণে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

3.5 আলোক অণুবীক্ষণের প্রয়োগ

যৌগিক আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে—

(1) মানুষের দৃষ্টির অগোচরে যে কোনও ক্ষুদ্র বস্তুকণা বা জীব, যেমন—এককোষী প্রাণী (অ্যামিবা, এককোষী শ্যাওলা (ক্ল্যামাইডোমোনাস), জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাস) প্রভৃতিকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

(2) জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কলার গঠন, কোষবিন্যাস পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব।

(3) রক্তের নমুনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, রক্ত কোষের সংখ্যা গণনা, রক্তে প্রবিষ্ট জীবাণুর প্রকৃতি, রক্ত কোষ গঠনের পরিবর্তন ইত্যাদি ফলাফল দেহের বিভিন্ন রোগনির্ণয়ে সাহায্য করে।

(4) স্বাভাবিক কলাকোষ ও রোগাক্রান্ত কলাকোষের গঠনগত পার্থক্যের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ ক্যানসার, টিউমার প্রভৃতি রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

(5) জল, পানীয় বা খাদ্যবস্তুতে জীবাণু বা দূষক পদার্থের উপস্থিতি নির্ণয় করা সম্ভব।

(6) থুথু, মল-মূত্র ইত্যাদির নমুনা পর্যবেক্ষণ করে, উক্ত নমুনাতে জীবাণুর উপস্থিতি ও তৎসংক্রান্ত রোগনির্ণয় সম্ভব।

এছাড়া যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে পঠনপাঠন, গবেষণা, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিবিধ প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

3.6 কিছু বিশেষ ধরনের আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

3.6.1 ডার্ক ফিল্ড অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Darkfield microscope)

সাধারণ যৌগিক অণুবীক্ষণে যেসব বস্তুকণাদের অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়, ডার্কফিল্ড অণুবীক্ষণে তাদের পরিষ্কারভাবে দৃশ্যমান করা সম্ভব। যৌগিক অণুবীক্ষণে ব্যবহৃত কনডেনসারের পরিবর্তে এই যন্ত্রে ভিন্ন প্রকৃতির কনডেনসার ব্যবহার করা হয়, যার মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি তির্যকভাবে বস্তুতে আপতিত হয়। এর ফলে, বস্তু থেকে আলো সরাসরি অভিলক্ষ্য লেন্সে প্রবেশ করে না। এই কারণে অভিনেত্রর মধ্যে দিয়ে বস্তু বা নমুনাকে উজ্জ্বল কিন্তু পশ্চাৎপটকে অন্ধকার দেখায়। এই কারণেই এই অণুবীক্ষণের নাম ডার্ক ফিল্ড বা অন্ধকার ক্ষেত্র অণুবীক্ষণ। ভাসমান ব্যাকটেরিয়াদের পর্যবেক্ষণ এই অণুবীক্ষণে খুবই কার্যকরী হয়। তবে এই অণুবীক্ষণের বিশ্লেষক ক্ষমতা খুব বেশি হয় না।

3.6.2 পোলারাইজেশন অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Polarization microscope)

সাধারণ যৌগিক অণুবীক্ষণে কিছু যন্ত্রাংশের সংযোজন ঘটিয়ে এই অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করা হয়। এই অণুবীক্ষণের বিশ্লেষক ক্ষমতা সাধারণ অণুবীক্ষণের চেয়ে অনেক বেশি হয়। এই যন্ত্রে দুটি যন্ত্রাংশ থাকে ; যথা—(1) কনডেনসারের নিম্নভাগে পোলারাইজার (polarizer) নামক অংশ এবং (2) অভিলক্ষ্য লেন্সের ওপর অ্যানালাইজার (Anzlyzer) নামক অংশ। এই দুটি যন্ত্রাংশের সাহায্যে আলোকরশ্মিদের মেরুকেন্দ্রিক (Polarize) করা হয়। কোষের মধ্যে কিছু অঙ্গাণু থাকে যাদের বাইফ্রিনজেন্ট (bifringent) বলা হয়, যেমন, পেশীতন্তু। এদের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পৃথক হওয়ায়, এদের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত আলোর প্রতিসরণ গুণাঙ্ক (n) পৃথক পৃথক হয়। পোলারাইজেশন অণুবীক্ষণের সাহায্যে ঐসব অঙ্গাণুদের গঠনের প্রতিটি সূক্ষ্মস্তরকে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

3.6.3 প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Fluorescent microscope)

অদৃশ্য অতিবেগুনি রশ্মি (ultraviolet ray বা UV ray) বা UV-রশ্মির সাহায্যে কোষের বিভিন্ন

রাসায়নিক বস্তুকে প্রতিপ্রভ বস্তুতে রূপান্তরিত করে, তাদের তাদের দৃশ্যমান করা হয়, প্রতিপ্রভ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে। বিস্তারিত গঠন ও কাজের জন্য UNIT-4 এর দ্বিতীয় অংশ দেখুন।

3.6.4 ফ্রেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Phase contrast microscope)

এই বিশেষ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে, প্রায় অদৃশ্য ও স্বচ্ছ প্রতিসরণ গুণাঙ্কের (n) পার্থক্যকে উজ্জ্বলতার পার্থক্যে পরিণত করে, তাদের দৃশ্যমান করা হয়। Unit-4 এর প্রথম অনুচ্ছেদ দেখুন।

3.6.5 ইন্টারফেরেন্স অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Interference microscope)

ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মূলনীতিকে অনুসরণ করেই এই অণুবীক্ষণ গঠিত হয়। কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুদের প্রতিসরণ গুণাঙ্কের (n) প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটিয়ে এই অণুবীক্ষণ সজীব কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুদের প্রায় রঙিন ভাবে দৃশ্যমান করে তোলে।

3.7 অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(i) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(1) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রধান দুটি কার্যক্ষমতা হল _____ ও _____।

(2) যৌগিক অণুবীক্ষণে ব্যবহৃত দর্পণটি _____ ধরনের হয়।

(3) _____ স্ক্রুর সাহায্যে দেহনলকে দ্রুত ওঠানামা করানো যায়।

(4) যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গঠিত গৌণ প্রতিবিম্ব _____ প্রকৃতির হয়।

(5) ভাসমান ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণে উপযুক্ত অণুবীক্ষণের নাম।

(ii) এক কথায় উত্তর দিন ঃ

(1) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধক ক্ষমতা কিসের ওপর নির্ভর করে ?

(2) বিশ্লেষণ মাত্রা কাকে বলে ?

(3) লেন্সের নিউম্যারিকাল অ্যাপারচার বলতে কি বোঝায় ?

(4) সাধারণ যৌগিক অণুবীক্ষণের বিশ্লেষক ক্ষমতা কত হয়।

(5) টানানলের কাজ কি ?

(6) কনডেনসারের কাজ কি ?

(7) যৌগিক অণুবীক্ষণে প্রাথমিক প্রতিবিম্ব কোথায় গঠিত হয় ?

(8) যৌগিক অণুবীক্ষণে জীব দেহাংশ পর্যবেক্ষণের জন্য সংরক্ষণ করা হয় কেন ?

(9) পোলারাইজেশন অণুবীক্ষণে কি ধরনের কোষাঙ্গাণু ভালোভাবে দেখা যায় ?

(10) যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে অভিলক্ষ্য লেন্স কোথায় থাকে ?

(iii) ভুল বা ঠিক নির্দেশ করুন ঃ

(1) প্রাথমিক প্রতিবিম্বটি অসদ্ হয়।

(2) স্থূল সন্নিবেশক স্ক্রুকে ঘুরিয়ে পরীক্ষাধীন নমুনার ফোকাস ঠিক করা হয়।

(3) ডায়াফ্রামের সাহায্যে মঞ্চের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে আলোর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

(4) দৃশ্যমান বর্ণালী তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চেয়ে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বস্তুকে দৃশ্যমান করতে পারে।

(5) অণুবীক্ষণের বিশ্লেষক ক্ষমতা, বিশ্লেষণ মাত্রার সাথে সমানুপাতে সম্পর্কিত।

(6) অণুবীক্ষণের বিবর্ধন ক্ষমতা, তার বিশ্লেষক ক্ষমতা দিয়ে প্রভাবিত হয়।

(খ) মাঝারি প্রশ্ন ঃ

(1) অণুবীক্ষণের বিশ্লেষক ক্ষমতা কাকে বলে ? এটি কিভাবে পরিমাপ করা যায় ?

(2) অণুবীক্ষণের আলোক নিয়ন্ত্রক অংশগুলো কি কি ? তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখুন।

(3) যৌগিক অণুবীক্ষণ ব্যবহারের সময় কি কি বিধি মানা উচিত ?

(4) ডার্কফিল্ড অণুবীক্ষণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

(5) যৌগিক আলোক অণুবীক্ষণের প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।

(গ) বড় প্রশ্ন ঃ

(1) যৌগিক অণুবীক্ষণের মৌলিক কার্যক্ষমতা সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

(2) চিহ্নিত চিত্রের সাহায্যে অণুবীক্ষণের কার্যনীতি বর্ণনা করুন।

(3) যৌগিক অণুবীক্ষণের একটি চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন করুন।

(4) যৌগিক অণুবীক্ষণের জীবদেহাংশ পর্যবেক্ষণের জন্য নমুনাকে কিভাবে প্রস্তুত করা হয়, তার বিবরণ লিখুন।

(5) জীববিজ্ঞানে আলোক অণুবীক্ষণের কিছু ব্যবহারের কথা উল্লেখ করুন।

(6) সাধারণ যৌগিক অণুবীক্ষণ, ডার্কফিল্ড অণুবীক্ষণ ও পোলারাইজেশন অণুবীক্ষণের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

3.8 উত্তরাবলী

(ক) i. (1) বিবর্ধক ক্ষমতা ও বিশ্লেষক ক্ষমতা (2) সমাবতল (3) স্থূল সন্নিবেশক (4) অসদ্ (5) ডার্কফিল্ড অণুবীক্ষণ যন্ত্র।

ii. (1) যৌগিক অণুবীক্ষণে ব্যবহৃত অভিলক্ষ্য লেন্স ও অভিনেত্র লেন্সের বিবর্ধন ক্ষমতার গুণফলের ওপর নির্ভর করে।

(2) 3.3.3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য (3) 3.3.3 অনুচ্ছেদ দেখুন (4) 500 nm-এর কাছাকাছি হয় (5) 3.4 অনুচ্ছেদের 6নং পয়েন্ট দেখুন (6) 3.4 অনুচ্ছেদের খ অংশের 4নং পয়েন্ট দেখুন (7) 3.4.2 অনুচ্ছেদ দেখুন (8) দেহাংশের নমুনাকে সংরক্ষিত করলে, তার আয়তন ও আকার ঠিক থাকে এবং নমুনাতে অবস্থিত জৈব যৌগের প্রকৃতি ঠিক থাকে। (9) পেশীতন্তু জাতীয় (10) নাসিকা চাকতির গর্তে অবস্থিত অভিলক্ষ্যের তলায় অভিলক্ষ্য লেন্স থাকে। পর্যবেক্ষণের সময় এই লেন্স পরীক্ষাধীন নমুনার ঠিক ওপরেই অবস্থান করে।

(iii). (1) ভুল (2) ভুল (3) ঠিক (4) ঠিক (5) ভুল (6) ভুল।

(খ) (1) অনুচ্ছেদ 3.3.3 দেখুন।

(2) অনুচ্ছেদ 3.4-এর 'খ' অংশ দেখুন।

(3) অনুচ্ছেদ 3.4.1 দেখুন।

(4) অনুচ্ছেদ 3.6.1 দ্রষ্টব্য।

(5) 3.6 অনুচ্ছেদের সম্পূর্ণ অংশ দেখুন।

(গ) (1) সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ 3.3।

(2) অনুচ্ছেদ 3.4.2 ও চিত্র নং 3 দেখুন।

(3) চিত্র নং 2 দেখুন।

(4) অনুচ্ছেদ 3.4.3 দেখুন।

(5) অনুচ্ছেদ 3.5 দেখুন।

(6) অনুচ্ছেদ 1-6 দেখুন।

একক 4 ❐ ফ্রেজ কনট্রাস্ট ও প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ তত্ত্ব
(Phase Contrast and Fluorescence Microscopy)

গঠন ঃ

4.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

4.2 সংজ্ঞা ঃ ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র

4.3 মূলনীতি ঃ ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মূলনীতি

4.4 ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গঠন

4.5 ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যপদ্ধতি

4.6 জীববিজ্ঞানে ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণের প্রয়োগ

4.7 অনুশীলনী

4.8 উত্তরাবলী

4.9 সংজ্ঞা ঃ প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ যন্ত্র

4.10 প্রতিপ্রভা বা স্টোকস্ প্রতিক্রিয়া

4.11 প্রতিপ্রভা এবং প্রতিপ্রভ বস্তুর শ্রেণীবিভাগ

4.11.1 স্বপ্রতিপ্রভা ও স্বপ্রতিপ্রভ বস্তু

4.11.2 গৌণ প্রতিপ্রভা ও গৌণ প্রতিপ্রভ বস্তু

4.11.3 মেটাক্রোমাটিক প্রতিপ্রভা

4.12 প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গঠন বৈশিষ্ট্য

4.13 প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যপদ্ধতি

4.14 জীববিজ্ঞানে প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োগ

4.15 অনুশীলনী

4.16 উত্তরমালা

4.17 সাধারণ অনুশীলনী

4.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা ঃ চিকিৎসাবিদ্যা, গবেষণা, পঠনপাঠন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেকসময় সজীব কোষের পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন হয়। সজীব কোষের বিভিন্ন অংশের উজ্জ্বলতা প্রায় সমান হওয়ায়, যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কেষের বিভিন্ন অংশ স্বচ্ছ রূপে প্রতীয়মান হয় না। ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রে (phase-contrast microscope), কিছু যন্ত্রাংশের সাহায্যে কোষের বিভিন্ন অংশের মধ্যে এবং কোষ ও তার পশ্চাৎপটের মধ্যে উজ্জ্বলতার পার্থক্য ঘটানো হয়। বিশেষ প্রণালীতে, এই অণুবীক্ষণ যন্ত্র, পরীক্ষাধীন বস্তু বা নমুনা থেকে নির্গত আলোকরশ্মিকে, বস্তুর পশ্চাৎপট থেকে নির্গত আলোকরশ্মি থেকে পৃথক করতে পারে। ফলে রঞ্জককে (dye) রঞ্জিত না হয়েই সজীব কোষ ও তার বিভিন্ন অংশ সুন্দরভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এই অণুবীক্ষণের সাহায্যে সজীব কোষের গঠন, কলাকোষে জীবাণুর উপস্থিতি, কোষের বিভাজন, কোষের খাদ্যগ্রহণ ও বর্জন প্রভৃতি সচল প্রক্রিয়া বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

বিভিন্ন রাসায়নিক জৈব যৌগ যে শুধুমাত্র কোষেদেহের বিভিন্ন অংশ গঠন করে তাই নয়, কোষের বিভিন্ন বিপাকীয় কাজেও ঐসব জৈব যৌগ মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সাধারণভাবে এইসব যৌগের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা বা প্রমাণ করা, যৌগিক অণুবীক্ষণের সাহায্যে সম্ভবপর হয় না। প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে (Fluorescence microscope) সাধারণ দৃশ্যমান আলোর পরিবর্তে ব্যবহৃত অদৃশ্য UV তরঙ্গ, কোষের কিছু রাসায়নিক পদার্থকে প্রতিপ্রভ (fluorescent) করে তোলে বা নির্দিষ্ট বর্ণের আলোক বিকিরণকারী দশায় উপনীত করে। শুধু তাই নয়, কোষকে যদি সাধারণ রঞ্জকের পরিবর্তে, বিশেষ কিছু বস্তুর (প্রতিপ্রভ বস্তু) সাথে সংযুক্তি ঘটানো হয়, তাহলে UV তরঙ্গের সাহায্যে ঐসব সংযুক্ত বস্তুদের সহজেই শনাক্তকরণ সম্ভব হয়। প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ যন্ত্র এইভাবে কোষের বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের উপস্থিতি নির্ণয়ে, চিকিৎসাশাস্ত্রে বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে, কোষের সংকরায়ণ বা নিউক্লীয় অম্ল যথা D.N.A ও R.N.A-এর সংকরায়ণের ফলাফল বিশ্লেষণ বিশেষভাবে সহায়তা করে।

উদ্দেশ্য ঃ আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের এক গঠন ও কার্যগত বিবর্তনে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হল ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ (Phase contrast microscope) ও প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণের (Fluore scence microscope) আবিষ্কার। যৌগিক অণুবীক্ষণে দৃশ্যমান কোষের সার্বিক গঠন—কোষবিদ্, জৈবরসায়নিবদ্ ও জৈব পদার্থবিদ্দের অনুসন্ধিৎসাকে সম্পৃক্ত করতে পারল না। আলোক শক্তিকে তাই অন্যভাবে ব্যবহার করা হল এই দুই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যপ্রণালীতে।

যৌগিক অণুবীক্ষণের সাহায্যে কলাকোষ পর্যবেক্ষণের সময় প্রথমেই সংশ্লিষ্ট জীবদের হত্যা করা হয় এবং পরবর্তী কালে কলাকোষকে সংরক্ষণ (flixation), রঞ্জন (staining) ইত্যাদি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে চালনা করা হয়। এই ক্ষেত্রে কোষের চলমান ঘটনাবলীকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। অথচ কোষের মধ্যে প্রতিনিয়ত ঘটে যাচ্ছে অজস্র প্রক্রিয়া। যৌগিক অণুবীক্ষণের সাথে কিছু আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশের সংযোজন ঘটিয়ে কিভাবে কলাকোষদের সজীব অবস্থাতেই পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে, তা আমরা জানতে পারব ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণের আলোচনাতে।

দৃশ্যমান বর্ণালী (visible sprectum) ছাড়া, আলোর যেসব অদৃশ্য তরঙ্গ আছে, তারা জীবকোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুর রাসায়নিক যৌগের সাথে কিভাবে প্রতিক্রিয়া করে, ঐসব আপাতঃ অদৃশ্য বস্তুদের দৃশ্যমান করে তুলতে সক্ষম হয়, তা আমরা জানতে পারব প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণের আলোচনাতে।

4.2 সংজ্ঞা ঃ ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Phase contrast microscope)

যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র, বিভিন্ন স্বচ্ছ ও অদৃশ্য বস্তুর (পরীক্ষাধীন) প্রতিসরণ গুণাঙ্কের (refractive index) পার্থক্যকে উজ্জ্বলতার পার্থক্যে রূপান্তরিত করে, ঐ সব স্বচ্ছ ও অদৃশ্য বস্তুকে দৃশ্যমান করে তুলতে পারে, তাকে ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলা হয়। জীবপদার্থবিদ্যার যে শাখায় এই যন্ত্রের গঠন ও কার্যপ্রণালী আলোচিত হয়, তা ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ তত্ত্ব (phase contrast microscop)।

4.3 ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মূলনীতি

কোষে অবস্থিত বিভিন্ন অঙ্গাণুদের মধ্যে বিভিন্ন অনুপাতে অজৈব ও জৈব অণু, যথা, ডি.এন. এ (D.N.A) এর আর.এন.এ (R.N.A) প্রোটিন, লিপিড, শর্করা, লবণ, জল প্রভৃতি থাকে। ফলে, এই সকল অঙ্গাণুদের প্রতিসরণ গুণাঙ্ক ভিন্ন ভিন্ন হয়। ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র, প্রতিসরণ গুণাঙ্কের পার্থক্যকে বস্তুর আপাত উজ্জ্বলতার পার্থক্যে রূপান্তরিত করে। এই রূপান্তরের ফলে পরীক্ষাধীন বস্তুর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত বিভিন্ন আলোক তরঙ্গ পরস্পরের সাথে অন্তঃক্রিয়া করে, ফলস্বরূপ, কিছু অঙ্গাণু আপাতভাবে অধিক উজ্জ্বল ও কিছু অঙ্গাণু অনুজ্জ্বল হয়। উজ্জ্বলতার এই পার্থক্যের জন্য কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণু বা বস্তুদের পৃথক পৃথক ভাবে দেখা যায়।

4.4 ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গঠন

ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রে, কনডেনসার লেন্সের পশ্চাতে একটি আংটির মতো পর্দা (annular diaphragm) থাকে। এই পর্দা আলোকরশ্মিকে ফাঁপা শঙ্কুর আকারে পরীক্ষাধীন বস্তু বা নমুনার ওপর আপতিত হতে সাহায্য করে। এছাড়া এই অণুবীক্ষণে, অভিলক্ষ্যর পশ্চাৎ ফোকাস-তলে একটি স্বচ্ছ ফেজ প্লেট (transparerit phase plate) থাকে। এর কেন্দ্রীয় অংশে একটি আংটির মতো গর্ত (annular groove) আছে। এই ফেজপ্লেটের বিভিন্ন স্থানে দশা প্রতিবন্ধক পদার্থ (phase retarding material) স্থাপন করে, পরীক্ষাধীন বস্তু থেকে নির্গত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন ঘটানো হয় (চিত্র নং 1)।

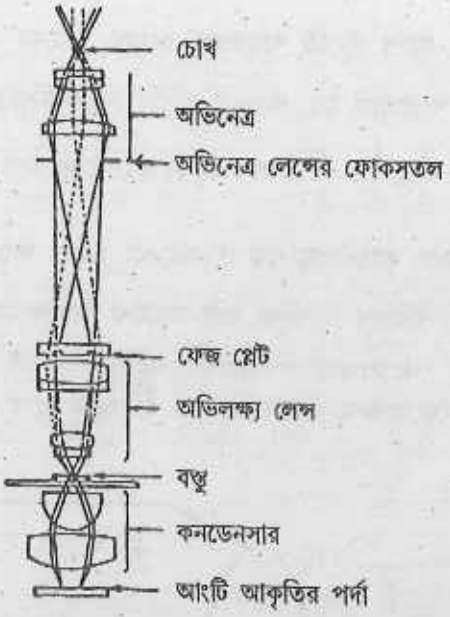

চিত্র নং 1 : ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

4.5 ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যপদ্ধতি

কোষের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত অঙ্গাণুদের ঘনত্ব ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায়, তাদের প্রতিসরণ গুণাঙ্কের মানও পৃথক হয়। যেমন কোষের পরিধি ও কেন্দ্রস্থ নিউক্লিয়াসের ঘনত্ব বেশি হওয়ায় এসব অঞ্চলের প্রতিসরণ গুণাঙ্কও বেশি হয়। অন্যদিকে, অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বযুক্ত অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত আলোর প্রতিসরণ গুণাঙ্ক কম হয়। এছাড়া, কোষকে পর্যবেক্ষণ করার সময় তাদের যে মাধ্যমে রাখা হয়, তার প্রতিসরণ গুণাঙ্কের সাথে কোষের প্রতিসরণ গুণাঙ্কের পার্থক্য থাকে।

কোষের অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্ব ও কম প্রতিসরণ গুণাঙ্কযুক্ত অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত আলোকরশ্মির গতিবেগ মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু কোষের পুরু ও বেশি প্রতিসরণ গুণাঙ্কযুক্ত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আলোকরশ্মির তরঙ্গের বিস্তার (amplitude) অপরিবর্তিত থাকলেও, তার গতিবেগ (velocity) বাধাপ্রাপ্ত ও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এইভাবে বিভিন্ন অঙ্গাণুর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত আলোর গতিবেগের বাধাপ্রাপ্তিকে (retardation in velocity of light) ফেজ পরিবর্তন বা দশা পরিবর্তন (phase change) বলা হয়। এই দশা পরিবর্তন আলোর প্রকৃত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের প্রায় $\frac{1}{4}$ অংশ হয়। ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণে উল্লেখিত দশা পরিবর্তনকে বিভিন্নভাবে বিবর্ধিত ও পরিবর্তিত করা হয়। যেমন—অন্ধকার বা ধনাত্মক ফেজ কনট্রাস্ট (dark or positive phase contrast) পদ্ধতিতে, ফেজ প্লেটের পরিধির কাছে দশা প্রতিবন্ধক বস্তুদের স্থাপন করা হয়। ফলে কোষের পরিধি থেকে নির্গত আলোকরশ্মি,

যাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের $\frac{1}{4}$ অংশ পূর্বেই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের $\frac{1}{4}$ অংশ পুনরায় ঐ প্রতিবন্ধক বস্তুর মাধ্যমে বাধাপ্রাপ্ত হয়, অতএব পরিধি থেকে নির্গত আলোকরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মোট বাধাপ্রাপ্তির পরিমাণ হয়—$\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$ অংশ। এইভাবে কোষের মধ্য অংশ থেকে প্রবাহিত আলোকরশ্মির তুলনায় পরিধি থেকে নির্গত আলোকরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য, প্রকৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের $\frac{1}{2}$ বা অর্ধেক হয়। ফলে কোষমধ্যস্থ বাধাহীন ও পরিধির বাধাযুক্ত আলোকরশ্মি পরস্পরকে বাতিল করার চেষ্টা করে। এই ঘটনাকে ধ্বংসাত্মক বাধা (destructive interference) হয়। এই ধরনের বাধাপ্রাপ্তির ফলে কোষকে তার চারপাশের মাধ্যম থেকে কম আলোকিত বা অনুজ্জ্বল বলে মনে হয় (চিত্র নং 2)।

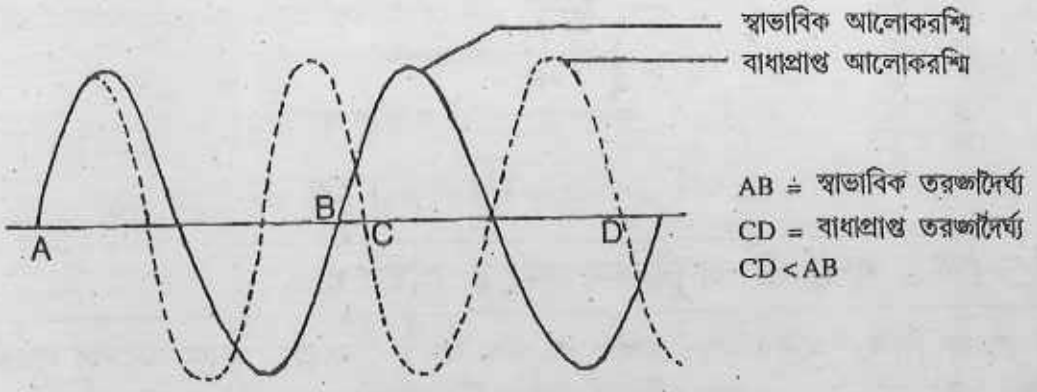

চিত্র নং 2 : ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণে পরীক্ষাধীন
বস্তুর পুরু অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত আলোকরশ্মির দশা পরিবর্তন।

অন্যদিকে, উজ্জ্বল বা ঋণাত্বক ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণে (Bright or negative phase contrast) দশা প্রতিবন্ধক বস্তুদের ফেজ প্লেটের কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়। ফলে কোষের কেন্দ্র থেকে নির্গত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য $\frac{1}{4}$ অংশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। কোষের পরিধি থেকে নির্গত আলো পূর্বেই $\frac{1}{4}$ অংশ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। এই ভাবে কেন্দ্রের বাধাপ্রাপ্ত আলো (তরঙ্গদৈর্ঘ্যের $\frac{1}{4}$) অংশ এবং পরিধির বাধাপ্রাপ্ত (তরঙ্গদৈর্ঘ্যের $\frac{1}{4}$ অংশ) আলো একত্রে পরস্পরকে বেশি শক্তিশালী তথা উজ্জ্বল করে তোলে। এই ঘটনাকে গঠনমূলক বাধা (constructive interference) বলা হয়। এই ধরনের বাধাপ্রাপ্তির ফলে কোষ বা বস্তুকে তার চারপাশের মাধ্যম অপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল মনে হয়। এইভাবে ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ, প্রতিসরণ গুণাঙ্কের অল্প পার্থক্যযুক্ত বিভিন্ন অঙ্গাণুর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত আলোর

তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে তাদের উজ্জ্বলতাকে পৃথক করে তোলে এবং কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুদের প্রকৃত চিত্র প্রদান করে। এই অণুবীক্ষণে সজীব কোষের বিভিন্ন অংশকে ধূসর, সাদা বা বেশি উজ্জ্বল এবং কালো বা কম উজ্জ্বল দেখায়।

4.6 জীববিজ্ঞানে ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণের প্রয়োগ

(1) এই অণুবীক্ষণের সাহায্যে সজীব কোষ ও কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা যায়।

(2) সজীব কোষের বিভাজন যথা—মাইটোসিস ও মিয়োসিস কোষ বিভাজনকালে কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুর আকৃতিগত পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা যায়।

(3) সজীব কোষে পিনোসাইটোসিস (pinocytosis) বা তরলগ্রহণ এবং ফ্যাগোসাইটোসিস (phagocytosis) বা কঠিন বস্তু গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা যায়।

(4) রক্ত, মল-মূত্র, থুথু প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট জীবাণুদের সরাসরি পর্যবেক্ষণ করে সংশ্লিষ্ট জীবের রোগ নির্ণয় করা যায়।

4.7 অনুশীলনী

(1) ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র কাকে বলে? এই যন্ত্রের গঠনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

(2) ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র কত প্রকারের হয় ও কি কি? কিসের ভিত্তিতে এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রকে ভাগ করা হয়। এদের মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান কোষের উজ্জ্বলতা কখন কি রকম হবে?

(3) এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যনীতি কিসের ওপর নির্ভর করে?

(4) এই যন্ত্রের সুবিধা কি কি?

(5) দশা পরিবর্তন কাকে বলে?

4.8 উত্তরাবলী

(1) অনুচ্ছেদ 4.2 ও 4.5 দেখুন।

(2) ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দশা বাধাদায়ক বস্তুদের ফেজ প্লেটের বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করে দশা পরিবর্তনকে বিভিন্নভাবে বিবর্ধিত ও পরিবর্তিত করা হয়। এইভাবে দুই ধরনের ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করা যায়। যথা—(ক) ধনাত্মক বা ডার্ক ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষেত্রে দশা প্রতিবন্ধক বস্তুকে ফেজ প্লেটের পরিধিতে স্থাপন করা হয়। এই যন্ত্রের মাধ্যমে কোষকে তার মাধ্যম থেকে কম উজ্জ্বল মনে হয়। (খ) ঋণাত্মক বা উজ্জ্বল ফেজ কনট্রাস্ট যন্ত্রে, দশা বাধাদায়ক বস্তুকে ফেজ প্লেটের কেন্দ্রে স্থাপন করা হয়। এই যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে কোষকে তার চারপাশের

মাধ্যমকে বেশি উজ্জ্বল বলে মনে হয়।

অনুচ্ছেদ 4.5 দ্রষ্টব্য

(3) কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণু ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় পুরু হয়। এদের ঘনত্ব ভিন্ন হয়। ঘনত্ব ও পুরুত্বের ভিন্নতার জন্য বিভিন্ন অঙ্গাণুর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত একই আলোক ক্ষেত্রে এদের প্রতিসরণ গুণাঙ্ক পৃথক হয়। ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণে প্রতিসরণ গুণাঙ্কের পার্থক্যকে উজ্জ্বলতার পার্থক্যে পরিণত করা হয়।

(4) 4.6 নম্বর অনুচ্ছেদ দেখুন।

(5) কোষের মধ্যে অবস্থিত কম ঘনত্ব ও কম প্রতিসরণ গুণাঙ্কযুক্ত অঙ্গাণুর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় আলোকরশ্মির গতিবেগ প্রায় একই থাকে। কিন্তু পুরু বা ঘন ও বেশি প্রতিসরণ গুণাঙ্ক যুক্ত অঙ্গাণুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় আলোর গতিবেগ বাধা পেয়ে কমে যায়। একই আলোর বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় তার গতিবেগের যে বাধাপ্রাপ্তি ঘটে, তাকে দশা পরিবর্তন বা ফেজ পরিবর্তন বলা হয়।

4.9 সংজ্ঞা ঃ প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ যন্ত্র (Fluorescence microscope)

যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে, অদৃশ্য অতি বেগুনিরশ্মি বা UV রশ্মির সাহায্যে কলাকোষে অবস্থিত বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুকে প্রতিপ্রভা (fluorescence) সৃষ্টির মাধ্যমে চিহ্নিত করা যায় বা দর্শনযোগ্য করা হয় তাকে প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে। প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ সংক্রান্ত বিজ্ঞানকে প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ তত্ত্ব (Fluorescence microscopy) বলা হয়।

4.10 প্রতিপ্রভা বা স্টোকস্ প্রতিক্রিয়া (Fluorescence or Stokes' effect)

প্রতিপ্রভা একটি বিশেষ ভৌত প্রক্রিয়া (physical process) যার সাহায্যে নির্দিষ্ট কিছু বস্তু অদৃশ্য অতিবেগুনি রশ্মি (ultraviolet ray) কে শোষণ করার পর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘতরঙ্গের দৃশ্যমান আলোকরশ্মি নির্গত করে ও মানুষের চোখে উজ্জ্বল আলোর অনুভূতি সৃষ্টি করে। যেসকল বস্তু প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে সক্ষম, তাদের প্রতিপ্রভ বস্তু বা ফ্লুরোস্ফোর (fluorophore) বলা হয়।

আবিষ্কর্তার নামানুসারে প্রতিপ্রভার ঘটনাকে স্টোকস্ প্রতিক্রিয়াও (Stoke's effect) বলা হয়। জৈবপদার্থবিদ্ স্টোকস্ সর্বপ্রথম পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করে দেখান যে প্রতিপ্রভ বস্তুদের ওপর অতিবেগুনি রশ্মি আপতিত হলে, ঐসব বস্তুর ইলেকট্রন কণারা আপতিত (incident) অতিবেগুনি রশ্মি থেকে শক্তি শোষণ করে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং সাময়িকভাবে উচ্চতর কক্ষে প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে উত্তেজিত ইলেকট্রন কণারা যখন তাদের স্বাভাবিক কক্ষে প্রত্যাবর্তন করে, তখন তারা পূর্বের শোষিত

শক্তিকে উচ্চতরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দৃশ্যমান আলোকরূপে নির্গত করে। এই আলো মানুষের চোখে নির্দিষ্ট বর্ণের উজ্জ্বল আলোর রূপে দেখা যায়। এই ভাবেই প্রতিপ্রভ বস্তুর অণুরা প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।

4.11 প্রতিপ্রভা ও প্রতিপ্রভ বস্তুর শ্রেণীবিভাগ

প্রকৃতি অনুসারে প্রতিপ্রভা ও প্রতিপ্রভ বস্তুদের নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়—

4.11.1 স্বপ্রতিপ্রভা ও স্বপ্রতিপ্রভ বস্তু (Autofluorescence and autofluorescent substance)

জীবদেহের কলাকোষে অবস্থিত কিছু বস্তু সর্বদাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে পারে। প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে অতিবেগুনি রশ্মির সাহায্যে এইসব বস্তুদের সহজেই প্রত্যক্ষ করা যায়। স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিপ্রভা বিকিরণকে স্বপ্রতিপ্রভা এবং স্বপ্রতিপ্রভা সৃষ্টিতে সক্ষম বস্তুদের স্বপ্রতিপ্রভ বস্তু বলা হয়।

উদাহরণ ঃ কলাকোষে সঞ্চিত ক্যালসিয়াম স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণে হালকা হলুদাভ বর্ণের প্রতিপ্রভা দেখায়। উদ্ভিদকোষে অবস্থিত ক্লোরোপ্লাস্ট একই ভাবে লাল প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।

4.11.2 গৌণ প্রতিপ্রভা এবং গৌণ প্রতিপ্রভ বস্তু (Secondary fluorescence and secondary fluorescent substance)

যে সকল বস্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে পারে না কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়ার পর অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে প্রতিপ্রভাব দেখায়, তাদের গৌণ প্রতিপ্রভা বস্তু এবং ঐসব বস্তুর দ্বারা সৃষ্ট প্রতিপ্রভাকে গৌণ প্রতিপ্রভা বলে। সাধারণত তিনভাবে গৌণ প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করা যায়, যেমন—

(a) আবেশিত প্রতিপ্রভা (Induced fluorescence) : জীবকোষে উপস্থিত কিছু বস্তু স্বাভাবিকভাবে অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে কোনও প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে না। সংশ্লিষ্ট কোষেরা যদি নির্দিষ্ট কিছু অপ্রতিপ্রভ রাসায়নিক পদার্থের সান্নিধ্যে আসে, তখন ঐসব বস্তু প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এইভাবে অপ্রতিপ্রভ রাসায়নিকের সাহায্যে সৃষ্ট প্রতিপ্রভাকে আবেশিত প্রতিপ্রভা বলে। যেমন, কোষে অবস্থিত অ্যারিলইথাইলঅ্যামিন (arylethylamine) যৌগটি সাধারণ অবস্থায় অপ্রতিপ্রভ, কিন্তু সংশ্লিষ্ট কোষকে যদি ফলম্যালডিহাইড দ্রবণে সংরক্ষিত করা যায়, তাহলে পূর্বোক্ত বস্তুটি হলুদ বর্ণের প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।

(b) ফ্লুরোক্রোম সৃষ্ট প্রতিপ্রভা (Fluorescence due to fluoro-chromes) : জীবদেহের কলাকোষে অবস্থিত কিছু বস্তু স্বাভাবিকভাবে এবং অতিবেগুনি রশ্মির অপ্রতিপ্রভ থাকে। বিশেষ কিছু প্রতিপ্রভ রঞ্জক বা ফ্লুরোক্রোম (fluroescent dye or fluorochrome) দিয়ে ঐসব কোষদের রঞ্জিত করা হলে,

কোষে উপস্থিত পূর্বোক্ত অপ্রতিপ্রভ বস্তুরা প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। যেমন, কোষ বিভাজনের মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোমদের সাধারণত খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। কিন্তু মেটাফেজ দশাসহ বিভাজনরত কোষকে যদি কুইনাক্রিন (Quinacrine) নামক ফ্লুরোক্রোমে রঞ্জিত করার পর প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন দেখা যায় যে কোষের নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত ক্রোমোজোম হলুদ রঙের প্রতিপ্রভা বিকিরণ করছে। এইক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের হেটারোক্রোমাটিন অঞ্চলে ফ্লুরোক্রোমটি সংযুক্ত হয়ে প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

4.11.3 মেটাক্রোমিক প্রতিপ্রভা (Metachromatic fluorescence)

যেসব প্রতিপ্রভ রঞ্জক কোষের বিভিন্ন অজ্ঞাণুদের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক বর্ণের প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে তাদের মেটাক্রোমাটিক ফ্লুরোক্রোম বলা হয়। এইভাবে একই ফ্লুরোক্রোমের সাহায্যে কোষের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পৃথক পৃথক বর্ণের প্রতিপ্রভা সৃষ্টির ঘটনাকে মেটাক্রোমাটিক প্রতিপ্রভা বলা হয়। অ্যাক্রিডিন অরেঞ্জ (Acridine orange) নামক মেটাক্রোমাটিক রঞ্জকে রঞ্জিত কোষে, ডি.এন.এ (D.N.A) সবুজ বর্ণের এবং আর.এন.এ (R.N.A) লালবর্ণের প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।

4.12 প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গঠন বৈশিষ্ট্য

সাধারণ আলোক-অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও প্রতিপ্রভ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গঠন প্রণালী মূলত একই প্রকারের হয়। তবে সাধারণ অণুবীক্ষণের গঠনে বিশেষ কিছু পরিবর্তন করে প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণযন্ত্র তৈরি করা হয়। এই অণুবীক্ষণে গঠনগত বৈশিষ্ট্যগুলো নীচে বর্ণনা করা হল—

(1) প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আলোর উৎস হিসেবে পারদের বাষ্পযুক্ত আলো (Mercury vapour lamp) বা কার্বন আর্ক আলো (Carbon arc lamp) ব্যবহৃত হয়।

(2) উল্লেখিত আলোর উৎসের সামনে একটি UV পরিস্রাবক (UV filter) বা উৎস পরিস্রাবক (Source filter) বা প্রথম প্রতিবন্ধক পরিস্রাবক (first barrier filter) থাকে। এই ধরনের আলোক পরিস্রাবকের মধ্যে দিয়ে কেবলমাত্র UV রশ্মি বা অতিবেগুনি রশ্মি, যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য 400 – 490 হয়, তারাই চলাচল করতে পারে।

(3) UV পরিস্রাবকের সামনে থাকে একটি ডাইক্রোয়িক দর্পণ (Dichroic mirror) বা আলোক বিচ্ছুরক দর্পণ (Beam splitting mirror) এই দর্পণ কেবলমাত্র UV রশ্মিকে কনডেনসারের দিকে প্রতিফলিত হতে সাহায্য করে।

(4) প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দেহনলের মধ্যে একটি UV রক্ষক পরিস্রাবক (UV protecting filter) বা পরিপূরক পরিস্রাবক (Complementary filter) বা দ্বিতীয় প্রতিবন্ধক পরিস্রাবক (Second barrier filter) থাকে। প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণে পরীক্ষাধীন বস্তু কর্তৃক শোষিত হয়নি, এরকম UV রশ্মি

দেহনল দিয়ে নির্গত হয়ে মানুষের চোখে যাতে ক্ষত না করে সেই জন্যই UV প্রতিবন্ধক পরিস্রাবকটি ব্যবহার করা হয়। এই পরিস্রাবকটি পূর্বোক্ত অশোষিত UV রশ্মিকে নিজে শোষণ করে নেয় ও মানুষের চোখে প্রবেশ করতে বাধা দেয় (চিত্র নং 3)।

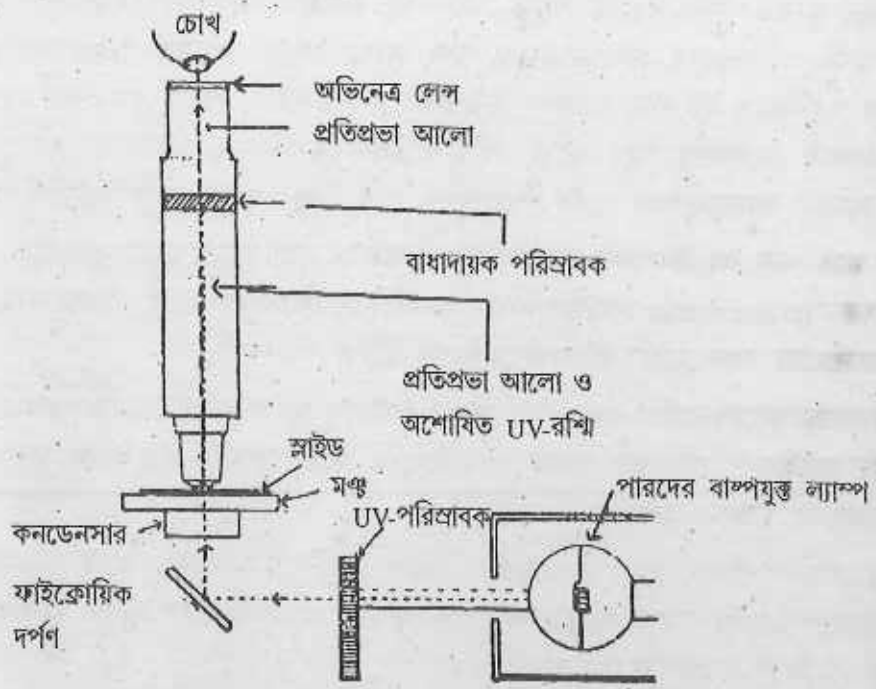

চিত্র নং 3 : প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ এবং এই অণুবীক্ষণের মাধ্যমে বস্তুর দর্শন

4.13 প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কার্যপদ্ধতি

উৎস-পরিস্রাবকের মধ্য দিয়ে আগত অতিবেগুনি রশ্মি প্রথম ডাইক্রোয়িক দর্পণের সাহায্যে প্রতিফলিত হয়। এরপর এই প্রতিফলিত রশ্মি, কনডেনসারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অণুবীক্ষণের মঞ্চের ওপর স্থাপিত বস্তু বা নমুনাতে আপতিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে বস্তু কর্তৃক সৃষ্ট প্রতিপ্রভ আলো ও বস্তু কর্তৃক অশোষিত UV রশ্মি একত্রে অভিলক্ষ্য লেন্সের মধ্য দিয়ে ওপরে দিকে প্রবাহিত হয়। এই সময় UV বাধাদায়ক পরিস্রাবকটি UV রশ্মিকে শোষণ করে নেয় এবং কেবলমাত্র প্রতিপ্রভ আলোকরশ্মিকে অভিনেত্র লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রেরণ করে। এই লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আলো অবশেষে মানুষের চোখের রেটিনাতে বা ফটোফিল্মে (photographic film) বস্তুটির ছবি সৃষ্টি করে।

4.14 জীববিজ্ঞানে প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োগ

(1) ডি. এন. এ বা ক্রোমোটিনের শনাক্তকরণ ঃ মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজনরত কোষকে অ্যাক্রিডিন অরেঞ্জ নামক রঞ্জকে রঞ্জিত করার পর, প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণে পর্যবেক্ষণ করলে, উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের প্রতিপ্রভাযুক্ত ক্রোমোজোমের গঠন, সংখ্যা প্রভৃতি সহজেই দর্শন করা যায়। সাধারণ আলোক অণুবীক্ষণে ইষ্ট নাম ছত্রাকের নিউক্লিয়াসকে সঠিকভাবে শনাক্ত করা যায় না, কারণ ইষ্টের সাইটোপ্লাজমে বৃহদাকারে গহ্বর থাকে। কিন্তু প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণে, অ্যাক্রিডিন অরেঞ্জে রঞ্জিত ইষ্ট কোষে সহজেই কমলাভ-লাল বর্ণের পশ্চাৎভূমির মাঝে উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের নিউক্লিয়াসটি দেখা যায়।

(2) আর. এন. এ উৎপাদন শনাক্তকরণ ঃ পলিটিন ক্রোমোজোমের যেসব পাফ্ (puffs) অংশ ট্রান্সক্রিপশন্ (transcription) বা আর. এন. এ সংশ্লেষে নিয়োজিত থাকে, তাদের অ্যাক্রিডিন অরেঞ্জ রঞ্জকের সাহায্যে লাল বর্ণের প্রতিপ্রভ অংশরূপে চিহ্নিত করা যায়।

(3) ক্রোমোজোমের ব্যান্ডিং নমুনা পর্যবেক্ষণ ঃ কুইনাক্রিন রঞ্জকে রঞ্জিত মেটাফেজ দশার ক্রোমোজোমের প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে হেটারোক্রোমাটিনযুক্ত অঞ্চল উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের পট্টির (Band) আকারে অবস্থিত আছে।

(4) হরমোন শনাক্তকরণ ঃ ফরমালিনের বাষ্পে সংরক্ষিত অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির প্রস্থচ্ছেদ প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণে পর্যবেক্ষণ করলে, ক্যাটেকোল্যামাইন জাতীয় হরমোনগুলোকে গ্রন্থির মেডালা অংশে সবুজ প্রতিপ্রভা বিকিরণ করতে দেখা যায়।

(5) রোগজীবাণু শনাক্তকরণ ঃ যক্ষ্মা রোগিদের মুখবিবরীয় শ্লেষমাকে অরামিন-ও (Auramineo) নামক ফ্লুরোক্রোমে রঞ্জিত করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, ম্যাইকোব্যাকটোরিয়াম টিউবারকুলোসিস্ (Myco bacterium tuberculosis) নামক ব্যাকটেরিয়া উজ্জ্বল হলুদ প্রতিপ্রভা বিকিরণ করছে। এই ভাবে যক্ষ্মারোগ নিরূপণ করা সম্ভব হয়।

(6) বার্ধক্য শনাক্তকরণ ঃ প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণে বয়স্ক মানুষ বা অন্য পরিণত প্রাণীর আড্রেনাল গ্রন্থি, সেরিব্রাল কর্টেক্স, হৃদ্‌পেশী ইত্যাদির নমুনা, কোষের নিউক্লিয়াসের কাছে বাদামি লাল বর্ণের স্বপ্রতিপ্রভা যুক্ত লাইপোফুসিন (Lipofuscin) নামক সঞ্চিত বস্তুর উপস্থিতি প্রদর্শন করে। অপরিণত কোনও প্রাণীর কলাকোষে ঐ প্রকারের স্বপ্রতিপ্রভা দেখা যায় না।

(7) অ্যান্টিজেন শনাক্তকরণ ঃ কোনও অ্যান্টিজেনের বিপক্ষে প্রস্তুত অ্যান্টিবডির সাথে ফ্লুরোক্রোমের সংযোজন ঘটিয়ে, ঐ সংযুক্ত যৌগকে প্রাণীর দেহে প্রবেশ করালে, অ্যান্টিবডি নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে। প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণে ঐ প্রাণীর দেহের নমুনা প্রত্যক্ষ করলে, প্রবিষ্ট ফ্লুরোক্রোমের বর্ণ পর্যবেক্ষণ করে প্রাণীর দেহে সংশ্লিষ্ট অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়। এইভাবে ভাইরাস আক্রান্ত প্রাণীর দেহে ভাইরাসের উপস্থিতি সহজেই নির্ণয় করা সম্ভব।

4.15 অনুশীলনী

(1) প্রতিপ্রভা কাকে বলে ? প্রতিপ্রভা কিভাবে উৎপন্ন হয় ?

(2) আবেশিত প্রতিপ্রভা ও স্বপ্রতিপ্রভার পার্থক্য কি ?

(3) মেটাক্রোমাটিক ফ্লুরোক্রোম কি ? এদের বৈশিষ্ট্য কি ? উদাহরণ দিন।

(4) প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিস্রাবকের নাম ও কাজ উল্লেখ করুন।

(5) ডাইক্রোয়িক দর্পণ কোথায় থাকে ? এর কাজ কি ?

(6) অ্যাক্রিডিন অরেঞ্জ কি ? এটি কোষের ডি. এন. এ ও আর. এন-কে প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণে কিভাবে প্রদর্শিত করে ?

(7) প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার লিখুন।

4.16 উত্তরাবলী

(1) অনুচ্ছেদ 4.10 দেখুন

(2)

স্বপ্রতিপ্রভা	আবেশিত প্রতিপ্রভা
(i) এই প্রতিপ্রভা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপন্ন হয়।	(i) এই প্রতিপ্রভা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয় না।
(ii) স্বপ্রতিপ্রভ বস্তু নিজে অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে স্বপ্রতিপ্রভা দেখায়।	(ii) গৌণ প্রতিপ্রভ বস্তু, কিছু অপ্রতিপ্রভ রাসায়নিক পদার্থের সাথে সংযুক্ত হবার পর, UV রশ্মির প্রভাবে আবেশিত প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।
(iii) কোষে অবস্থিত ক্যালসিয়াম লালবর্ণের প্রতিপ্রভা দেখায়।	(iii) কোষে অবস্থিত অ্যারিলইথাইলঅ্যামিন যৌগটি, ফরম্যালডিহাইড দ্রবণে সংরক্ষিত হবার পর হলুদ বর্ণের আবেশিত প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।

(3) অনুচ্ছেদ 4.11.2 দেখুন।

(4) অনুচ্ছেদ 4.11.3 দেখুন।

(5) অনুচ্ছেদ 4.11.3 এর 3 নম্বর পয়েন্ট দেখুন।

(6) অ্যাক্রিডিন অরেঞ্জ একটি মেটাক্রোমাটিক রঞ্জক। এটি প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণে কোষের ডি. এন. এ-কে সবুজ বর্ণের ও আর. এন. এ-কে লাল বর্ণের প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

(7) অনুচ্ছেদ 4.9 – 4.13 দেখুন।

4.17 সাধারণ অনুশীলনী

(ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

1. এক কথায় উত্তর দিন ঃ

(1) প্রতিপ্রভা কাকে বলে ?

(2) প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণে বস্তুকে উজ্জ্বল করার জন্য কি আলো ব্যবহার করা হয় ?

(3) প্রতিপ্রভ বস্তু কত প্রকারের হয় ?

(4) ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণে কি ধরনের নমুনা পরীক্ষা করা হয় ?

(5) কোষে অবস্থিত অকটি স্বপ্রতিপ্রভ ও একটি গৌণ প্রতিপ্রভ বস্তুর নাম লিখুন।

(6) কোষ থেকে নির্গত আলোকরশ্মির গতিবেগের পরিবর্তনের প্রধান কারণ কি ?

(7) ধ্বংসাত্মক বাধার ফলে কোষের দৃশ্য কেমন হয় ?

(8) ফেজ প্লেট কি ? এটি কোথায় থাকে ?

(9) প্রতিপ্রভা ঘটনার আবিষ্কর্তার নাম কি ?

(10) কুইনাক্রিন কি ?

2. পার্থক্য নির্দেশ করুন (সংক্ষেপে)।

(1) উৎস পরিস্রাবক ও পরিপূরক পরিস্রাবক,

(2) ডাইক্রোয়িক দর্পণ ও সমাবতল দর্পণ,

(3) ধ্বংসাত্মক বাধা ও গঠনমূলক বাধা,

(4) ধনাত্মক ফেজ কনট্রাস্ট ও ঋণাত্মক ফেজ কনট্রাস্ট,

(5) কুইনাক্রিন ও অরামিন-ও।

(খ) মাঝারি প্রশ্ন ঃ

(1) প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণে ব্যবহৃত UV ফিল্টারের কাজ কি ?

(2) কি কি ভাবে অপ্রতিপ্রভ বস্তু প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় ?

(3) স্টোকস্ প্রতিক্রিয়া কি ?

(4) ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণের নামকরণের যৌক্তিকতা বুঝিয়ে বলুন।

(5) ফেজ কনট্রাস্ট ও প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(6) মেটাক্রোমাটিক প্রতিপ্রভার ঘটনা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

(7) প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণের সাহায্যে কিভাবে কোষের ডি.এন.এ শনাক্ত করা যায় ?

(8) বার্ধক্য ও রোগজীবাণু শনাক্তকরণে কোন অণুবীক্ষণে কিভাবে বেশি সাহায্য করে ?

(গ) বড় প্রশ্ন ঃ

(1) ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণের কার্যপ্রণালী চিত্র সহযোগে বুঝিয়ে লিখুন।

(2) উদাহরণসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিপ্রভার তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(3) জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণের অবদান উল্লেখ করুন।

(4) প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের গঠনগত বৈশিষ্ট্য চিত্র সহযোগে বুঝিয়ে লিখুন।

(5) জীববিজ্ঞানে ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণকে কি কি ভাবে কাজে লাগানো যায় ?

উত্তর ঃ

(ক) 1. (1) অনুচ্ছেদ 4.9 দেখুন (2) অতিবেগুনি রশ্মি বা UV রশ্মি, যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য 400 nm এর কম হওয়ায় এই আলো মানুষের চোখে অদৃশ্য হয়।

(3) অনুচ্ছেদ 4.11, 4.11.1 ও 4.11.2 দেখুন।

(4) সজীব কলাকোষের নমুনা (5) কোষে অবস্থিত ক্লোরোপ্লাস্ট, পরফাইরিন, ইলাস্টিক তন্তু সপ্রতিপ্রভ কিন্তু ডি. এন. এ ও আর. এন. এ অপ্রতিপ্রভ যৌগ। (6) কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুর ঘনত্ব পৃথক হওয়ায় তাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত একই আলোর ক্ষেত্রে, প্রতিসরণ গুণাঙ্ক ভিন্ন ভিন্ন হয়। ফলে তাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আলোর গতিবেগও ভিন্ন হয়। (7) ধ্বংসাত্মক বাধার ফলে কোষকে তার চারপাশের মাধ্যম থেকে অনুজ্জ্বল লাগে। (8) অনুচ্ছেদ 4.4 দেখুন। (9) অনুচ্ছেদ 4.10 দেখুন। (10) অনুচ্ছেদ 4.11.1-এর b অংশ দেখুন।

2. (1) অনুচ্ছেদ 4.11.3 দেখুন।

(2)

ডাইক্রোয়িক দর্পণ	সমাবর্তন দর্পণ
(i) এই দর্পণ প্রতিপ্রভা অণুবীক্ষণে ব্যবহৃত হয়।	(i) এই দর্পণ যৌগিক আলোক অণুবীক্ষণে ব্যবহৃত হয়।
(ii) এই দর্পণ UV পরিস্রাবকের সামনে অবস্থিত থাকে।	(ii) এই দর্পণ কনডেনসারের তলায় থাকে।
(iii) এই দর্পণ কেবলমাত্র UV রশ্মিদের কনডেনসারের দিকে প্রতিফলিত করে।	(iii) এই দর্পণ দৃশ্যমান বর্ণালিকে কনডেনসারের দিকে প্রতিফলিত করে।

(3) অনুচ্ছেদ 4.5 দেখুন। (4) অনুচ্ছেদ 4.5 দেখুন।

(5) অনুচ্ছেদ 4.11.1-এর (b) ও (c) অংশ দেখুন।

(খ) (1) অনুচ্ছেদ 4.11.3 দেখুন। (2) অনুচ্ছেদ 4.11.1 ও 4.11.2 দেখুন।

(3) অনুচ্ছেদ 4.10 দেখুন।

(4) ইংরেজি ফেজ (phase) কথাটির অর্থ দশা বা অবস্থা এবং কনট্রাস্ট (Contrast) কথাটির অর্থ বৈষম্য-প্রদর্শন। ফেজকনট্রাস্ট অণুবীক্ষণে দৃশ্যমান সজীব কোষের বিভিন্ন অংশের উজ্জ্বলতার পৃথক পৃথক হয়। যেমন, ধূসর বা মাঝারী উজ্জ্বল, সাদা বা বেশি উজ্জ্বল এবং কালো বা কম উজ্জ্বল। পরীক্ষিত বস্তু ও তার চারপাশের মাধ্যমের উজ্জ্বলতার সবসময়ই পার্থক্য থাকায়, বস্তুকে তাই খুবই স্পষ্টভাবে দেখা যায়। পরীক্ষিত বস্তু প্রায় স্বচ্ছ থাকলে, তার চারপাশের মাধ্যমকে ধূসর বা কালো দেখায়, অন্যদিকে মাধ্যমের দৃশ্য উজ্জ্বল থাকলে, পরীক্ষিত বস্তু বা নমুনাকে অনুজ্জ্বল দেখায়। এই অণুবীক্ষণ এইভাবে পরীক্ষাধীন নমুনাদের মধ্যে উজ্জ্বলতার বৈষম্যকে প্রদর্শিত করতে সক্ষম হওয়ায় সঠিকভাবেই এই অণুবীক্ষণের নাম ফেজ কনট্রাস্ট অণুবীক্ষণ হয়েছে।

(5) অনুচ্ছেদ 4.3 এবং 4.10 দেখুন (6) অনুচ্ছেদ 4.11.2 দেখুন (7) অনুচ্ছেদ 4.13-এর 1 নং পয়েন্ট দেখুন। (8) অনুচ্ছেদ 2.5-এর 5 ও 6 নং পয়েন্ট দেখুন।

(গ) (1) অনুচ্ছেদ 4.5 চিত্র নং 1 দেখুন।

(2) অনুচ্ছেদ 4.10 দেখুন। (3) অনুচ্ছেদ 4.13 দেখুন।

(4) অনুচ্ছেদ 4.11.3 ও চিত্র নং 3 দেখুন। (5) অনুচ্ছেদ 4.6 দেখুন।

একক 5 ❐ ট্রান্সমিশন এবং স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ তত্ত্ব (Transmission and Scanning Electron Microscopy)

গঠন ঃ

5.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

5.2 ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সংজ্ঞা

5.3 ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের প্রকারভেদ

5.3.1 ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সংজ্ঞা

5.3.2 ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের গঠনগত বৈশিষ্ট্য

5.3.3 ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের কার্যপ্রণালী

5.3.4 ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের বিবর্ধক ক্ষমতা

5.3.5 ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের বিশ্লেষক ক্ষমতা

5.3.6 আলোক অণুবীক্ষণের তুলনায় ট্রান্সমিশন অণুবীক্ষণের সমস্যা ও তাদের প্রতিকার।

5.3.7 জীববিজ্ঞানে ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের প্রয়োগ

5.4 স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সংজ্ঞা

5.4.1 স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে গৌণ ইলেকট্রন রশ্মির প্রভাব

5.4.2 স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের গঠন ও কার্যপ্রণালী

5.4.3 পরীক্ষাধীন নমুনার প্রস্তুতি

5.4.4 স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সুবিধা ও অসুবিধা

5.4.5 জীববিদ্যায় স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের প্রয়োগ

5.5 অনুশীলনী

5.6 উত্তরাবলী

5.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা ঃ বিগত দশকে জীববিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতির জন্য কোষের গঠনগত বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের বিশেষ ভূমিকা আছে। কোষ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানলাভ সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের

সাহায্যে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিবর্ধন ও বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে ইলেকট্রন রশ্মির সাহায্যে উন্নত করার পর কোষবিদদের কাছে কোষ বিশেষত কোষাঙ্গাণুদের গঠন ও কার্যকারিতা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ অতি সহজ হয়ে ওঠে। 1937 সালে সর্বপ্রথম জীববিদ্যায় ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেন বিজ্ঞানী Medawar. তারপর থেকেই ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের যন্ত্রাংশের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদের কার্যপ্রণালীতে ক্রম উন্নতি করা হচ্ছে। ফলে কল্পনাতীত ক্ষুদ্রাকৃতির কোষ বা কোষাঙ্গাণুকে তার প্রকৃত আয়তনের 1,000,000 গুণ বড় আকারে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। কোষের অন্তর্গঠন ছাড়াও একক বা কোষগুচ্ছর মুক্ত পৃষ্ঠতলের ত্রৈমাত্রিক গঠন এখন বিজ্ঞানীদের কাছে স্পষ্ট। এর ফলে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র শুধুমাত্র কোষের সাংগঠিক জ্ঞানই নয়, কোষের কার্যকারিতা সম্পর্কেও আমাদের বহু তথ্য দান করছে। একই সাথে অণুজীবদের গঠন ও কার্যকারিতা, তাদের উপস্থিতি বিভিন্ন রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করছে। অদৃশ্য জীবজগৎ এখন মানুষের কাছে উদ্ভাসিত। এই ভাবেই জীবপদার্থবিদদের সাহায্যে সমগ্র জীববিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি সাধিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র, তাদের গঠন ও কার্যপ্রণালী এবং জীববিজ্ঞানে তাদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য ঃ

(1) এই অধ্যায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একক কোষের অন্তর্গঠনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণে সাহায্যকারী অণুবীক্ষণ যন্ত্র সম্পর্কে বিশদ তথ্য দান করা।

(2) সাধারণ দৃশ্যমান আলোর পরিবর্তে, উজ্জ্বলকারক ইলেকট্রন রশ্মিকে কাজে লাগিয়ে অণুবীক্ষণের বিবর্ধন ও বিশ্লেষক ক্ষমতার প্রভূত উন্নতি সাধন প্রক্রিয়া সম্পর্কে এই অধ্যায় থেকে আমরা বিশেষ জ্ঞান লাভ করব।

(3) উজ্জ্বলকারক ইলেকট্রন রশ্মিকে কতভাবে পর্যবেক্ষণের কাজে লাগানো যায় বা কত প্রকারের প্রতিবিম্ব গঠন করা যায় তা জানা যাবে বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের মূল নীতি থেকে।

(4) কোষের অন্তর্গঠনের সাথে সাথে তার মুক্ত পৃষ্ঠতলের সূক্ষ্ম গঠন ও পৃষ্ঠতলের ত্রৈমাত্রিক প্রতিবিম্ব কিভাবে সৃষ্টি করা হয় এই তথ্য জানানো এই অধ্যায়ের অপর একটি উদ্দেশ্য।

5.2 সংজ্ঞা

যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান আলোর পরিবর্তে, ইলেকট্রন রশ্মির সাহায্যে পরীক্ষাধীন বস্তুকে উজ্জ্বল করা হয় তাকে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র (electron microscope) বলা হয়। এই প্রকার অণুবীক্ষণের বিবর্ধক ও বিশ্লেষক ক্ষমতা আলোক অণুবীক্ষণের তুলনায় বহুগুণ বেশি হয়।

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ প্রধানত দুই প্রকারের হয়, যথা—(i) ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ

(Transmision Electron Microscope or TEM) (2) স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ (Scanning Electron Microscope or SEM)।

5.3 ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের প্রকারভেদ

5.3.1 ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সংজ্ঞা

যে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে উজ্জ্বলকারী ইলেকট্রন রশ্মি পরীক্ষাধীন নমুনার মধ্য দিয়ে চালিত হয়ে (transmitted) নমুনার অন্তর্গঠনের বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠন করে, তাকে ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ বলা হয়।

5.3.2 ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের গঠনগত বৈশিষ্ট্য

যৌগিক আলোক অণুবীক্ষণ ও ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের গঠন একই মূল নীতিতে প্রতিষ্ঠিত। তবে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে, আলোক অণুবীক্ষণের যন্ত্রাংশের সমতুল্য কিন্তু পৃথক কিছু যন্ত্রাংশ থাকে যাদের বর্ণনা নীচে আলোচিত হল।

(ক) উজ্জ্বলতার উৎস (Source of illumination) :

ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের, সূর্যালোক বা বৈদ্যুতিক আলোক উৎসের পরিবর্তে একটি 'ইলেকট্রন গান' (electron gun) থাকে। এই গান-এ টাংস্টেন বা ল্যান্থানাম হেক্সাবোরাইড (LaB_6) নির্মিত 'V' আকৃতির একটি ফিলামেন্ট থাকে, যা থেকে ইলেকট্রন রশ্মি নির্গত হয়ে পরীক্ষাধীন বস্তুকে উজ্জ্বল করতে পারে। ফিলামেন্টটিকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরে একটি সছিদ্র ক্যাথোড তড়িৎদ্বার থাকে। এই তড়িৎদ্বারের সামান্য নীচে থাকে গান-এর অপর তড়িৎদ্বার অর্থাৎ অ্যানোড। অ্যানোড় একটি ছিদ্রযুক্ত চাকতি বিশেষ (চিত্র নং 1)।

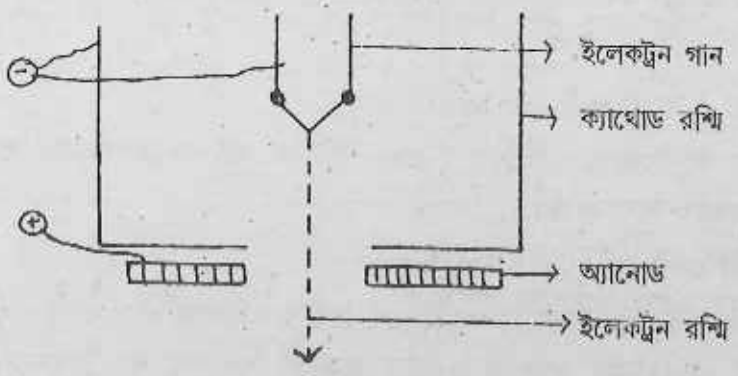

চিত্র নং 1 : ইলেকট্রন গান ও ইলেকট্রন রশ্মি

(খ) কনডেনসার (Condenser) :

ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে, কাঁচনির্মিত লেন্সের পরিবর্তে কুণ্ডলীকৃত তার নির্মিত তড়িৎচুম্বকীয় লেন্স (electro magnetic) বা সোলেনয়েড (electromagnetic coil or solenoid) ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ কনডেনসার লেন্সরূপে উপরিউক্ত দুটি লেন্স এই অণুবীক্ষণে থাকে (চিত্র নং 2)।

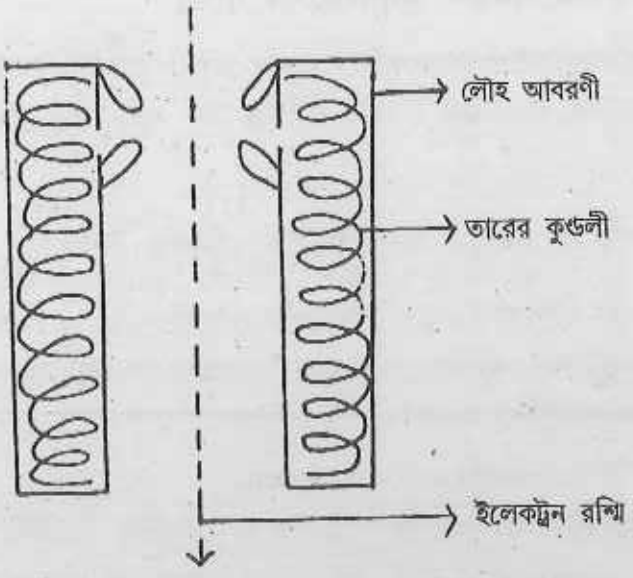

চিত্র নং 2 : তড়িৎচুম্বকীয় লেন্স

(গ) অভিলক্ষ্য লেন্স (Objective lens) :

কনডেনসার লেন্সের মতো অভিলক্ষ্য লেন্সও প্যাচানো তারের (coiled) তড়িৎচুম্বকীয় লেন্স। সচরাচর প্রতিটি ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে, দুটি তড়িৎচুম্বকীয় লেন্স পরীক্ষাধীন বস্তুর নিম্নভাগে বিশেষ দূরত্বে অবস্থিত থাকে।

(ঘ) প্রজেক্টর লেন্স (Projector lens) :

আলোক অণুবীক্ষণের অভিনেত্র লেন্সের পরিবর্তে, এই ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি তড়িৎচুম্বকীয় লেন্স প্রজেক্টর লেন্সরূপে ব্যবহৃত হয়।

(ঙ) অন্তর্বর্তী লেন্স (Intermediate lens) :

আধুনিক শক্তিশালী ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে, দ্বিতীয় অভিলক্ষ্য ও প্রথম প্রজেক্টক লেন্সের মাঝখানে অপর একটি তড়িৎচুম্বকীয় লেন্স থাকে, যাকে অন্তর্বর্তী লেন্স বলা হয়। ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে ব্যবহৃত সব লেন্সেই বিশেষভাবে, অণুবীক্ষণের দেহনলের মধ্যে স্থাপিত থাকে।

(চ) প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষের পর্দা (Viewing screen) :

অদৃশ্য ইলেকট্রন কণার সাহায্যে গঠিত প্রতিবিম্বকে খালি চোখে প্রত্যক্ষ করা যায় না, ফলে উৎপন্ন ইলেকট্রন প্রতিবিম্বকে প্রতিপ্রভ পর্দার ওপর আরোপিত করে পর্যবেক্ষণ করা হয় বা ফটোফিল্মের সাহায্যে ছবি তোলার পর প্রতিবিম্বের গঠন জানা যায়।

5.3.3 ট্রান্সমিশন অণুবীক্ষণের কার্যপ্রণালী

ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে, প্রতিবিম্ব গঠনের পদ্ধতিকে নিম্নলিখিত পর্যায়ে ভাগ করা যায়—

(1) ইলেকট্রন রশ্মির নির্গমন : আমরা জানি যে, কোনও ধাতুকে যদি উত্তপ্ত করা হয়, তবে ধাতুর পরমাণুর ইলেকট্রন কণারা তাপশক্তিকে শোষণ করে উত্তেজিত হয় ও পরমাণুর উচ্চতর কক্ষে গমন করে। এইভাবে পরমাণুর সর্বোচ্চ স্তর থেকে ইলেকট্রন কণারা বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়, যাকে তাপজনিত নির্গমন (thermionic emission) বলা হয়। ধাতুর এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়েই ইলেকট্রন গান (electro gun) থেকে ইলেকট্রন রশ্মি সৃষ্টি করা হয়।

ইলেকট্রন গানে অবস্থিত টাংস্টেন ধাতুর গলনাঙ্ক অনেক বেশি হওয়ায় এই পাতকে প্রায় 3000° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা যায়। উত্তপ্ত করার জন্য প্রথমে ফিলামেন্ট ও ক্যাথোড তড়িৎদ্বারের মধ্যে উচ্চ ভোল্টের (10,00 – 120,000 ভোল্ট) তড়িৎ চালনা করা হয়। ফলে ফিলামেন্টটি প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ইলেকট্রন কণার নিঃসরণ ঘটায়। নিঃসৃত কণারা ফিলামেন্টের চতুর্দিকে অবস্থিত ঋণাত্মক আধানযুক্ত ক্যাথোড তড়িৎদ্বার দিয়ে বিকর্ষিত হয় কিন্তু নিম্নভাগে অবস্থিত ধনাত্মক আধানযুক্ত অ্যানোড তড়িৎদ্বার দিয়ে আকর্ষিত হয় ও অ্যানোডের কেন্দ্রে অবস্থিত সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে রশ্মির আকারে নির্গত হয় (চিত্র নং 1)। দেখা যায় যে, ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িতের শক্তি বা ভোল্টের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে, নিঃসৃত ইলেকট্রন রশ্মির গতি সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে ইলেকট্রন রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য তার গতিবেগের সাথে ব্যাস্তানুপাতে সম্পর্কিত হওয়ায়, ভোল্ট বৃদ্ধির সাথে সাথে নির্গত ইলেকট্রন রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হ্রাস তথা বিশ্লেষক ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটান যায়।

(2) ইলেকট্রন রশ্মির ঘনীভব ও বস্তুর মধ্য দিয়ে নির্গমন : ইলেকট্রন গান থেকে নিঃসৃত ইলেকট্রন রশ্মি, কনডেনসার লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় (চিত্র নং 3)। কনডেনসার লেন্সসহ সব তড়িৎচুম্বকীয় লেন্সেই একটি কাঁচালোহা নির্মিত আবরণীর মধ্যে তারের কুণ্ডলী বর্তমান থাকে। এই কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ চালনা করলে সৃষ্ট চুম্বকীয় ক্ষেত্র (magnetic field) লৌহ আবরণীর মধ্যেই সীমিত থাকে। কিন্তু তার শক্তি লেন্স দুটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ইলেকট্রন রশ্মির ওপর ক্রিয়া করে। ইলেকট্রন কণারা আধান যুক্ত হওয়ায় দু-পাশের দুটি কনডেনসার লেন্সের তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় বিক্ষিপ্তভাবে প্রবাহিত না হয়ে ঘনীভূতভাবে পরীক্ষাধীন নমুনার নির্দিষ্ট অঞ্চলে আপতিত হয়।

পরীক্ষাধীন নমুনার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন মৌলের পরমাণু কর্তৃক আপতিত ইলেকট্রন রশ্মির কিছু

অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হয় ও কৌণিকভাবে বস্তু থেকে নির্গত হয় (চিত্র নং 3)। অন্যদিকে আপতিত রশ্মির যে অংশ নমুনা কর্তৃক প্রবলভাবে আঘাতপ্রাপ্ত (bounced) হয় তারা প্রতিবিম্ব গঠনে অংশ গ্রহণ করে না।

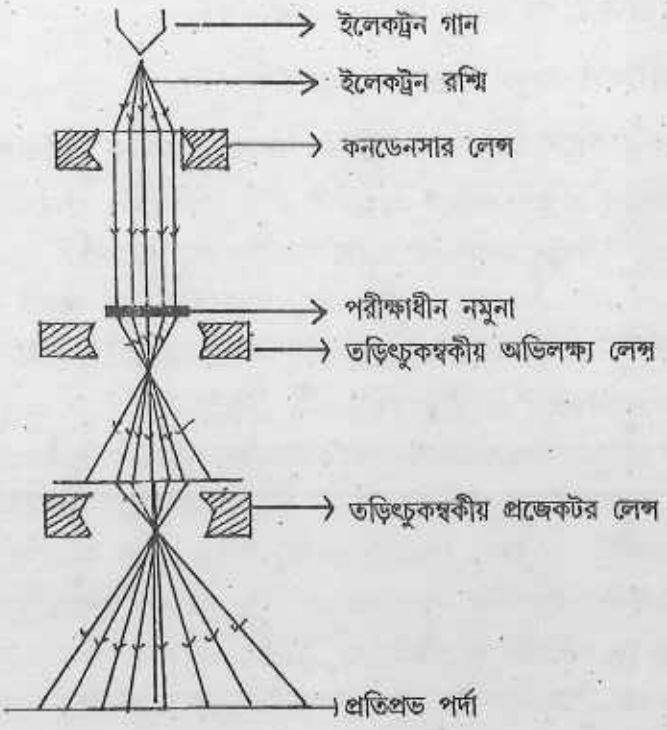

চিত্র নং 3 : ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের বিভিন্ন অংশ ও প্রতিবিম্ব গঠন প্রণালীর রৈখিক চিত্র।

(3) অভিলক্ষ্য ও প্রজেক্টর লেন্স কর্তৃক প্রতিবিম্ব গঠন : পরীক্ষাধীন নমুনার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত ইলেকট্রন রশ্মিরা অভিলক্ষ্য লেন্সের চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। দেহনলের মধ্যেই অভিলক্ষ্যর ফোকাস তলে নমুনার প্রথম প্রতিবিম্ব গঠিত হয় যা অন্তর্বর্তী অথবা প্রজেক্টর লেন্সের বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এইভাবে বিভিন্ন লেন্সের চুম্বকীয় ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবার পর সব শেষে ইলেকট্রন রশ্মির বহুগুণ বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

(4) পর্দায় প্রতিবিম্ব সংগ্রহ : ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে গঠিত ইলেকট্রন প্রতিপ্রভ পর্দা বা ফটোফিল্মের সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে পর্দায় প্রলেপিত প্রতিপ্রভ রঙের পরমাণুর ইলেকট্রনরা প্রতিবিম্বের ইলেকট্রন কণা থেকে শক্তি শোষণ করে উত্তেজিত হয় এবং উচ্চতর কক্ষে গমন করে। পরক্ষণেই ঐ কণারা শোষিত শক্তিকে প্রতিপ্রভরূপে প্রকাশ করে স্বাভাবিক কক্ষে প্রত্যাবর্তন করে। এইভাবেই প্রতিপ্রভ পর্দায় ইলেকট্রন রশ্মি কর্তৃক গঠিত প্রতিবিম্বকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। একক সময়ে প্রতিপ্রভ পর্দায়

আপতিত ইলেকট্রন কণার সংখ্যা যত কম হয়, পর্দার ঐ স্থানকে তত গাঢ় দেখায়, অন্যদিকে আপতিত ইলেকট্রন কণার সংখ্যা বেশি হলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলকে হালকা বর্ণের দেখায়। প্রতিপ্রভ পর্দার পরিবর্তে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণে প্রলেপিত ফটোফিল্মের সাহায্যেও ইলেকট্রন প্রতিবিম্বের ছবি তোলা সম্ভব।

5.3.4 ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের বিবর্ধক ক্ষমতা

ট্রান্সমিশন অণুবীক্ষণের বিবর্ধক ক্ষমতা, সাধারণ আলোক অণুবীক্ষণের বিবর্ধক ক্ষমতার তুলনায় বহুগুণ বেশি হয়। এই অণুবীক্ষণের সাহায্যে বস্তুর আকারকে সাধারণত 1,00,000 গুণ বর্ধিত আকারে পর্যবেক্ষণ করা যায়, অত্যাধুনিক অণুবীক্ষণে এই বিবর্ধন ক্ষমতা 250,000 গুণ বাড়ান সম্ভব হয়। ট্রান্সমিশন অণুবীক্ষণের এই অতিবিবর্ধন ক্ষমতা প্রধানত দুটি বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে সম্ভব, যথা— (1) তড়িৎচুম্বকীয় লেন্সের অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং (2) একাধিক অন্তর্বর্তী লেন্সের সংযোজন।

5.3.5 ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের বিশ্লেষক ক্ষমতা

অণুবীক্ষণের বিশ্লেষক ক্ষমতা যত বেশি হবে, সেই অণুবীক্ষণ যন্ত্র তত ক্ষুদ্র বস্তুকে স্পষ্ট ও পৃথক রূপে প্রদর্শিত করবে (একক-3 এর 3-3 অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

আমরা জানি $\frac{d = 0.61\lambda}{NA}$ (d = ক্ষুদ্রতম বস্তুর আয়তন,

NA = অভিলক্ষ্য লেন্সের নিউম্যারিকাল অ্যাপারচার

0.61 = ধ্রুবক

λ = উজ্জ্বলকারক রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য

আবার $NA = n \times \sin\theta$ (n = মাধ্যমের প্রতিসরণ গুণাঙ্ক,

θ = নমুনা থেকে নির্গত রশ্মি অভিলক্ষ্য লেন্সের অক্ষের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে)

ইলেকট্রন তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 0.05 Å হতে পারে এবং অভিলক্ষ্য লেন্সের NA 0.015 হয়। এই হিসাবে—

$$d = \frac{0.61 \times 0.05}{0.015} = \frac{0.0305}{0.015} = 2\,\text{Å}$$

অর্থাৎ ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সাহায্যে 2Å আয়তন বিশিষ্ট ক্ষুদ্রতম বস্তু যা 2Å দূরত্ব দিয়ে অপর বস্তু থেকে পৃথক আছে, তাকেও স্পষ্ট ও পৃথকভাবে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়।

অন্যদিকে সাধারণ আলোক অণুবীক্ষণের ক্ষেত্রে অভিলক্ষ্যের NA 1.2 হয় এবং দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য 5400Å হয়। এই হিসাবে—

$$d = \frac{0.61 \times 5400}{1.2} = 2745\,\text{Å}$$

অর্থাৎ সাধারণ অণুবীক্ষণে যে ক্ষুদ্রতম বস্তুকে পৃথক ও স্পষ্ট রূপে দেখা যাবে তার আয়তন 2745Å হতে পারে।

অত্যাধুনিক ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে, নির্গত ইলেকট্রন রশ্মির গতিবেগ বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়। এই উচ্চগতির ইলেকট্রন রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক কম হওয়ায় সংশ্লিষ্ট অণুবীক্ষণের বিশ্লেষক ক্ষমতা 0.2Å অবধি করা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে, উচ্চগতির ইলেকট্রন রশ্মি বস্তুকে সোজাসুজিভাবে অতিক্রম করায়, বস্তুর ইলেকট্রন কণার সাথে রশ্মির কণার সংঘাতের সম্ভাবনা কম থাকে। ফলে নমুনা থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছুরণ কম হয় ও নমুনাটি অক্ষত থাকে।

5.3.6 আলোক অণুবীক্ষণের তুলনায় ট্রান্সমিশন অণুবীক্ষণের সমস্যা ও তাদের প্রতিকার

আলোক অণুবীক্ষণের তুলনায় ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের বিবর্ধক এবং বিশ্লেষক ক্ষমতা বহুগুণ বেশি হলেও এই ধরনের অণুবীক্ষণে কিছু সমস্যা আছে যা বিভিন্নভাবে সমাধান করা সম্ভব।

(1) সাধারণ আলোর ভেদ্যতা অনেক বেশি হওয়ায় আলোক অণুবীক্ষণে 5–10μ পুরু নমুনাকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। কিন্তু ইলেকট্রন রশ্মির ভেদ্যতা কম হওয়ায়, এই রশ্মি 0.5μ পুরু বস্তুর মধ্য দিয়েও প্রবাহিত হতে পারে না ফলে এই অণুবীক্ষণের ক্ষেত্রে পরীক্ষাধীন বস্তুর নমুনা অতি পাতলা (500Å) হওয়া প্রয়োজন। আলট্রামাইক্রোটোম নামক যন্ত্রে, হীরক-ছুরির (diamond knife) সাহায্যে এই অতি পাতলা নমুনাস্তর প্রস্তুত করা হয়।

(2) জীবদেহের নমুনা সাধারণত নরম ও জলীয় হয়। সাধারণ আলো জলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে, ফলে আলোক অণুবীক্ষণে জীবদেহের নমুনাকে সহজেই পর্যবেক্ষণ করা যায়। কিন্তু ইলেকট্রন কণার সাথে জল পরমাণুর সংঘর্ষ ঘটায়, জীবদেহের নমুনা পর্যবেক্ষণের সময়, উক্ত নমুনাকে বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত (fixation) এবং উপযুক্তভাবে শুষ্ক করা প্রয়োজন। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে পরীক্ষাধীন বস্তুকে গ্লুটার‍্যালডিহাইড, অস্‌মিয়াম টেট্রাঅক্সাইড জাতীয় সংরক্ষকে সংরক্ষিত করা হয় এবং অ্যালকোহল ও অ্যাসিটোনের সাহায্যে শুষ্ক করা হয়।

(3) নমুনার অতি পাতলা স্তরদের কাঁচের স্লাইডের পরিবর্তে সূক্ষ্মছিদ্রযুক্ত ধাতব ঝাঁঝরির (mental grid) মধ্যে স্থাপন করা হয়। সাধারণত তামা, নিকেল, সোনা ইত্যাদি ঝাঁঝরি ব্যবহার করা হয় যাদের আয়তন প্রায় 3 মিমি হয়।

(4) পরীক্ষাধীন নমুনার বিভিন্ন অঞ্চলের ইলেকট্রন বিচ্ছুরণ ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ভারী ধাতব যৌগের রঞ্জকে পরীক্ষাধীন নমুনাকে রঞ্জিত করা হয়। সাধারণত ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে ঝাঁঝরিতে স্থাপিত নমুনাদের বিশেষভাবে ইউরানিল অ্যাসিটেট ও লেড অ্যাসিটেটের সাহায্যে রঞ্জিত করা হয়।

(5) ইলেকট্রন রশ্মি বায়ুতে উপস্থিত বিভিন্ন গ্যাসীয় মৌলের সাথে সংঘর্ষ ঘটায়। এই কারণে ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের দেহনলকে প্রায় বায়ু শূন্য করা হয়।

(6) আলোক প্রতিবিম্বকে আমরা সরাসরি খালি চোখে প্রত্যক্ষ করে থাকি, কিন্তু অদৃশ্য ইলেকট্রন রশ্মির সাহায্যে গঠিত প্রতিবিম্বকে প্রতিপ্রভ পর্দা বা ফটোফিল্মের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

(7) ট্রান্সমিশন অণুবীক্ষণে ব্যবহৃত তড়িৎচুম্বকীয় লেন্সের মধ্য দিয়ে উচ্চ ভোল্টের তড়িৎপ্রবাহের জন্য ঐ লেন্স সহজেই উত্তপ্ত হয়ে যায়। এই তাপ হ্রাস করার জন্য, প্রতিটি লেন্সের চতুর্দিকে শীতল জলের ধারা থাকে।

(8) এই অণুবীক্ষণের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের আয়তন খুব বেশি হওয়ায়, ব্যবহারিক সুবিধার জন্য সমগ্র ব্যবস্থাটি উল্টানো হয়। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে উজ্জ্বলকারক উৎস ঊর্ধ্বভাগে এবং দর্শনক্ষেত্র যন্ত্রের নিম্নভাগে থাকে।

5.3.7 জীববিদ্যায় ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের প্রয়োগ

(1) জীবকোষের বিভিন্ন অঙ্গাণু, যথা কোষপর্দা, মাইটোকনড্রিয়া, গলগিবস্তু, রাইবোজোম, প্লাসটিড ইত্যাদিব অন্তর্গঠনের বিশদ বিবরণ আমরা ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সাহায্যে জানতে পারি।

(2) এককোষী জীব যেমন অ্যামিবা, প্যারামোসিয়াম, শ্যাওলা ; জীবাণু যেমন ব্যাকটেরিয়া, মাইকোপ্লাজমা ইত্যাদির অন্তর্গঠন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে পারি।

(3) ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে নেগেটিভ স্টেইনিং নামক (negative staning) পদ্ধতিতে ভাইরাস কণার প্রোটিন আবরণীর গঠন জানা যায়। এই ক্ষেত্রে কোনো ভারী ধাতব যৌগের দ্রবণে (যেমন, ইউরানিল অ্যাসিটেট বা ফসফোটাংস্টিক অ্যাসিড) ভাইরাস কণাদের ভাসমান রাখা হয়। ফলে ভাইরাসের প্রোটিন আবরণীর মধ্যবর্তী সকল স্থানেই ধাতব যৌগের দ্রবণ প্রবেশ করে। এই অবস্থায় তাদের ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে পর্যবেক্ষণ করলে, প্রোটিন কণাদের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ এবং চারপাশের ধাতব যৌগপূর্ণ স্থানকে অপেক্ষাকৃত গাঢ় বর্ণের দেখায়। এই ঘন স্থানের মাঝে মাঝে প্রোটিন আবরণীর গঠনানুসারে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ স্থান পর্যবেক্ষণ করে ভাইরাসের প্রোটিন আবরণীর সঠিক চিত্র পাওয়া যায়।

5.4 স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ (Scanning electron microscope)

যে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সাহায্যে কোষ বা কোনও বস্তুর পৃষ্ঠতলের নিখুঁত বিবরণ (surface topography) পাওয়া যায় এবং যে অণুবীক্ষণে গৌণ ইলেকট্রন রশ্মির সাহায্যে পরীক্ষাধীন নমুনার পৃষ্ঠতলকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ (scan) করা হয়, তাকে স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ বলা হয়।

5.4.1 গৌণ ইলেকট্রন রশ্মি (Secondary electron beam)

স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের কার্য পদ্ধতি আলোচনার পূর্বে গৌণ ইলেকট্রন রশ্মি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। উৎস থেকে নির্গত প্রাথমিক ইলেকট্রন রশ্মি যখন কোনও বস্তু বা

নমুনার ওপর আপতিত হয় তখন বস্তুর পরমাণুর ইলেকট্রন কণারা কিছু আপতিত ইলেকট্রন কণাদের শোষণ করে এবং কম শক্তি সম্পন্ন ইলেকট্রন কণা নির্গত করে, এই প্রকার ইলেকট্রন কণাদের গৌণ ইলেকট্রন কণা বলা হয়, যাদের সাহায্যে স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে বস্তুর পৃষ্ঠতলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ বা স্ক্যান করা হয়।

5.4.2 স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের গঠন ও তাদের কার্যপ্রণালী

(1) ইলেকট্রন গান ও ইলেকট্রন রশ্মির সৃষ্টি ঃ ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের মতো স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের 'V' আকৃতির টাংস্টেন ফিলামেন্ট, ক্যাথোড ও অ্যানোড তড়িৎদ্বার যুক্ত একটি ইলেকট্রন গানকে ইলেকট্রন রশ্মির উৎসরূপে ব্যবহার করা হয়। টাংস্টেন ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে উচ্চভোল্টের (40KV – 100 KV) তড়িৎ চালনা করে, ফিলামেন্টকে 3000° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয় এবং ইলেকট্রন রশ্মি সৃষ্টি করা হয়।

(2) কনডেনসার ও ইলেকট্রন পেনসিলের সৃষ্টি ঃ একাধিক তড়িৎচুম্বকীয় কনডেনসার লেন্সের সাহায্যে উপরিক্তভাবে সৃষ্ট ইলেকট্রন রশ্মিদের ঘনীভূত করে খুব সূক্ষ্ম রশ্মিতে পরিণত করা হয় যা ইলেকট্রন পেনসিল (electron pencil) নামে পরিচিত। এই সূক্ষ্ম রশ্মির ব্যাস 1000Å বা তারও কম হয়।

(3) স্ক্যানিং কয়েল ও পৃষ্ঠতলের বিশদ গঠন নিরূপণ ঃ স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের দেহ নলের মধ্যে, একপাশে একটি তড়িৎচুম্বকীয় স্ক্যানিং কয়েল বা ডিফ্লেক্টর কয়েল (scanning coil/ deflector coil) থাকে। এই কয়েলের সাহায্যে ইলেকট্রন পেনসিলকে পরীক্ষাধীন বস্তুর ওপর আয়তাকার স্থানে, অগ্রপশ্চাৎ ভাবে বা রৈখিকভাবে অপতিত করা হয় অর্থাৎ বস্তুর পৃষ্ঠতলের নির্দিষ্ট স্থানকে স্ক্যান করা হয়। পরীক্ষাধীন বস্তুকে অণুবীক্ষণের পাদদেশের কাছে আপতিত রশ্মির সাথে তির্যকভাবে স্থাপন করা হয় (চিত্র নং 4)।

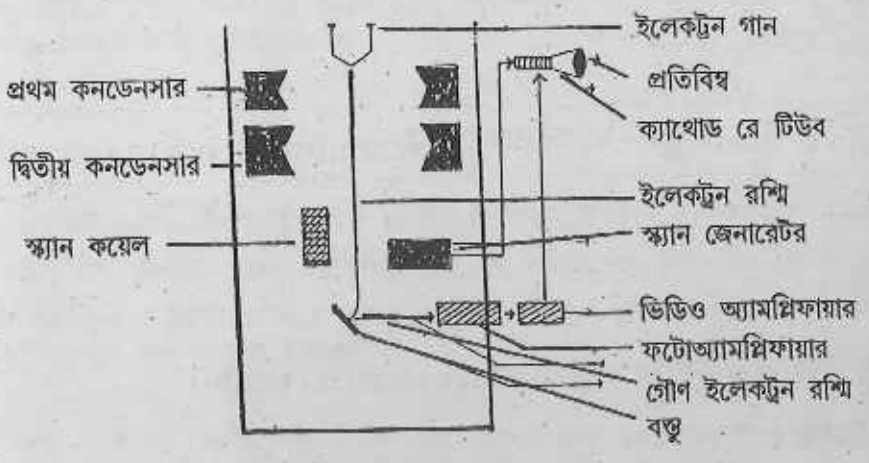

চিত্র নং 4 : স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের বিভিন্ন অংশ ও তাদের সাহায্যে প্রতিবিম্ব গঠন (রৈখিক চিত্র)

(4) স্ক্যান জেনারেটর এবং ক্যাথোড রে টিউবের স্ক্যান : স্ক্যান কয়েলের কাছেই v অপর একটি ইলেকট্রন গান অবস্থিত থাকে যা স্ক্যান জেনারেটর নামে পরিচিত। এই গান থেকে প্রাথমিক ইলেকট্রন রশ্মি উৎপন্ন করে, বস্তুর পৃষ্ঠতলের স্ক্যানের সাথে সমতালে এবং যুগপৎভাবে একটি ক্যাথোড রে টিউব (cathod ray tube) কে স্ক্যান করা হয় (চিত্র নং 4)।

(5) ফটোমাল্টিপ্লায়ার টিউব : পরীক্ষাধীন বস্তুর ওপর ইলেকট্রন পেন্সিল আপতিত হবার পর যে সকল বিচ্ছুরিত রশ্মি (back scattered) এবং গৌণ ইলেকট্রন রশ্মি নির্গত হয়, তারা একত্রে প্রথমে একটি ফটোমাল্টিপ্লায়ার টিউব (photomultiplier tube) দিয়ে গৃহীত হয়। এদের মধ্যে উচ্চশক্তি সম্পন্ন ব্যাক স্কাটার্ড রশ্মিরা ঐ টিউব দিয়ে বিচ্যুত হয় ও কমশক্তিসম্পন্ন গৌণ রশ্মিরাই শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

(6) ভিডিও অ্যামপ্লিফায়ার : ফটোমাল্টিপ্লায়ার থেকে গৌণ ইলেকট্রন রশ্মিরা অবশেষে একটি ভিডিও অ্যামপ্লিফায়ারের (video amplifier) মধ্য দিয়ে চালিত হয়। ফলস্বরূপ গৌণ ইলেকট্রন রশ্মির বহুগুণ বিবর্ধিত সংকেত গঠিত হয়।

(7) ক্যাথোড রে টিউবে প্রতিবিম্ব গঠন : সবশেষে বিবর্থিত গৌণ ইলেকট্রন সংকেত, ক্যাথোড রে টিউবে প্রবেশ করে। এই টিউবটিকে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক ইলেকট্রন রশ্মির সাহায্যে স্ক্যান করা হয়েছে। গৌণ ইলেকট্রন কণারা, ক্যাথোড রে টিউবে ইতিমধ্যেই আগত প্রাথমিক ইলেকট্রন কণাদের থেকে শক্তি সংগ্রহ করে এবং উত্তেজিত হয়। এই গৌণ কণারা তখন শোষিত অতিরিক্ত শক্তিকে দৃশ্যমান আলোরূপে ত্যাগ করে। এই আলোই ক্যাথোড রে টিউবের মধ্যে বস্তুর পৃষ্ঠতলের সঠিক প্রতিবিম্ব গঠন করে। বস্তুর পৃষ্ঠতলের বিভিন্ন প্রান্ত বা অংশ থেকে বিভিন্ন সংখ্যার গৌণ ইলেকট্রনকণা নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, প্রতিবিম্বের মধ্যে বস্তুর পৃষ্ঠতলের ত্রৈমাত্রিক গঠন দেখা যায়।

5.4.3 পরীক্ষাধীন নমুনার প্রস্তুতি

স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করার জন্য, বস্তুকে ভিন্নভাবে প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়। নমুনা প্রস্তুতির সাধারণ পর্যায়গুলি হল—

(1) সংরক্ষণ **(fixation)** : পরীক্ষাধীন নমুনা শক্ত প্রকৃতির, যথা পতঙ্গের দেহাংশ হয়, সেই ক্ষেত্রে বিনা সংরক্ষণেই সরাসরি নমুনাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। অন্যদিকে নরম প্রকৃতির বস্তু, যেমন জীবদেহাংশ পর্যবেক্ষণের সময় নমুনাকে গ্লুটার‍্যালডিহাইড ও অস্মিয়াম টেট্রাঅক্সাইড জাতীয় সংরক্ষকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখা হয়।

(2) জলদূরীকরণ **(del hydration)** : পরবর্তী পর্যায়ে বাফার দ্রবণের সাহায্যে সংরক্ষিত নমুনা থেকে প্রথমে সংরক্ষক এবং পরবর্তী পর্যায়ে ক্রম উচ্চ ঘনত্বের অ্যালকোহলের মধ্য দিয়ে চালনা করে নমুনা থেকে জল অপসারণ করা হয়।

(3) চূড়ান্ত শুষ্কীকরণ **(critical point drying)** : ন্যূনতম জলকণার উপস্থিতি ও নমুনার পৃষ্ঠতলের

সংকোচন ঘটিয়ে বিকৃত প্রতিবিম্ব গঠন করতে পারে। ফলে পর্যবেক্ষণের পূর্বেই নমুনাকে বদ্ধ প্রকোষ্টের মধ্যে অ্যাসিটোনে নিমজ্জিত রাখা হয়। তারপর তরল কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসকে উচ্চ চাপে নমুনার ওপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চালনা করে নমুনা থেকে শেষ জলবিন্দুকে দূরীভূত করা হয়।

(4) **পৃষ্ঠতলের প্রলেপন (surface coating) :** চূড়ান্তভাবে শুষ্ক নমুনাকে তারপর বিশেষ ধরনের ধাতব খণ্ডের (stub) ওপর স্থাপন করে, নমুনার ওপর সোনা বা প্যালাডিয়াম জাতীয় ভারী ধাতুর অতিপাতলা (কয়েক অ্যাংস্ট্রম পুরু) প্রলেপ ফেলা হয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি বায়ুশূন্যস্থানে করা হয়। এইভাবে ধাতু প্রলেপনের মাধ্যমে নমুনা থেকে গৌণ ইলেকট্রনের নিঃসরণ বৃদ্ধি করা হয়।

5.4.4 স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা : (1) এই অণুবীক্ষণে পর্যবেক্ষণের সময়, পরীক্ষাধীন নমুনার মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন রশ্মি প্রবেশ করে না, ফলে যে কোনও নমুনাকে এই অণুবীক্ষণে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

(2) পরীক্ষাধান বস্তুর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন রশ্মি প্রবেশ না করার জন্য, এই ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব গঠনকারী অভিলক্ষ্য, প্রজেক্টর বা অন্তর্বর্তী লেন্সের প্রয়োজন হয় না।

(3) পরীক্ষাধীন নমুনার পৃষ্ঠতলের ত্রৈমাত্রিক চিত্র পর্যবেক্ষণ করা যায়।

অসুবিধা : (1) পরীক্ষাধান নমুনার পৃষ্ঠতলের বিশদ গঠন জানা সম্ভব হলেও অন্তর্গঠন সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

(2) আলট্রামাইক্রোটোমের সাহায্যে অতি পাতলা স্তর প্রস্তুতির প্রয়োজন না হলেও বস্তুর চূড়ান্ত শুষ্কীকরণ ও ধাতু প্রলেপন প্রভৃতি প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়।

5.4.5 জীববিদ্যায় স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের প্রয়োগ

(1) জীবদেহের বিভিন্ন কলা ও কোষের পৃষ্ঠতলের সূক্ষ্ম গঠনের বিশদ বিবরণ জানা সম্ভব হওয়ায়, সংশ্লিষ্ট কোষের কাজ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। যেমন, অ্যামিবা বা নিউট্রোফিলের পৃষ্ঠতলে ক্ষণপদের উপস্থিতি ঐ সকল কোষের ফ্যাগোসাইটোসিস কার্যক্ষমতার নির্দেশ দেয়। অন্যদিকে ফিতাকৃমির বহিস্ত্বকে অবস্থিত মাইক্রো ভিলাই প্রত্যক্ষ করে বোঝা যায় যে ঐ কলাস্তরের শোষণ ক্ষমতা আছে।

(2) কোনও কোনও কোষের পৃষ্ঠতলের অস্বাভাবিক গঠন কিছু রোগনির্ণয়ে সাহায্য করে। যেমন, স্বাভাবিক মানবরক্তের লোতি কণিকাকে স্ক্যানিং অণুবীক্ষণে দ্বিঅবতল চাকতির ন্যায় দেখায়, কিন্তু বিটা লাইপো প্রোটিনেমিয়া (beta lipoproteinaemia) রোগীর লোহিত কণিকার পৃষ্ঠতলে কণ্টকাকৃতির উপবৃদ্ধি দেখা যায়।

(3) কিছু কিছু ক্যানসার রোগ নিরূপণে এই অণুবীক্ষণ বিশেষভাবে সাহায্য করে। যেমন—ক্যানসার আক্রান্ত কোলন কোষের গায়ে স্বাভাবিক কোলন কোষ অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতির মাইক্রোভিলাই এবং বিচ্ছিন্ন কোষ পর্দা দেখা যায়।

(4) দুই ধরনের লিম্ফোসাইট কোষের গঠনগত মূল পার্থক্য স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সাহায্যেই নিরূপণ করা হয়। বি-লিম্ফোসাইটের গায়ে কিছু লম্বাকৃতির মাইক্রোভিলাই থাকে, অপরদিকে টি-লিম্ফোসাইটের মাইক্রোভিলাইরা আকৃতিতে ক্ষুদ্র হয়।

(5) বিভিন্ন ফুলের রেণুর বহির্গঠনের সাহায্যে ঐ রেণু উৎপাদনকারী গাছেদের শনাক্ত করা যায়।

(6) ধাতব কেলাসের বা ক্ষুদ্রাকৃতির ধাতু খণ্ডের চিত্র পর্যবেক্ষণ করে তাদের শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

5.5 অনুশীলনী

1. ছোট প্রশ্ন ঃ

(ক) ঠিক না ভুল নির্দেশ করুন ঃ

(1) ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে প্রাথমিক ইলেকট্রন রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

(2) অ্যানোড তড়িৎদ্বার টাংস্টেন ফিলামেন্টের চতুর্দিকে থাকে।

(3) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে অভিলক্ষ্যর বদলে প্রজেক্টর লেন্স ব্যবহৃত হয়।

(4) তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্য খুব বেশি হয়।

(5) দৃশ্যমান আলোর থেকে ইলেকট্রন রশ্মির গতিবেগ অনেক বেশি হয়।

(6) গৌণ ইলেকট্রন রশ্মির শক্তি, প্রাথমিক ইলেকট্রন রশ্মির চেয়ে কম হয়।

(7) স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের দেহনলের বাইরে স্ক্যানিং কয়েল বসান থাকে।

(8) স্ক্যান জেনারেটর গৌণ ইলেকট্রন রশ্মি নির্গত করে।

(9) স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের যে কোনও পুরুত্বের বস্তু পর্যবেক্ষণ করা যায়।

(10) স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে বস্তুর দ্বিমাত্রিক চিত্র গঠিত হয়।

(খ) এক কথায় উত্তর দিন ঃ

(1) স্ক্যানিং অণুবীক্ষণে পর্যবেক্ষণের জন্য বস্তুর ওপর ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয় কেন?

(2) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে পরীক্ষাধীন বস্তুদের সংরক্ষণের জন্য কি ব্যবহার করা হয়?

(3) স্ক্যান জেনারেটর কাকে স্ক্যান করে?

(4) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের বিশ্লেষক ক্ষমতা কত হতে পারে?

(5) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে কি ধরনের লেন্স ব্যবহৃত হয়?

(6) কি ধরনের পর্দায় ইলেকট্রন প্রতিবিম্ব দেখা যায়?

(7) ফিলামেন্টের মধ্য থেকে কিভাবে ইলেকট্রন রশ্মি উৎপন্ন করা হয়?

(8) ইলেকট্রন পেনসিল কোন্ ধরনের অণুবীক্ষণে ব্যবহৃত হয় ?

(9) কি পদ্ধতিতে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সাহায্যে ভাইরাসের প্রোটিন আবরণীর গঠন জানা যায় ?

(10) ভিডিও অ্যামপ্লিফায়ার কোন্ অণুবীক্ষণে থাকে ?

2. মাঝারি প্রশ্ন ঃ

(ক) স্ক্যানিং অণুবীক্ষণে পর্যবেক্ষণের পূর্বে বস্তুকে কিভাবে শুষ্ক করা হয় ?

(খ) ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের বিশ্লেষক ক্ষমতাকে কিভাবে বেশি করা যায় ?

(গ) কিভাবে কোন্ ধরনের পর্দায় ইলেকট্রন প্রতিবিম্বকে সংগ্রহ করা যায় ?

(ঘ) ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে কি কি লেন্স ব্যবহৃত হয় ?

(ঙ) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের উজ্জ্বলতার উৎসের সচিত্র বর্ণনা দিন।

(চ) গৌণ ইলেকট্রন রশ্মি কাকে বলে ? এদের কিভাবে সৃষ্টি করা হয় ?

(ছ) স্ক্যানিং কয়েলের কাজ কি ?

(জ) ক্যাথোড রে টিউব কিভাবে বস্তুর পৃষ্ঠতলের প্রতিবিম্ব গঠনে সাহায্য করে ?

(ঝ) স্ক্যানিং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের তিনটি ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ করুন।

(ঞ) সাধারণ আলোক অণুবীক্ষণের তুলনায় ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে কি কি অসুবিধা আছে ?

3. বড় প্রশ্ন ঃ

(ক) ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

(খ) চিত্র সহ ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সাহায্যে প্রতিবিম্ব গঠন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

(গ) জীববিদ্যায় ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের বিভিন্ন প্রয়োগের উল্লেখ করুন।

(ঘ) স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও তাদের কাজ বুঝিয়ে বলুন।

(ঙ) স্ক্যানিং ইলেকট্রন ও ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

5.6 উত্তরাবলী

1.(ক) (1) ঠিক, (2) ভুল, (3) ভুল, (4) ভুল, (5) ঠিক, (6) ঠিক, (7) ভুল, (8) ভুল, (9) ঠিক, (10) ভুল।

(খ) (1) পরীক্ষাধীন নমুনা থেকে ইলেকট্রন নিঃসরণ বৃদ্ধি করার জন্য, চূড়ান্ত শুষ্ক নমুনার ওপর ভারী ধাতুর অতি পাতলা প্রলেপ দেওয়া হয়।

(2) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে পরীক্ষাধীন বস্তুদের শুষ্ক করার জন্য নমুনাকে অ্যাসিটোন, অ্যালকোহল প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। তবে স্ক্যানিং অণুবীক্ষণে পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে নমুনাকে তরল কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাহায্যে চূড়ান্তভাবে শুষ্ক করা হয়।

(3) স্ক্যান জেনারেটর থেকে প্রাথমিক ইলেকট্রন রশ্মি নির্গত হয়ে ক্যাথোড রে টিউবকে স্ক্যান করে।

(4) অত্যাধুনিক ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের বিশ্লেষক ক্ষমতা 0.2Å অবধি হতে পারে।

(5) ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে তড়িৎচুম্বকীয় লেন্স ব্যবহৃত হয়। এই প্রকার লেন্সে কাঁচা লোহা নির্মিত আবরণীর মধ্যে প্রবাহী তারের কুণ্ডলী থাকে।

(6) প্রতিপ্রভ পর্দা বা ফটোফিল্মের সাহায্যে ইলেকট্রন প্রতিবিম্ব সংগ্রহ করা যায়।

(7) ইলেকট্রন গানের টাংস্টেন ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে উচ্চ ভোল্টযুক্ত তড়িৎ (10,000–120,000 ভোল্ট) প্রবাহ ঘটিয়ে ফিলামেন্টকে উত্তপ্ত করা হলে, তা থেকে ইলেকট্রন রশ্মি নির্গত হয়।

(8) ইলেকট্রন পেনসিল স্ক্যানিং ইলেকট্রনে ব্যবহৃত হয়।

(9) নেগেটিভ স্টেইনিং পদ্ধতির সাহায্যে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে ভাইরাসের আবরণীর গঠন পর্যবেক্ষণ করা যায়।

(10) স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণে থাকে।

2. (ক) অনুচ্ছেদ 5.4.3 এর 2 ও 3 নং পয়েন্ট দেখুন।

(খ) অনুচ্ছেদ 5.3.5 দেখুন।

(গ) 5.3.3-এর 4নং পয়েন্ট দেখুন।

(ঘ) 5.3.2-এর খ, গ, ঘ ও ঙ দেখুন।

(ঙ) অনুচ্ছেদ 5.3.2-এর ক ও 1নং চিত্র দেখুন।

(চ) 5.4.2 দেখুন।

(ছ) অনুচ্ছেদ 5.4.2-এর 3নং পয়েন্ট দেখুন।

(জ) অনুচ্ছেদ 5.4.2-এর 7 ও 4 নং পয়েন্ট দেখুন।

(ঝ) 5.4.5 দেখুন।

(ঞ) অনুচ্ছেদ 5.3.6 দেখুন।

3. (ক) অনুচ্ছেদ 5.3.2 ও চিত্র নং-1, 2 দেখুন।

(খ) অনুচ্ছেদ 5.3.3 ও চিত্র নং-3 দেখুন।

(গ) অনুচ্ছেদ 5.3.7 দেখুন।

(ঘ) 5.4.2-এর 1, 2, 3, 4, 5, 6 ও 7নং পয়েন্ট দেখুন।

(ঙ)

ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ	স্ক্যানিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ
(1) বস্তুর অন্তর্গঠনের বিশদ ও বহুগুণ বর্ধিত প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়।	(1) বস্তুর পৃষ্ঠতলের বিবর্ধিত ও ত্রৈমাত্রিক প্রতিবিম্ব পাওয়া যায়।
(2) উৎস থেকে নির্গত প্রাথমিক ইলেকট্রন রশ্মির সাহায্যে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।	(2) নমুনার ওপর আপতিত রশ্মি থেকে নির্গত গৌণ ইলেকট্রন রশ্মির সাহায্যে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।
(3) কনডেনসার, অভিলক্ষ্য, প্রজেক্টর, ও অন্তর্বর্তী লেন্স থাকে।	(3) শুধুমাত্র কনডেনসার লেন্স থাকে।
(4) স্ক্যান কয়েল, স্ক্যান জেনারেটর, ফটো অ্যামপ্লিফায়ার টিউব ও ভিডিও অ্যামপ্লিফায়ার প্রভৃতি থাকে না।	(4) স্ক্যান কয়েল, স্ক্যান, জেনারেটর, ফটো-অ্যামপ্লিফায়ার টিউব, ভিডিও অ্যামপ্লিফায়ার প্রভৃতি যন্ত্রাংশ থাকে।
(5) পরীক্ষাধীন নমুনাকে 'হীরক' ছুরির সাহায্যে আলট্রামাইক্রোটোম যন্ত্রের অতি পাতলা স্তরে পরিণত করা প্রয়োজন।	(5) পরীক্ষাধীন নমুনাকে পাতলা স্তরে পরিণত করার প্রয়োজন হয় না।
(6) নমুনার ওপর ভারী ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয় না।	(6) নমুনার ওপর ভারী ধাতুর পাতলা প্রলেপ দেওয়া হয়।

একক 6 ❐ ইলেকট্রোফোরেসিস এবং ক্রোমাটোগ্রাফি (Electrophoresis and Chromatography)

গঠন ঃ

6.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

6.2 ইলেকট্রোফোরেসিস—সংজ্ঞা

6.3 পদার্থকণার ইলেক্ট্রোফোরেসিস সংক্রান্ত গতিশীলতা

6.4 বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রোফোরেসিস পদ্ধতি

6.5 ক্রোমাটোগ্রাফি

6.6 সাধারণ নীতি

6.7 ক্রোমাটোগ্রাফির প্রকারভেদ

6.8 পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি

6.9 থিনলেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি

6.10 মলিকুলার সিভ ক্রোমাটোগ্রাফি

6.11 আয়ন বিনিময় ক্রোমাটোগ্রাফি

6.12 অ্যাফিনিটি ক্রোমাটোগ্রাফি

6.13 হাই-পারফরম্যান্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি

6.14 অনুশীলনী

6.15 উত্তরাবলী

6.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা ঃ

কোষের আণুবীক্ষণিক গঠন সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সাথে সাথে জানা যায় যেসব কোষের রাসায়নিক সংগঠন সর্বত্র এক নয়। কোষের মধ্যে একাধিক জৈব পদার্থরা সাধারণত সংমিশ্রিত অবস্থায় বর্তমান থাকে। যেমন রক্তরসের মধ্যে একাধিক প্রোটিনকণারা ভাসমান থাকে। অন্যদিকে কোষপর্দায় প্রোটিন

অণুরা, লিপিড ও শর্করা অণুর সাথে সংযুক্ত থাকে। বিজ্ঞানীরা দেখেন যে বিভিন্ন জৈব অণুদের আকার, আয়তন ও আণবিক ওজন, আধানের পরিমাণ, পরস্পর থেকে পৃথক। জৈব অণুদের এইসব বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়েই জীব পদার্থবিদরা কিছু পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, যাদের সাহায্যে যে কোনও জৈব অণুকে, ভিন্ন প্রকৃতির জৈব অণু থেকে পৃথক করা সম্ভব। একইভাবে একই প্রকৃতির একাধিক জৈব অণুর মিশ্রণ থেকেও প্রতিটিকে পৃথক করা সম্ভব। এইরকম দুটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হল ইলেক্ট্রোফোরেসিস ও ক্রোমাটোগ্রাফি। উভয় পদ্ধতিরই অসংখ্য প্রকারভেদ আছে। যাদের সাহায্যে প্রস্তুতকারক (preparative) এবং বিশ্লেষক (analytical) উভয় ধরনের পৃথকীকরণই সম্ভব। যেমন, রক্তের প্রোটিনদের অন্যান্য জৈব পদার্থ (শর্করা, লিপিড) থেকে পৃথক করা যায়, তেমনই রক্তের প্রোটিনে কতটা অ্যালবুমিন বা গ্লোবিউলিন জাতীয় প্রোটিন আছে তা নির্ণয় করা যায়। শুধু তাই নয়, এই পদ্ধতির সাহায্যে পৃথকীকৃত, বিশুদ্ধ জৈব অণুর গঠনগত বিশ্লেষণও (প্রোটিনে অবস্থিত পলিপেপটাইড শৃঙ্খল) সম্ভব হয়েছে। এইভাবে, ইলেকট্রোফোরেসিস ও ক্রোমাটোগ্রাফির বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে মিশ্রণ থেকে মিশ্রিত পদার্থের পৃথকীকরণ ও জীবদেহের জৈবরাসায়নিক গঠন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ সম্ভব।

উদ্দেশ্য ঃ

জীব গঠনকারী কোষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের জৈব অণু থাকে। যেমন, প্রোটিন, শর্করা, লিপিড, নিউক্লীয় অম্ল প্রভৃতি। এই সকল জৈব অণুর মিশ্রণ থেকে তাদের প্রত্যেককে পৃথক করার পদ্ধতি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আমরা জানতে পারব।

- একই প্রকারের কিন্তু ভিন্ন আয়তন ও ওজনের জৈব অণুর মিশ্রণ থেকে কিভাবে তাদের পৃথক করা যাবে সে সম্পর্কে জ্ঞান দান করা এই অধ্যায়ের অপর একটি উদ্দেশ্য।
- কি কি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জৈব অণুরা পৃথকীকৃত হয়, প্রায় একই বৈশিষ্ট্য যুক্ত জৈব অণুদের মধ্যে কীভাবে পার্থক্য নিরূপণ করা হয়, অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে মিশ্রণ থেকে বিশুদ্ধ কোনও পদার্থকে সংগ্রহ করা যায় এসব তথ্য এই অধ্যায় থেকে জানা যাবে।
- এছাড়া কোনও মিশ্রণ সমসত্ত্ব না অসমসত্ত্ব প্রকৃতির, কোন ধরনের কোষে কোন কোন জৈব পদার্থ কি পরিমাণে থাকে, কোনও জৈব অণু কি কি গঠনগত একক নিয়ে গঠিত হয় এসব তথ্যও আমরা এই অধ্যায় থেকে জানতে পারব।

6.2 ইলেকট্রোফোরেসিসের (Electrophoresis) সংজ্ঞা

এক কথায় আয়নিত পদার্থের মিশ্রণ থেকে পদার্থদের পৃথক করার পদ্ধতিকে ইলেকট্রোফোরেসিস বলা যায়। কোনও তরল বা অর্ধতরল মাধ্যমের মধ্যে তড়িৎপ্রবাহ চালনা করলে ঐ মাধ্যমের উপস্থিত

বৃহদায়তনের কণারা (macromolecules) বিভিন্ন হারে চলনশীল থাকে। এই চলনহারের পার্থক্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন কণাদের মিশ্রণ থেকে প্রত্যেককে পৃথক করাই হল ইলেকট্রোফোরেসিস। বৃহৎ কণা যেমন—প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদিদের পৃথক করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতি আছে। এই অধ্যায়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদ্ধতির বর্ণনা দেওয়া হল।

6.3 পদার্থকণার ইলেকট্রোফোরেসিস সংক্রান্ত গতিশীলতা (Electrophoretic mobility of particle)

ইলেকট্রোফোরেসিসের সময়, যে গতিতে কোনও আধানযুক্ত কণা, যথা প্রোটিন অণু, বিপরীত আধানযুক্ত তড়িৎদ্বারের দিকে গমন করে, সেই গতিকে তার ইলেকট্রোফোরেসিস সংক্রান্ত গতিশীলতা বলা হয়। এই গতিতে সেমি^{2} সেকেন্ড$^{-1}$ ভোল্ট$^{-1}$ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এই গতিশীলতা, পদার্থকণার মোট আধান, আয়তন, মাধ্যমের pH, তাপমাত্রা ও সান্দ্রতার ওপর নির্ভরশীল।

6.4 বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতি

(1) ফ্রি বা মুভিং বাউন্ডারি ইলেকট্রোফোরেসিস **(Free/Moving-boundary electrophoresis)** : 1937 সালে সুইডেনের বিজ্ঞানী A. Tisclius এই আদর্শ এবং মৌলিক ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এর সাহায্যে তিনি রক্তরসের প্রোটিন কণাদের পৃথক করেন।

মূল কার্যপ্রণালী ঃ এই ব্যবস্থাপনায় কাঁচনির্মিত 'U' আকৃতির একটি পাত্রে, বাফারে প্রস্তুত প্রোটিন মিশ্রণ রাখা হয়। বাফারের pH এমন করা হয়, যাতে সব প্রোটিন অণুর pH একই প্রকারের থাকে। প্রোটিন দ্রবণপূর্ণ 'U' টিউবটিকে তারপর 4° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় একটি তাপনিয়ন্ত্রক (temperature controlled) বাথের (bath) মধ্যে স্থিরভাবে স্থাপন করা হয়। তারপর 'U' টিউবের দুই বাহুর প্রোটিন দ্রবণের ওপর শুধ বাফার দ্রবণ ঢালা হয় এবং এই বাহুর মধ্যে দুটি তড়িৎদ্বার প্রবেশ করিয়ে তাদের মধ্য দিয়ে 6 ভোল্ট/সেকেন্ড এই হিসাবে একমুখী তড়িৎ (direct current) প্রায় 4-5 ঘণ্টা ব্যাপি চালনা করা হয়। এইভাবে তড়িৎ চালনার ফলে, মিশ্রণে অবস্থিত বিভিন্ন প্রোটিন কণারা বিপরীত আধানযুক্ত তড়িৎদ্বারের দিকে গমন করে এবং তাদের আণবিক ওজনের পার্থক্যের ভিত্তিতে বাফার দ্রবণের এক একটি স্তরে পট্টির আকারে সঞ্চিত হয়। অবশেষে UV আলোকরশ্মি শোষণের মাধ্যমে বিভিন্ন পট্টিতে অবস্থিত প্রোটিনদের উপস্থিতি ও তাদের আপেক্ষিক পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। (চিত্র নং 1)।

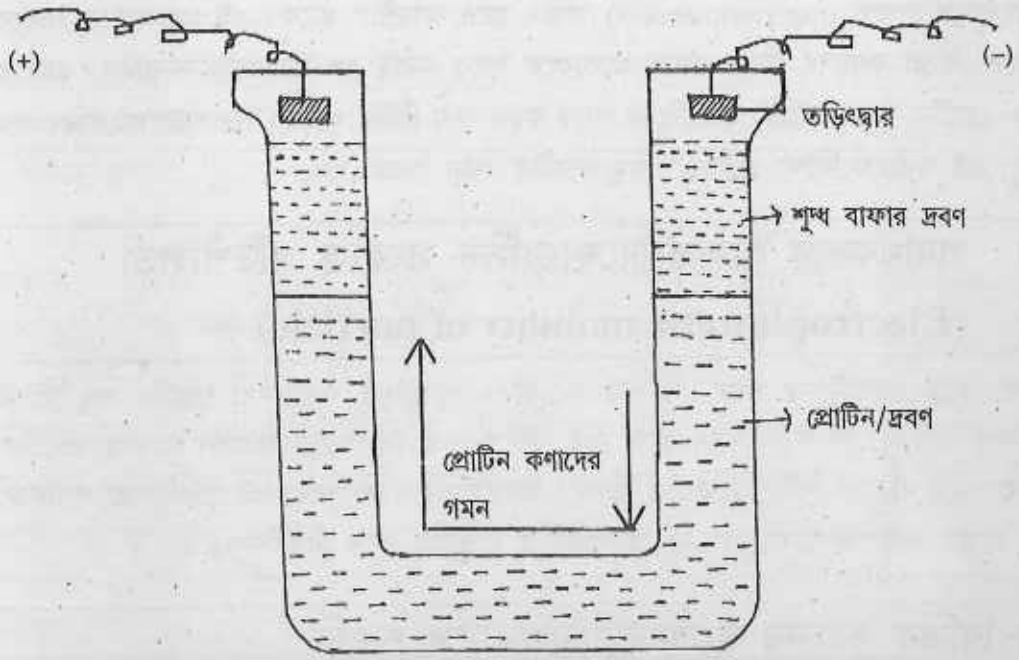

চিত্র নং 1 : ইলেকট্রোফোরেসিস (রেখিক চিত্র)

প্রয়োগ ঃ এই ধরনের ইলেকট্রোফোরেসিসের সাহায্যে রক্তের বিভিন্ন প্রোটিনদের যেমন অ্যালবুমিন (Albomin), গ্লোবিউলিন (Globulin) ইত্যাদি উপস্থিতি ও পরিমাণ জানা যায়।

(2) **জোন ইলেকট্রোফোরেসিস (Zone Electrophoresis) :** পরবর্তীকালে ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন ও উন্নতিসাধন করা হয়। জোন ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে প্রোটিন দ্রবণকে বিভিন্ন সচ্ছিদ্র ও অর্ধকঠিন মাধ্যম যেমন ফিল্টার কাগজ, পলিঅ্যাক্রালামাইডের জেল ইত্যাদি মাধ্যমে স্থাপন করার পর তড়িৎ চালনা করা হয়। ফলে দ্রবণের প্রোটিনরা, অর্ধকঠিন মাধ্যমে পৃথক এবং স্পষ্ট পট্টিরূপে সঞ্চিত হয়। এই ক্ষেত্রে খুব অল্প পরিমাণ প্রোটিন দ্রবণ থেকেই মিশ্রিত প্রোটিনদের পৃথক করা সম্ভব। জোন 'ইলেকট্রোফোরেসিস বিভিন্ন প্রকারের হয়। যেমন—

(ক) **জেল ইলেকট্রোফোরেসিস (Gel Electrophoresis) :** এই ধরনের ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে প্রোটিন দ্রবণকে অর্ধকঠিন জেলের মধ্যে স্থাপন করা হয়।

মূল কার্যপ্রণালী ঃ কাঁচনির্মিত বিভিন্ন আয়তনের দুটি পাত বা সরু নলকে খাড়াভাবে স্থাপন করে, তার মধ্যে বিভিন্ন জলীয় পলিমার জাতীয় বস্তু, যথা অ্যাগারোজ (Agarose), পলিঅ্যাক্রালামাইড (Polyacrylamide) প্রভৃতির বাফার দ্রবণকে জমান হয়। নল বা পাতের মধ্যে সাধারণত তিন

ঘনত্বের জেল জমান হয়। সবচেয়ে তলায় থাকে বেশি ঘনত্বের (7-10%) জেল যার pH-এর মান সর্বাপেক্ষা বেশি হয়। এই জেলকে রানিং জেল বলে (running gel)। মাঝখানের স্ট্যাকিং জেলের (stacking gel) ঘনত্ব অনেক কম (2.5-4%) হয় এবং pH-এর মানও রানিং জেল অপেক্ষা কম হয়। সবচেয়ে ওপরে থাকে নমুনা জেল (Sample gel) যার ঘনত্ব ও pH স্ট্যাকিং জেলের অনুরূপ হয়। ক্ষেত্রবিশেষে নমুনা জেল ও স্ট্যাকিং জেল প্রস্তুত না করে শুধুমাত্র রানিং জেল জমান হয়।

কাঁচের নল বা পাত দুটি সহ জমান জেলের দু-প্রান্তকে তারপর দুটি বাফারপূর্ণ ধারকের মধ্যে স্থাপন করা হয় (চিত্র নং 2)। সাধারণভাবে ওপরের ধারকে ক্যাথোড তড়িৎদ্বার এবং তলার ধারকের মধ্যে অ্যানোড তড়িৎদ্বার স্থাপন করে জেলের মধ্যে নির্দিষ্ট মাত্রার তড়িৎ চালনা করা হয়। তড়িৎ চালনা পূর্বে নমুনা জেলের ওপর প্রোটিন দ্রবণ ঢালা হয়। রানিং জেলের pH বেশি হওয়ায়, দ্রবণের সব প্রোটিন কণারাই ঋণাত্মক আধানযুক্ত হয় এবং তারা ক্রমশ অ্যানোড তড়িৎদ্বারের দিকে গমন করে। কয়েক ঘণ্টা তড়িৎ চালনার পর, দ্রবণের প্রোটিন কণারা তাদের আকার ও আয়তনানুসারে অ্যানোড তড়িৎদ্বারের কাছে নির্দিষ্ট পট্টিতে সঞ্চিত হয়। ছোট কণার প্রোটিনদের গতি বেশী হওয়ায়, তা সবচেয়ে ওপরের স্তরে এবং বড় কণার প্রোটিনরা ক্রমশ তাদের আকার অনুসারেক নীচের স্তরে সঞ্চিত হয়। তড়িৎ চালনা বন্ধা করার পর, জেলস্তরটিকে অতি সাবধানে নল বা কাঁচের পাত থেকে উন্মুক্ত করে কুমাসি ব্লু (coomassie blue) নামক রঞ্জক দ্রবণে রঞ্চিত করা হয়। তারপর বিভিন্ন গাঢ়ত্বের ও বিভিন্ন আয়তনের প্রোটিন পট্টিদের পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং প্রয়োজনানুসারে তাদের বিশ্লেষণ করা হয়।

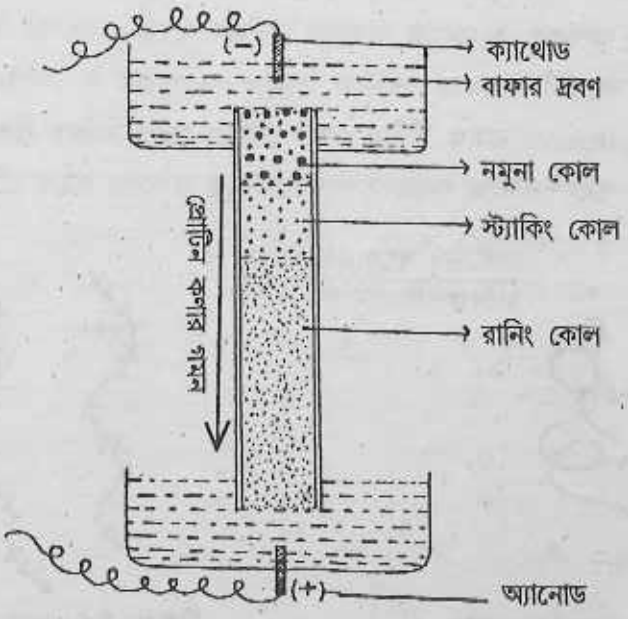

চিত্র নং 2 : জেল ইলেকট্রোফোরেসিস (রৈখিক চিত্র)

প্রয়োগ ঃ

(1) মুক্ত বা ফ্রি ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতিরক তুলনায় এই পদ্ধতিতে প্রোটিন মিশ্রণ থেকে বিভিন্ন প্রোটিনদের অনেক স্পষ্ট ও পৃথক পট্টিরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। ফলে এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত প্রোটিন কণার বিশুদ্ধতা অনেক বেশি হয়।

(2) অ্যাগারোজ নির্মিত জেলের মাধ্যমে নিউক্লীয় অম্লর মিশ্রণ থেকে বিভিন্ন আয়তনের ডি.এল.এ. অণুদের পৃথক করা যায়।

(3) জানা আণবিক ওজনের প্রোটিন কণার গতি ও আয়তনের সাথে তুলনা করে অজানা প্রোটিনের আণবিক ওজন নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

(খ) এস ডি এস পলিঅ্যাক্রালামাইড জেল ইলেকট্রোফোরেসিস **(SDS polycrylamide gel electrophoresis)** : কোনও প্রোটিনের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন পলিপেপটাইড শৃঙ্খলদের সোডিয়াম ডডিসিল সালফেট (এস ডি এস) পলিঅ্যাক্রালামাইড নির্মিত জেল ইলেকট্রোফোরেসিসের মাধ্যমে পৃথক করা হয়।

মূল কার্যপ্রণালী ঃ এস ডি এস প্রোটিন যৌ প্রস্তুতি ঃ প্রথমে পরীক্ষাধীন প্রোটিনকে একটি নির্দিষ্ট pH-এ (7.5) সোডিয়াম ডডিসিল সালফেট নামক শক্তিশালী ডিটারজেন্টের সাথে মিশ্রিত করা হয়। এস ডি এস, প্রোটিন কণার মধ্যে অবস্থিত সকল হাইড্রোজেন ও আধান-বন্ধনীদের ভেঙে পলিপেপটাইড শৃঙ্খলদের প্যাঁচ খুলে তাদের ঋজু-মুক্ত শৃঙ্খলে পরিণত করে। এই যৌগে এস ডি এস. পলিপেপটাইড যৌগ ঋণাত্মক আধানযুক্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে। এস ডি এস রাসায়নিক যৌগটি পেপটাইড শৃঙ্খলের মধ্যবর্তী সালফার বন্ধনীকে ভাঙতে না পারায় ঐ যৌগকে পুনরায় মারক্যাপটো ইথানল (mercaptoethanol) নামক দ্বিতীয় একটি যৌগের সাথে মিশ্রিত করা হয়। ফলে প্রোটিনের দ্রবণে উপস্থিত সব পলিপেপটাইড শৃঙ্খল সম্পূর্ণভাবে মুক্ত অবস্থায় থাকে (চিত্র নং 3 ক, খ)।

প্রোটিনের সাথে এস ডি এস ও মারক্যাপটোইথানলের বিক্রিয়া

চিত্র নং 3 ক : বহু পলিপেপটাইড শৃঙ্খলযুক্ত প্রোটিন

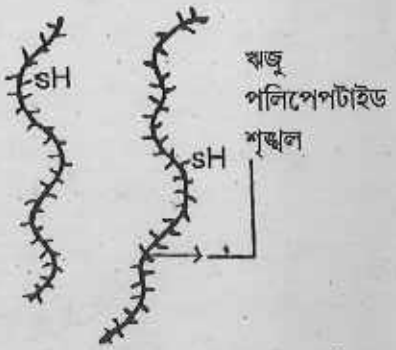

চিত্র নং 3 খ : ঋণাত্মক আধানযুক্ত এস সি এস পলিপেপটাইড যৌগ

তড়িৎ চালনা ঃ উপরিউক্তভাবে প্রস্তুত প্রোটিন যৌগকে পূর্ব থেকে জমান জেলের ওপরে স্থাপন করে, জেলের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সঠিক মাত্রার তড়িৎপ্রবাহ করা হয়। প্রোটিন দ্রবণে অবস্থিত সব পলিপেপটাইড শৃঙ্খলরা তাদের আণবিক ওজন তথা আকার অনুসারে অ্যানোড তড়িৎদ্বারের কাছে নির্দিষ্ট স্তরে সঞ্চিত হয়। তড়িৎ চালনার শেষে মুক্ত জেলস্তর বা খণ্ডকে কুমাসি ব্লু রঞ্জকে রঞ্জিত করে কোনও প্রোটিনে কি কি পলিপেপটাইড শৃঙ্খল আছে তা জানা যায় (চিত্র নং 3 গ)।

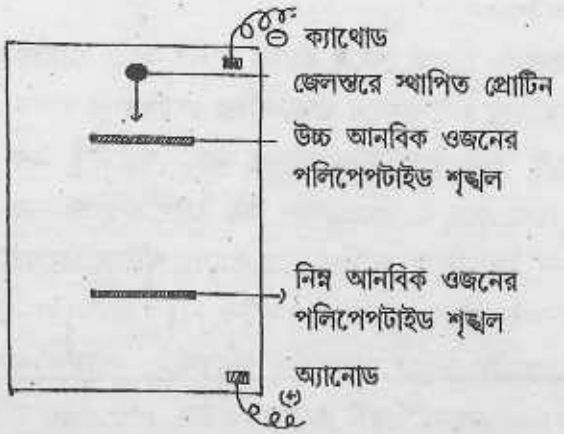

চিত্র নং 3 গ : পলিঅ্যাক্রালামাইড ইলেকট্রোফোরেসিস (রৈখিক চিত্র)

প্রয়োগ ঃ

(1) এস ডি এস জেল ইলেকট্রোফোরেসিসের সাহায্যে কোনও নির্দিষ্ট প্রোটিনে কয়টি পেপটাইড শৃঙ্খল আছে এবং তারা সম কিংবা অসম প্রকৃতির তা জানা যায়। যেমন, সাক্সিনেট ডিহাইড্রোজিনেজ নামক উৎসেচক প্রোটিনে α ও β এই দুটি পলিপেপটাইড শৃঙ্খল থাকে।

(2) প্রোটিন অণু গঠনকারী পলিপেপটাইড শৃঙ্খলদের আণবিক ওজন জানা সম্ভব হয় এই ধরনের ইলেকট্রোফোরেসিসের মাধ্যমে।

(3) **আইসোইলেক্ট্রিকফোকাসিং বা ইলেকট্রোফোকাসিং (Isoelectricfocusing or electrofocusing) :** সুইডেনে 1960 দশকে বিজ্ঞানী Svensson এবং Vesterberg এই অতি সংবেদনশীল ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতিতে প্রোটিনকণাদের আইসোইলেকট্রিক pH-এর পার্থক্যের ভিত্তিতে পরস্পর থেকে পৃথক করা হয়।

প্রয়োজনীয় বস্তু ঃ এই পদ্ধতিতে বিশেষ কিছু সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। যথা—

(1) পূর্বের নিয়মানুসারে প্রস্তুত জমানো পলিঅ্যাক্রালামাইড জেল।

(2) **অ্যাম্ফোলাইড (ampholytes) :** আম্লিক ও ক্ষারীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত বিশেষ কিছু বস্তু, যারা অম্ল ও

ক্ষার উভয়ের সাথেই বিক্রিয়া করে তাদের অ্যাম্ফোলাইড বলা হয়। যথা—ভ্যালিন, লিউসিন প্রভৃতি অ্যামাইনো অ্যাসিড।

(3) **তড়িৎদ্বারের দ্রবণ ঃ** এই ক্ষেত্রে তীব্র জৈব ক্ষার, যথা ইথানোল্যামিন (ethanolamine) ব্যবহার করা হয় ক্যাথোড নিমজ্জনের জন্য এবং অন্যদিকে তীব্র অ্যাসিড, যথা ফসফোরিক অ্যাসিডের মধ্যে অ্যানোডকে নিমজ্জিত রাখা হয়, (4) প্রোটিন দ্রবণ ও (5) নিঃসারক বাফার (eluting buffer)।

মূল কার্যগত প্রণালী ঃ এই ক্ষেত্রে কাঁচের নলের মধ্যে অ্যাম্ফোলাইড ও পরিঅ্যাক্রালামাইডের মিশ্র দ্রবণ রেখে, উক্ত নলকে উর্ধ্বভাগে ফসফোরিক অ্যাসিডপূর্ণ ধারক ও নিম্নভাগে ইথানোল্যামিনপূর্ণ ধারকের সাথে সংযুক্ত করা হয়। উর্ধ্বধারকের মধ্যে অ্যানোড এবং নিম্নধারকের মধ্যে ক্যাথোড তড়িৎদ্বার সংযোগ করে, একমুখী তড়িৎচালনা করা হয়। তড়িৎচালনার ফলে দ্রবণের অ্যাম্ফোলাইটরা পলি অ্যাক্রালামাইডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তাদের আইসোইলেকট্রিক pH অনুযায়ী জেলের মধ্যে এক একটি স্তরে অবস্থান করে। আইসোইলেকট্রিক pH বলতে pH-এর এমন একটি অবস্থা বোঝায় যে অবস্থায় সংশ্লিষ্ট প্রোটিন অণুতে সমসংখ্যক ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানযুক্ত অংশ থাকে। এই ভাবে জেলস্তরের মধ্যে pH-এর মানের একটি ক্রমোচ্চ বিস্তার (gradient) সৃষ্টি হয়। যেখানে অ্যানোড থেকে ক্রমশ ক্যাথোডের দিকে pH-এর মান বেশি থাকে। এই অবস্থায় তড়িৎদ্বারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ চালনা বন্ধ করা হয় এবং জেলস্তরের মাঝামাঝি স্থানে একটি ছিদ্র তৈরি করে তার মধ্যে পরীক্ষাধীন প্রোটিন দ্রবণ ঢালা হয়। তারপর তড়িৎদ্বার দুটির মধ্যে পুনরায় তড়িৎপ্রবাহ করাক হয় (চিত্র নং 4)।

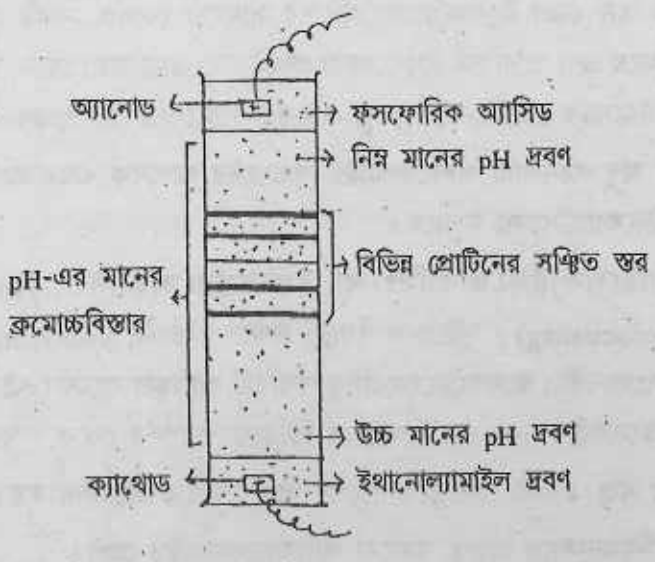

চিত্র নং 4 : আইসোইলেকট্রিফোকাসিং পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রোটিন কণার পৃথকীকরণ

তড়িৎ চালনার ফলে বিভিন্ন প্রোটিনকণারা, তাদের সমগ্র আধান ও আণবিক ওজনের ভিত্তিতে, তড়িৎদ্বার দুটির দিকে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে গমন করতে শুরু করে, প্রবাহমান প্রোটিন কণার pH জেলের মধ্যে অবস্থিত pH-এর ক্রমোচ্চ বিস্তারের যে মানের সাথে সমতুল্য হয়, সেই স্থানে সংশ্লিষ্ট প্রোটিনকণা স্থির ভাবে আবদ্ধ হয়ে যায়। এইভাবে প্রোটিন কণাদের pH-এর মানানুসারে তারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জেলের মধ্যে সঞ্চিত হয়। তারপর নিঃসারক বাফারের সাহায্যে প্রতিটি স্থান থেকে সঞ্চিত প্রোটিনদের মুক্ত করা হয় ও প্রয়োজনানুসারে তাদের কাজে লাগান হয়।

প্রয়োগ ঃ

(1) অন্যান্য ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে প্রোটিন কণাদের শুধুমাত্র আণবিক ওজনের পার্থক্যের ভিত্তিতে মিশ্রণ থেকে পৃথক করা হয়। ফলে একই আণবিক ওজনের একাধিক প্রোটিন কণা একই স্থানে পট্টি গঠন করে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, প্রোটিন কণারা তাদের আইসোইলেকট্রিক pH (P') ও আণবিক ওজন দুটি বিষয়ের পার্থক্যের ভিত্তিতে পৃথক হওয়ায় তাদের বিশুদ্ধতা অনেক বেশি হয়, যেমন মুক্ত ইলেকট্রোফোরেসিসে পদ্ধতিতে রক্তপ্লাজমা 6টি পট্টি, জেল ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে 15টি পট্টি এবং আইসোইলেকট্রিক ফোকাসিং পদ্ধতিতে 40টিরও বেশি পট্টি প্রদর্শন করে। অর্থাৎ এই পদ্ধতির সাহায্যে মিশ্রিত প্রোটিনদের সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা যায়।

(2) এই পদ্ধতির সাহায্যে কোনও উৎসেচকের বিভিন্ন আইসোজাইমদের পৃথক করা যায়।

(3) বিভিন্ন প্রোটিনের আইসোইলেকট্রিক pH-এর মান জানা যায়।

উপসংহার ঃ উপরিউক্ত ইলেকট্রোফোরেসিস ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রোফোরেসিসের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ধরনের প্রোটিনদের পৃথক করার পদ্ধতি আছে। যেমন ইমিউনোইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে আগার (agar) নির্মিত জেলস্তরের মধ্যে প্রথমে মিশ্র অ্যান্টিজেন প্রোটিন দ্রবণে তড়িৎচালনা করা হয়। তারপর জেলস্তরের নির্দিষ্ট স্থানে অ্যান্টিবডি দ্রবণ পূর্ণ করে, পুনরায় তড়িৎ প্রবাহ ঘটালে, নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন ও তার অ্যান্টিবডি পরস্পর বিক্রিয়া করে পৃথক পৃথক অঞ্চলে সঞ্চিত হয়ে বাঁকা রেখা সৃষ্টি করে। মিশ্রণে যত ধরনের অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি থাকে তত সংখ্যক বাঁকা রেখা সৃষ্টি হয়। এই পদ্ধতির সাহায্যে নির্দিষ্ট রোগ সৃষ্টিকারী অ্যান্টিজেনের শনাক্তকরণ করা যায়।

6.5 ক্রোমাটোগ্রাফির (Chromatography) সংজ্ঞা

বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণ থেকে পদার্থের পৃথক করার একটি বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি হল ক্রোমাটোগ্রাফি। এই পদ্ধতিতে পদার্থদের, একটি স্থির দশা (Stationary phase) এবং গতিশীল দশার (mobile phase) প্রতি আপেক্ষিক প্রবণতার (relative affinity) পার্থক্যের ভিত্তিতে প্রধানত পৃথক করা হয়।

মিশ্রণকে যে তরল বা গ্যাসীয় মাধ্যমে নেওয়া হয়, তাকে গতিশীল দশা বলা হয়। এই দশাটিকে অন্যকোনও তরল বা কঠিন বস্তু, যা স্থিরদশা নামে পরিচিত, তার মধ্য দিয়ে ক্রমাগত চালনা করা হয়।

6.6 সাধারণ নীতি

(1) ক্রোমাটোগ্রাফি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া (dynamic process) যেখানে একটি গতিশীল দশা একনাগাড়ে একটি স্থির দশার নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রবাহিত হয়।

(2) গতিশীল দশায় বর্তমান বিভিন্ন পদার্থরা/কণারা, স্থির দশার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন গতিতে প্রবাহিত হওয়ায়, পরস্পর থেকে পৃথক হতে পারে।

(3) স্থির দশার মধ্য দিয়ে প্রবাহ, প্রবাহিত কণাদের সাথে স্থিরদশা প্রস্তুতকারক পদার্থের সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল।

6.7 ক্রোমাটোগ্রাফির প্রকারভেদ

মূলত ক্রোমাটোগ্রাফি দু-ধরনের হয়, যথা—

(1) **পার্টিশন্ ক্রোমাটোগ্রাফি (Partition Chromatography) :** এই ক্ষেত্রে গতিশীল দশায় উপস্থিত বিভিন্ন পদার্থকণারা গতিশীল ও স্থির দশার মধ্যে তাদের পার্টিশন্ কো-এফিশিয়েন্ট (partition co-efficient) বা বিস্তার অনুপাতের ভিত্তিতে পৃথকীকৃত হয়। এই ক্রোমাটোগ্রাফি বিভিন্ন ধরনের হয়।

(2) **অ্যাড্সরপ্শন ক্রোমাটোগ্রাফি (Adsorption Chromatography) :** এই ক্ষেত্রে গতিশীল দশায় অবস্থিত বস্তুরা যে হারে কঠিনবস্তু নির্মিত স্থিরদশার মধ্যে শোষিত হয়, তার ভিত্তিতে পৃথকীকৃত হয়। এছাড়াও অপর দুই প্রকারের ক্রোমাটোগ্রাফি হল—

(3) **আয়ন বিনিময় ক্রোমাটোগ্রাফি (Ion exchange Chromatography) :** এই ক্ষেত্রে স্থিরদশার বস্তুর মুক্ততলের আয়নের সাথে গতিশীল দশার বস্তুদের আয়নের বিক্রিয়ার ভিত্তিতে পদার্থকণাদের পৃথক করা হয়।

(4) **মলিকুলার সিভ্ ক্রোমাটোগ্রাফি (Molecular sieve Chromatography) :** এই ক্ষেত্রে স্থিরদশা প্রস্তুতকারক পদার্থ কণার ভিতর দিয়ে গতিশীল দশার বস্তুদের পরিশ্রুত হবার হার তথা গতিশীল বস্তুদের আয়তনের ভিত্তিতে তাদের পৃথক করা হয়।

উপরিউক্ত প্রকারভেদ ছাড়াও ক্রোমাটোগ্রাফিকে গতিশীল ও স্থির দশায় ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তুর ভিত্তিতে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়।

6.8 পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি (Paper Chromatography)

এই সরল প্রকৃতির পদ্ধতিটি, প্রকৃতপক্ষে পার্টিশন্ ক্রোমাটোগ্রাফির একটি প্রকারভেদ।

মূল কার্যপ্রণালী ঃ এই ক্ষেত্রে সেলুলোজ অ্যাসিসেট কাগজ বা ফিল্টার (filter) কাগজকে স্থিরদশা বস্তুরূপে ব্যবহার করা হয়। প্রথমে ফিল্টার কাগজের ওপর ক্ষুদ্রাকৃতির চিহ্নিতস্থানে মিশ্রিত দ্রবণকে (পরীক্ষাধীন) স্থাপন করা হয়। তারপর একটি কাঁচনির্মিত, ঢাকনাযুক্ত ধারক পাত্রে রাখা দ্রাবক তরলের মধ্যে (যা গতিশীল দশারূপে কাজ করে) উক্ত কাগজটি এমনভাবে স্থাপন করা হয়, যাতে কাগজের তলার প্রান্ত দ্রাবক তরলে নিমজ্জিত থাকলেও চিহ্নিত স্থানটি যেন তরলের ওপরে থাকে। সচরাচর, গতিশীল দশারূপে বিউটানল, অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও জলের মিশ্রণকে ব্যবহার হয়।

এই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকার পর দেখা যায় যে গতিশীল তরলটি, কৈশিক বলের (capillary action) সাহায্যে ক্রমশ ফিল্টার কাগজের ওপরদিকে গমন করে। কাগজের ওপর প্রান্তে তরল পৌঁছাবার পূর্বেই কাগজটিকে তরল থেকে নির্গত করে শুষ্ক করা হয়। এই অবস্থায় কাগজটি 'ক্রোমোটোগ্রাম' নামে অভিহিত হয়। দ্রাবক তরলের চলাচলের সাথে, চিহ্নিত স্থানে অবস্থিত পদার্থমিশ্রণের বস্তুরাও ফিল্টার কাগজের মধ্যে চলাচল করে। কিন্তু বিভিন্ন পদার্থের বিস্তার হারে পার্থক্য থাকায়, তারা ফিল্টার কাগজের গায়ে বিভিন্ন স্থানে স্থির হয়। ফিল্টার কাগজের গায়ে বিভিন্ন চিহ্ন দেখে দ্রবণের মিশ্রিত পদার্থদের সংখ্যা নির্ণয় করা যায় (চিত্র নং 5)। এছাড়া ক্রোমাটোগ্রাফকে নির্দিষ্ট রঞ্জকে রঞ্জিত করার পর অদৃশ্য সঞ্চিত বস্তুদের শনাক্ত করা হয়। যেমন 105° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় 0.2-0.3% নিন্‌হাইড্রিন দ্রবণে অ্যামাইনো অ্যাসিডের চিহ্নযুক্ত ক্রোমাটোগ্রামকে রঞ্জিত করলে রঙিন চিহ্ন দেখা যায়।

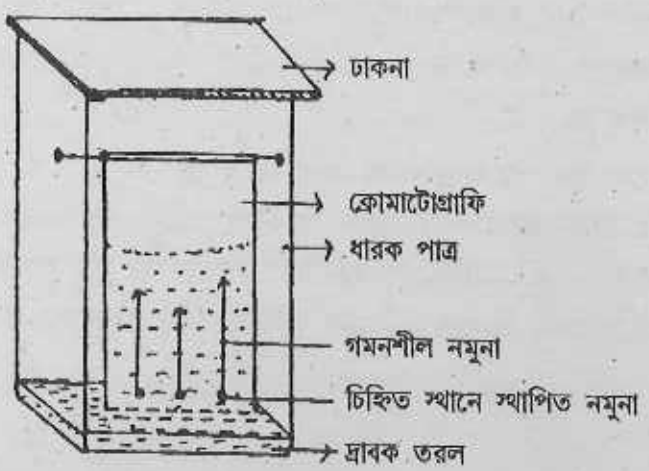

চিত্র নং 5 : পেপার ক্রোমাটোগ্রাফি

প্রয়োগ ঃ

(1) এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন আমাইনো অ্যাসিডের মিশ্রণ থেকে তাদের পৃথক করা হয়।

(2) বিভিন্ন ধাতব আয়নের মিশ্রণ থেকে পরস্পরকে পৃথক করা হয়।

(3) বিভিন্ন শর্করার মিশ্রণ যথা, গ্লুকোজ, জাইলোজ এবং ল্যাকটোজকে পৃথক করা যায়।

(4) লিপিডরে মিশ্রণ থেকে পরস্পরকে পৃথক করা যায়।

6.9 থিনলেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি (Thin layer Chromatography)

এই পদ্ধতিটিও পেপার ক্রোমেটোগ্রাফারী মতো একটি পার্টিশন্ ক্রোমাটোগ্রাফি। তবে এই ক্ষেত্রে কাগজের পরিবর্তে কিছু নিষ্ক্রিয় বস্তুর সূক্ষ্ম কণার দ্রবণকে, কাঁচ বা প্লাস্টিক পাতের ওপর অতি পাতলা স্তরে জমান হয়, যা কঠিন দশা বা স্থির দশা হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

মূল কার্যপ্রণালী ঃ খুব অল্প পরিমাণ জলের মধ্যে সিলিকা জেল বা অ্যালুমিনা বা সেলুলোজ প্রভৃতির সূক্ষ্ম গুঁড়োর মিশ্রণ তৈরি করার পরে, কাঁচ বা প্লাসটিক পাতের ওপর সাথে সাথে ঐ মিশ্রণকে অতি পাতলা স্তরে ঢালা হয় ও জমানো হয়। এইভাবে জমে যাওয়া স্তরকে অবশেষে 105° থেকে 120° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় শুষ্ক ও সক্রিয় করে ঘরের তাপমাত্রায় আনা হয়। এই কঠিন দশার স্তরের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র করে তার মধ্যে পরীক্ষাধীন নমুনার দ্রবণকে ঢালা হয় ও শুষ্ক করা হয়, পাতটিকে তারপর বন্ধ ধারকে রাখা দ্রাবক মিশ্রণে খাড়াভাবে এমন ভাবে স্থাপন করা হয় যেন পরীক্ষাধীন দ্রবণপূর্ণ ছিদ্রটি দ্রাবকের ওপরে থাকে। দ্রাবক হিসেবে প্রধানত আইসোপ্রোপানল, জল ও ইথাইল অ্যাসিটেটের মিশ্রণ বা বিউটানল, জল ও আর্সেটিক অ্যাসিডের মিশ্রণ ব্যবহৃত হয়। দ্রাবক দ্রবণটি কৈশিক বলের জন্য স্থিরদশার পাতলা স্তর বেয়ে ওপরে ওঠে, তার সাথে দ্রবণের মিশ্রণে অবস্থিত একাধিক পদার্থ কণারাও চলাচল করে ও বিভিন্ন স্থানে তাদের বিস্তার হারের পার্থক্যের ভিত্তিতে সঞ্চিত হয়।

নির্দিষ্ট সময় পর পাতটিকে বাইরে আনা হয় ও শুষ্ক করা হয়। পাতে অবস্থিত বিভিন্ন পদার্থকণার অবস্থিতি আয়োডিন বাষ্প বা প্রতিপ্রভ রঞ্জক বা ক্রোমিক সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণ প্রভৃতির সাথে রঞ্জিত করা যায় ও পর্যবেক্ষণ করা যায়। পর্যবেক্ষণের পর আকাঙ্ক্ষিত বস্তুদের স্থিরদশার বস্তু সমেত সংগ্রহ করা হয় ও পরে নিঃসারক বাফারের সাহায্যে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় পদার্থকে সংগ্রহ করা হয়।

প্রয়োগ ঃ

(1) এই পদ্ধতিতে খুব অল্প সময়ে এবং অতি বিশুদ্ধভাবে লিপিড, শর্করা, অ্যামাইনো অ্যাসিড, নিউক্লীয়টাইড প্রভৃতিদের মিশ্র দ্রবণ থেকে প্রতিটি বস্তুকে পরস্পর পৃথক করা সম্ভব।

(2) পেপার ক্রোমোটোগ্রাফি অপেক্ষা এই পদ্ধতিতে প্রস্তুত ক্রোমোটোপ্লেটকে (পাতের ওপর জমানো স্থিরদশার পাতলাস্তর) বহুদিন অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়।

(3) এই পদ্ধতি চালনার ব্যয় খুবই সামান্য।

6.10 মলিকুলার সিভ ক্রোমাটোগ্রাফি (Molecular Seive Chromatography)

এই পদ্ধতিতে মিশ্রিত বস্তুকণাদের আপেক্ষিক আয়তন ও ওজনের ভিত্তিতে পরস্পর থেকে পৃথক করা হয়। এই পদ্ধতিটি জেল-ফিলট্রেশন (gel-filtration) নামে পরিচিত।

মূল কার্যপ্রণালী : প্রথমে কাঁচের নলের মধ্যে পলিঅ্যাক্রালামাইড বা অ্যাগারোজ বা ডেক্সট্রান জাতীয় কোনও নিষ্ক্রিয় বস্তুর জলীয় পলিমার দানার সাথে অদ্রবণীয় বাফারের মিশ্রণ ধীরে ধীরে ঢালা হয়। এই মিশ্রণটি স্থিরভাবে নলের মধ্যে অবস্থান করার পর, মিশ্রণের ওপর পরীক্ষাধীন বস্তুর (প্রধানত প্রোটিন মিশ্রণ) মিশ্রণকে ঢালা হয়। মিশ্রণের মধ্যে বর্তমান অপেক্ষাকৃত বড় আকৃতির প্রোটিন কণারা সহজেই নিষ্ক্রিয় দানাদের মধ্যবর্তী স্থানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নলের তলার ছিদ্রপথে বাইরে বেরিয়ে আসে। অপরদিকে, ক্ষুদ্রাকৃতির প্রোটিন কণারা নিষ্ক্রিয় দানার অন্তর্বর্তী স্থানে প্রবেশ করায় (চিত্র নং 6) তাদের গতিবেগ বাধাপ্রাপ্ত হয় ও তারা তাদের আয়তনানুসারে ধীরে ধীরে নল থেকে নির্গত হয়। নলের তলায় সংযুক্ত স্টপককের সাহায্যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নিষ্ক্রান্ত প্রোটিন দ্রবণের নমুনাকে সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত নমুনাদের তারপর বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে জানা যায় যে কোন নমুনাতে কি জাতীয় এবং কত পরিমাণে প্রোটিন উপস্থিত আছে।

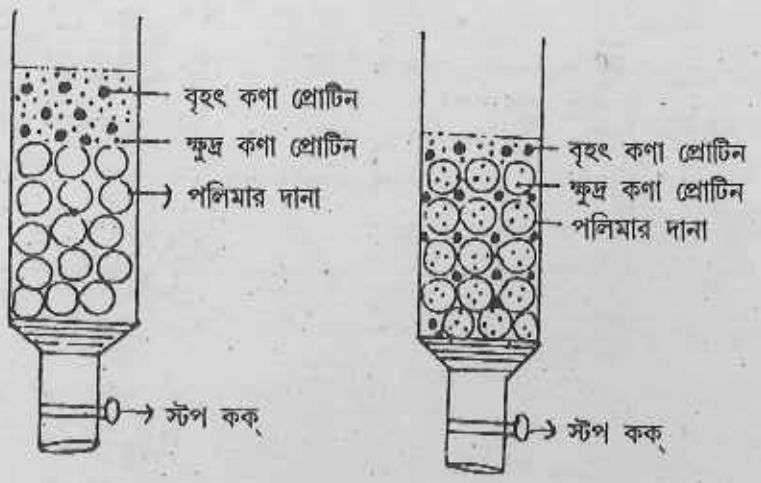

চিত্র নং 6 : মলিকুলার সিভ ক্রোমোটোগ্রাফি

প্রয়োগ ঃ এই পদ্ধতিতে প্রোটিন মিশ্রণ, নিউক্লীয় অম্লের মিশ্রণ, বহুশর্করার মিশ্রণ, লিপিড, রাইবোজোম, ভাইরাস ইত্যাদিদের মিশ্রণ থেকে প্রতিটি বস্তুকে পরস্পর পৃথক করা হয়।

6.11 আয়ন বিনিময় ক্রোমাটোগ্রাফি (Ion exchange chromatography)

এই পদ্ধতিতে প্রোটিন বা অন্যান্য বৃহদাকৃতির কণাদের আধানের পার্থক্যের ভিত্তিতে পরস্পরকে পৃথক করা হয়।

মূল কার্যনীতি ঃ নিষ্ক্রিয় বস্তুর দানার সাথে রাসায়নিকভাবে সংযুক্ত আয়নিত যৌগ বাফারের মিশ্রণকে প্রথমে কাঁচনির্মিত নলের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চিত করা হয়। তারপর বাফারদ্রবণে অবস্থিত পরীক্ষাধীন প্রোটিন নমুনাকে সঞ্চিত যৌগের ওপর ঢালা হয়। শনাক্তকারী প্রোটিনের আধানানুসারে সঞ্চিত বস্তুর প্রকৃতি নির্বাচন করা হয়। যেমন ঋণাত্মক আধানযুক্ত প্রোটিন পৃথকীকরণের জন্য কাঁচের নলে ডি ই এই সেলুলোজ জাতীয় বস্তুর দ্রবণ (pH 7.0) সঞ্চিত করা হয়। এই ক্ষেত্রে ঋণাত্মক প্রোটিন কণারা ধনাত্মক আধান বহনকারী ডিই এই সেলুলোজ দানার সাথে আবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু দ্রবণে উপস্থিত ধনাত্মক প্রোটিন কণারা বিকর্ষিত হয়ে নলের তলায় নিক্ষিপ্ত হয়। তারপর আবদ্ধ প্রোটিন কণাদের, pH-এর ক্রমোচ্চ মান অনুসারে প্রস্তুত দ্রবণ বা ঘনলবণ দ্রবণের সাহায্যে সেলুলোজ দানা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং আধানের পরিমাণ অনুসারে প্রোটিন কণারা pH দ্রবণের এক এক অংশে প্রবেশ করে। pH দ্রবণের নমুনাদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর সংগ্রহ করা হয় ও উপস্থিত প্রোটিনদের বিচ্ছিন্নভাবে শনাক্ত করা হয় (চিত্র নং 7)।

চিত্র নং 7 : আয়ন বিনিময় ক্রোমাটোগ্রাফী

এই পদ্ধতিতে, ধনাত্মক প্রোটিন কণাদের পৃথক করার সময় নলে সঞ্চিত ঋণাত্মক সি এম সেলুলোজ দানার মধ্য দিয়ে প্রোটিন মিশ্রণকে চালনা করা হয়।

প্রয়োগ ঃ প্রোটিন মিশ্রণ বা ডি.এন.এ ও আর.এন.এ.-র মিশ্রণ থেকে মিশ্রিত পদার্থের পৃথক করার জন্য এই পদ্ধতি বিশেষভাবে কার্যকরী।

6.12 অ্যাফিনিটি ক্রোমাটোগ্রাফি (Affinity Chromatography)

এই ক্রোমাটোগ্রাফি পদ্ধতিতে পরীক্ষাধীন মিশ্রণে অবস্থিত পদার্থের নির্দিষ্ট কোনও বস্তুর প্রতি আসক্তির পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর পৃথক করা হয়।

মূল কার্যপ্রণালী ঃ এই ক্ষেত্রে প্রথমে নলের মধ্যে নির্দিষ্ট বাফারের মধ্যে অ্যাগারোজ বা ডেক্সট্রান বা সেলুলোজ জাতীয় নিষ্ক্রিয় বস্তুর জলীয় পলিমার মিশ্রিত করা হয়। নিষ্ক্রিয় বস্তুর সাথে পরীক্ষাধীন বস্তুর তীব্র আসক্তি আছে এমন কোনও বস্তু বা লাইগ্যান্ড (ligand) কে সংযুক্ত করা হয়। সংযুক্ত লাইগ্যান্ডকে নলে সঞ্চিত করার পর পরীক্ষাধীন নমুনার মিশ্রণকে তার ওপর ঢালা হয়। নমুনাতে উপস্থিত বস্তু লাইগ্যান্ডের সাথে আবদ্ধ হয়, বাকী আসক্তি না থাকায় নলের বাইরে নির্গত হয়। তারপর প্রথম বাফারের থেকে পরিবর্তিত pH যুক্ত বাফারের সাহায্যে লাইগ্যান্ডে আবদ্ধ আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পৃথক করা হয়।

আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে তার লাইগ্যান্ড নির্বাচন করা হয়। যেমন কোনও অ্যান্টিজেনের ক্ষেত্রে তার অ্যান্টিবডিকে, এনজাইমের ক্ষেত্রে তার সাবস্ট্রেটকে লাইগ্যান্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

প্রয়োগ ঃ এই পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন এনজাইমের (Engyme) মিশ্র দ্রবণ বা অ্যান্টিজেন প্রোটিনের মিশ্র দ্রবণ থেকে প্রত্যেককে বিশুদ্ধভাবে পৃথক করা সম্ভব হয়।

6.13 হাই-পারফরম্যান্স লিকুইড ক্রোমাটোগ্রাফি

উপরিউক্ত গতানুগতিক ক্রোমোটোগ্রাফি পদ্ধতি ছাড়াও বর্তমানকালে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতিতে অতি অল্প সময়ে, অত্যন্ত বিশুদ্ধতার সাথে মিশ্রিত পদার্থ থেকে পদার্থকণাদের পৃথক করা সম্ভব। এরকমই একটি পদ্ধতি হল হাইপারফরম্যান্স লিকুইড ক্রোমোটোগ্রাফ (High-performance liquid Chromatography) এই ক্ষেত্রে অতি সরু (1-5 মিমি ব্যাসযুক্ত) নলের মধ্যে দৃঢ়ভাবে সূক্ষ্ম নিষ্ক্রিয় পদার্থদের সঞ্চিত করা হয়। সঞ্চিত বস্তুর মধ্যে মাইক্রোসিরিঞ্জের সাহায্যে পরীক্ষাধীন নমুনাকে প্রবেশ করিয়ে, পাম্পের সাহায্যে অতি উচ্চচাপ নমুনাকে দ্রুত হারে প্রবাহিত করা হয় ও নির্গত নমুনাকে যন্ত্রের সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়। উচ্চচাপে প্রয়োগের জন্য এই ক্ষেত্রে ইস্পাতনির্মিত নল ব্যবহার করা

হয়। সাধারণ ক্রোমোটোগ্রাফির ক্ষেত্রে এক নল আয়তনের (আনুমানিক 10 সেমি × 5 মিমি) দ্রবণ নির্গমনের জন্য 1 ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হলে, এই ক্ষেত্রে সম আয়তন তরল নির্গমনের জন্য মাত্র 1 মিনিট সময় প্রয়োজন হয়। উচ্চগতিতে প্রবাহিত করার জন্য প্রবাহমান দ্রবণ থেকে পদার্থরা দ্রুতভাবে এবং বিশুদ্ধভাবে পৃথকীকৃত হয়। বর্তমান কালে এই পদ্ধতিটি ব্যাপকভাবে, প্রোটিন মিশ্রণ বা ক্ষুদ্রায়তনের মিশ্রণ থেকে মিশ্রিত বস্তুদের পৃথক করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

6.14 অনুশীলনী

1. ছোট প্রশ্ন ঃ শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) আধানযুক্ত কণার ইলেকট্রোফোকারেসিস সংক্রান্ত গতিশীলতাকে _____ হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

(খ) মুভিং বাউন্ডারী ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতির ক্ষেত্রে 'U' টিউবের দুই বাহুতে প্রোটিন দ্রবণের ওপর _____ দ্রবণ ঢালা হয়।

(গ) এস ডি এস জেল ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতির সাহায্যে কোনও প্রোটিনে উপস্থিত _____ এর সংখ্যা জানা যায়।

(ঘ) অ্যাম্ফোলাইট জাতীয় পদার্থে _____ ও _____ উভয় বৈশিষ্ট্যই থাকে।

(ঙ) ইলেকট্রোফোকাসিং পদ্ধতিতে প্রোটিনদের _____ ও _____ এর ভিত্তিতে পৃথক করা হয়।

(চ) ক্রোমাটোগ্রাফি একটি _____ প্রক্রিয়া।

(ছ) পার্টিশন ক্রোমাটোগ্রাফি প্রক্রিয়ায় পদার্থদের _____ এর ভিত্তিতে পৃথক করা হয়।

(জ) থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি একটি _____ ধরনের ক্রোমাটোগ্রাফি।

(ঝ) মলিকুলার সিভ ক্রোমাটোগ্রাফি পদ্ধতিতে মিশ্রিত বস্তুকণাদের _____ ও _____ এর ভিত্তিতে পরস্পর পৃথক করা হয়।

(ঞ) ধনাত্মক প্রোটিন কণাদের পৃথক করার জন্য আয়নবিনিময় ক্রোমাটোগ্রাফির নলে _____ এর দানা ব্যবহার করা হয়।

(ট) অ্যান্টিজেন জাতীয় প্রোটিনদের সাধারণত _____ ক্রোমাটোগ্রাফির সাহায্যে পৃথক করা হয়।

2. মাঝারি প্রশ্ন ঃ

(ক) ক্রোমাটোগ্রাফি পদ্ধতিতে পদার্থমিশ্রণ থেকে কিসের ভিত্তিতে পদার্থদের পৃথক করা হয়? ক্রোমাটোগ্রাফি পদ্ধতির নীতি কি?

(খ) থিন লেয়ার ক্রোমাটোগ্রাফি পদ্ধতির মূলকার্যপ্রণালী লিখুন।

(গ) এস. ডি. এস জেল ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে কিভাবে প্রোটিনদের পৃথক করা হয়?

(ঘ) ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ করুন।

(ঙ) কিভাবে নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনকে ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতির মাধ্যমে শনাক্ত করা যায়?

(চ) ঋণাত্মক আধান বহনকারী প্রোটিন কণাকে পৃথক করার ক্রোমাটোগ্রাফি পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

(ছ) কিভাবে অতি অল্প সময়ে মিশ্রণ থেকে মিশ্রিত পদার্থদের পৃথক করা যাবে?

3. বড় প্রশ্ন ঃ

(ক) মলিকুলার সিভ ক্রোমাটোগ্রাফি কাকে বলে? এই পদ্ধতির সাহায্যে পদার্থদের পৃথকীকরণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

(খ) জেল ইলেকট্রোফোরেসিস কাকে বলে? যে কোনও একটি জেল ইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতির কার্যপ্রণালী ও প্রয়োগ লিখুন।

(গ) আইসোইলেকট্রিক pH কাকে বলে? প্রোটিন কণার এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে কি পদ্ধতিতে, মিশ্রণ থেকে প্রোটিনদের পৃথক করা যায়?

(ঘ) 'ক্রোমাটোগ্রাম' কাকে বলে? কোন প্রকার ক্রোমাটোগ্রাফিতে এবং কিভাবে এবং ক্রোমাটোগ্রামের সাহায্যে জৈব অণুর পৃথকীকরণ করা হয়?

6.15 উত্তরাবলী

1) (ক) সেমি^{2} সেকেন্ড$^{-1}$ ভোল্ট$^{-1}$; (খ) শুদ্ধ বাফার দ্রবণ ; (গ) পলিপেপটাইড শৃঙ্খলের ; (ঘ) অম্ল ও ক্ষারীয় ; (ঙ) আইসোইলেকট্রিক pH ও আণবিক ওজন ; (চ) গতিশীল ; (ছ) পার্টিশন কো-এফিসিয়েন্ট ; (জ) পার্টিশন ক্রোমোটোগ্রাফি ; (ঝ) আপেক্ষিক আয়তন ও ওজন ; (ঞ) সি এম সেলুলোজ দানা ; (ট) অ্যাফিনিটি।

2) (ক) অনুচ্ছেদ 6.5 ও 6.6 দেখুন ; (খ) 6.9 দ্রষ্টব্য ; (গ) অনুচ্ছেদ 6.4-এর 2, খ দ্রষ্টব্য ; (ঘ) 6.4 অনুচ্ছেদের 2 (ক) ও (খ) এর শেষাংশ এবং 3-এর শেষাংশ দ্রষ্টব্য। (ঙ)

ইমিউনোইলেকট্রোফোরেসিস পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনকে পৃথক করা যায়। উপসংহার অংশ দ্রষ্টব্য। (চ) 6.11 অনুচ্ছেদ দেখুন, এই ক্ষেত্র ক্রোমোটোগ্রাফির নলে ডি এ ই ই সেলুলোজ জাতীয় বস্তুর দানার মধ্য দিয়ে প্রোটিন দ্রবণকে চালনা করা উচিত। (ছ) 6.13 অনুচ্ছেদ দেখুন।

3) (ক) অনুচ্ছেদ 6.1 দেখুন। (খ) অনুচ্ছেদ 6.4 এর 2 এর ক বা খ। (গ) অনুচ্ছেদ 6.4-এর 3 নং পয়েন্ট দেখুন। (ঘ) অনুচ্ছেদ 6.8 দেখুন।

একক 7 ❐ কোষ ভগ্নাংশকরণ (Cell Fractionation)

গঠন ঃ

7.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

7.2 কোষ ভগ্নাংশকরণের সংজ্ঞা

7.3 কোষ ভগ্নাংশকরণে ব্যবহৃত যন্ত্র

7.4 ডিফারেনশিয়াল সেন্ট্রিফিউগেশন

7.4.1 মূলকার্যপদ্ধতি

7.5 ডেনসিটি গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউগেশন

7.6 প্রয়োগ

7.7 অনুশীলনী

7.8 উত্তরাবলী

7.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা ঃ

জীবদেহ গঠনকারী বিভিন্ন কোষের অন্তর্গঠন ও তাদের পৃষ্ঠতলের ত্রৈমাত্রিক বর্ণনা আমরা বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সাহায্যে পেয়ে থাকি। অন্যদিকে কোষের জৈবরাসায়নিক গঠন জানা যায় ইলেকট্রোফোরেসিস ও ক্রোমোটোগ্রাফি ইত্যাদি বিশ্লেষকমূলক পদ্ধতির সাহায্যে। একক কোষের গঠন সম্পর্কে বিশদ জ্ঞানলাভের পরও প্রয়োজন হয় কোষমধ্যস্থ বিভিন্ন অঙ্গাণুদের গঠন ও কাজ সম্পর্কে জ্ঞান। জীবপদার্থবিদদের সহায়তায় আবিষ্কৃত হয়েছে অক্ষত অবস্থায় কোষের অঙ্গাণুদের বিশুদ্ধভাবে পৃথক করার পদ্ধতি, এরকম দুটি বিশেষ পদ্ধতি হল ডিফারেন্শিয়াল সেন্ট্রিফিউগেশন (Differential centrifugation) এবং ডেনসিটি গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউগেশন (Density gradient centrifugation)। এই সকল পদ্ধতির সাহায্যে কোষ ভগ্নকরণ তথা কোষীয় অঙ্গাণুদের অক্ষত ও বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রাপ্তির ফলে কোষের শ্রমবিভাগ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান পরিষ্কার হয়েছে। যেমন ক্ষরণকারী অগ্ন্যাশয় কোষের ক্ষরণকাজ প্রকৃতপক্ষে কোষের গলজি বস্তুর সাহায্যেই ঘটে কিংবা কোষের মাইটোকনড্রিয়ার মধ্যেই ঘটে কোষীয় শ্বসন প্রক্রিয়া ইত্যাদি। এইভাবে কোষের বিভিন্ন অংশের গঠন ও কাজ যেমন জানা গেছে, একই সাথে লব্ধ জ্ঞানকে জৈবপ্রযুক্তির কাজেও বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছে। ব্যাকটেরিয়া কোষ থেকে প্লাজমিড বা ফাজকণা থেকে প্রোটিন আবরণী ইত্যাদি পৃথক করা সম্ভব হয়েছে বলেই এদের

সাহায্যে ক্লোনিং (cloning) হচ্ছে। কোষ ভগ্নকরণ এইভাবে কোষবিদ্যা, জৈবপ্রযুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা জৈবরসায়নবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে।

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধ্যায়ে আমরা জানব কিভাবে কোষ থেকে তার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন অঙ্গাণু, যেমন—নিউক্লিয়াস, মাইটোকনড্রিয়া, রাইবোজোম প্রভৃতিদের পৃথক করা হয়।

- ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষের মধ্যেও থাকে একাধিক অঙ্গাণু, সব কোষে কি একই ধরনের অঙ্গাণু আছে বা থাকলেও তাদের সংখ্যা কি সব কোষেই সমান হয়, এসব তথ্য জানা যাবে কোষ ভগ্নকরণের ফলাফল থেকে।
- শুধুমাত্র কোষের আবরণীকে বিচ্ছিন্ন করে, তার ভেতরকার সব অঙ্গাণুদের কি নীতির ভিত্তিতে পৃথক করা যেতে পারে—এই তথ্য জানানোই এই অধ্যায়ের বিশেষ উদ্দেশ্য।
- পৃথকীকৃত অঙ্গাণুদের কিভাবে কাজে লাগান হয় তাও আমরা এই অধ্যায়ে জানব।

7.2 কোষ ভগ্নাংশকরণের (Cell Fractionation) সংজ্ঞা

যে পদ্ধতিতে কোষ থাকে, কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুদের অক্ষত অবস্থায় পৃথক করা হয়, তাকে কোষ ভগ্নাংশকরণ বলা হয়, প্রধানত কোষীয় অঙ্গাণুদের আপেক্ষিক গুরুত্বের পার্থক্যের ভিত্তিতেই তাদের পরস্পর থেকে পৃথক করা হয়। সাধারণত কোষ ভগ্নাংশকরণের জন্য দুটি পদ্ধতির বহুল প্রচলন আছে। যথা—(1) ডিফারেনশিয়াল সেন্ট্রিফিউগেশন (Differential centrifugation) ও ডেনসিটি গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউগেশন (Density gradient centrifugation)।

7.3 কোষ ভগ্নাংশকরণের ব্যবহৃত যন্ত্র

কোষ ভগ্নাংশকরণের জন্য কোষীয় দ্রবণকে নির্দিষ্ট গতিতে কেন্দ্রাতিগ ক্ষেত্রে ঘোরান হয়। যে যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন গতিসম্পন্ন কেন্দ্রাতিগ ক্ষেত্র সৃষ্টি করা হয় তাকে সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্র (Centrifuge) বলে। এই যন্ত্রের মধ্যে স্থাপিত যে নলের মধ্যে কোষীয় দ্রবণকে রেখে ঘোরান হয়, তাদের সেন্ট্রিফিউজ নল বলা হয়। সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্র বিভিন্ন ধরনের হয় এবং বিভিন্ন যন্ত্রে পৃথক পৃথক গতির ঘূর্ণন সৃষ্টি করা যায়। এই যন্ত্রের ঘূর্ণনকে rpm (revolution per minute) বা ঘূর্ণনপ্রতি মিনিট এই এককে প্রকাশ করা হয়। প্রতি মিনিটে ঘূর্ণনের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায়, ঐ ঘূর্ণায়মান ক্ষেত্রে তত বেশি কেন্দ্রাতিগ বল (centrifugal force) সৃষ্টি হয়। এই বলকে 'g' অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন 400g বলতে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির থেকে 400 গুণ বেশি বল বা শক্তি বোঝান হয়।

অত্যাধুনিক সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্র যা আলট্রাসেন্ট্রিফিউজ যন্ত্র (ultracentrifuge) নামে পরিচিত, সেই যন্ত্রের প্রতি মিনিটে 75,000 এর বেশি সংখ্যক ঘূর্ণন সৃষ্টি করা যায় এবং তার সাহায্যে প্রায় 500,000g

কেন্দ্রাতিগ বল উৎপন্ন সম্ভব। ঘূর্ণনকালে, ঘর্ষণজনিত কারণে উৎপন্ন তাপকে হ্রাস করার জন্য এই যন্ত্রের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর বহু নীচে নির্দিষ্ট করা যায়। বায়ুর ঘর্ষণ রোধ করার জন্য উচ্চগতি উৎপন্নকারী সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রের অভ্যন্তরভাগকে বায়ুশূন্য করা যায়।

7.4 ডিফারেনশিয়াল সেন্ট্রিফিউগেশন

এই ক্ষেত্রে সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রের সাহায্যে সৃষ্ট কেন্দ্রাতিগ ক্ষেত্রে সেন্ট্রিফিউজ নলের মধ্যে কোষীয় দ্রবণদের রেখে নির্দিষ্ট গতিতে ঘোরান হয়। কোষীয় কণারা তাদের চারপাশের মাধ্যম থেকে ভারী হওয়ায়, তাদের আকার আয়তন ও ওজনের ক্রমোচ্চমান অনুসারে নলের তলার দিকে এক এক গতিতে গমন করে। ভারী ও বৃহৎ অঙ্গাণুরা অল্পগতিতে ঘূর্ণায়মান থাকাকালীন নলের তলায় থিতিয়ে পড়ে কিন্তু ক্রমশ হালকা অঙ্গাণুদের থিতানোর জন্য বেশি গতির প্রয়োজন হয়। এই সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রের সাহায্যে কোষের বিভিন্ন অংশকে বিভিন্ন গতিতে ঘূর্ণনের মাধ্যমে পৃথক করা হয় বলে এই ধরনের কোষ ভগ্নাংশ করণকে ডিফারেনসিয়াল সেন্ট্রিফিউগেশন বলা হয়।

7.4.1 মূলকার্যপদ্ধতি

কার্যক্ষেত্রে বিভিন্ন ধাপে কোষ ভগ্নকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়।

(I) প্রথমে নির্দিষ্ট কলার নমুনাকে ধারালো ব্লেডের সাহায্যে ছোট ছোট খণ্ডে পরিণত করা হয়। কোনও বাফার দ্রবণের মধ্যে কলাখণ্ডদের রেখে তাদের হোমোজিনাইজ (homoginize) করা হয়, অর্থাৎ শক্ত নলের মধ্যে বাফারের মধ্যে নিমজ্জিত রেখে কলাখণ্ডদের মুষলের (pistle) সাহায্যে পিষে একটি সমসত্ত্ব মিশ্রণ তৈরি করা হয়। এই মিশ্রণকে হোমোজিনেট (homoginate) বলা হয় এবং এই পদ্ধতিতে প্রকৃতপক্ষে কোষের পর্দাকে বিচ্ছিন্ন করে কোষমধ্যবর্তী অঙ্গাণুদের বাফার দ্রবণে আনা হয়। এই পদ্ধতি ছাড়া অন্যভাবে-লঘুসারক (hypotic) দ্রবণের মধ্যে কলাখণ্ড বা কোষগুচ্ছকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থাপন করে, যান্ত্রিক আঘাতের সাহায্যেও কোষীয় পর্দা বিচ্ছিন্ন করা যায় (চিত্র নং 1 ক)

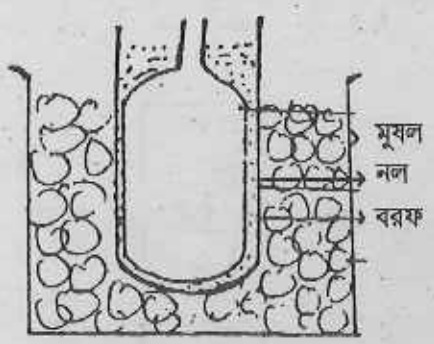

(ক) মুষলের সাহায্যে কলাকোষের পেষণ

ভগ্ন কোষ

(2) কোষীয় দ্রবণকে পরবর্তীকালে (দ্বিতীয় পর্যায়ে) সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রের নির্দিষ্ট নলের মধ্যে স্থাপন করে, প্রায় 10 – 15 মিনিটের জন্য 800g বল উৎপন্নকারী গতিতে ঘোরান হয়। ফলে নলের তলায় কোষের সবচেয়ে বড় অংশ যথা নিউক্লিয়াস ও অভগ্ন কোষেরা (যদি দ্রবণে উপস্থিত থাকে) থিতিয়ে পড়ে এবং ওপরের তরলে কোষের অন্যান্য অঙ্গাণুরা ভাসমান থাকে (চিত্র নং 1 খ)।

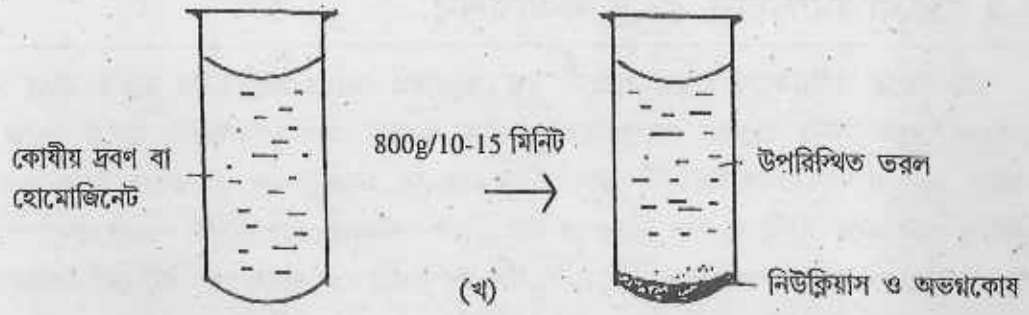

(3) তৃতীয় পর্যায়ে, দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত উপরিসিথত তরলকে প্রায় 20 মিনিটের জন্য 12,000g বল উৎপন্নকারী গতিতে ঘোরান হয়। ফলে অন্যান্য ছোট অঙ্গাণু, যেমন মাইটোকনড্রিয়া, লাইসোজোম ও মাইক্রোবডি প্রভৃতিরা নলের তলার থিতিয়ে পড়ে। (চিত্র নং 1 গ)।

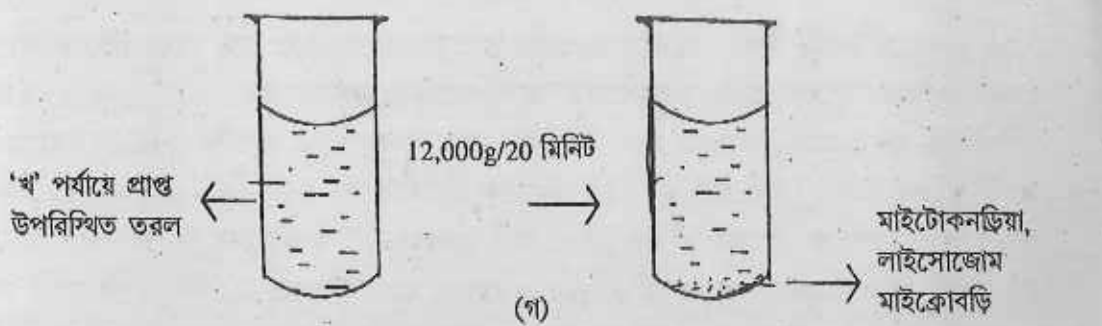

(4) চতুর্থ পর্যায়ে, তৃতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত উপরিস্থিত তরলকে 50,000g বল উৎপন্নকারী গতিতে প্রায় দুই ঘণ্টার জন্য ঘোরান হয়। এর ফলে নলের তলায় মাইক্রোজোম অর্থাৎ পর্দাবৃত অঙ্গাণুদের খণ্ডাংশ জমা হয়। (চিত্র নং 1ঘ)।

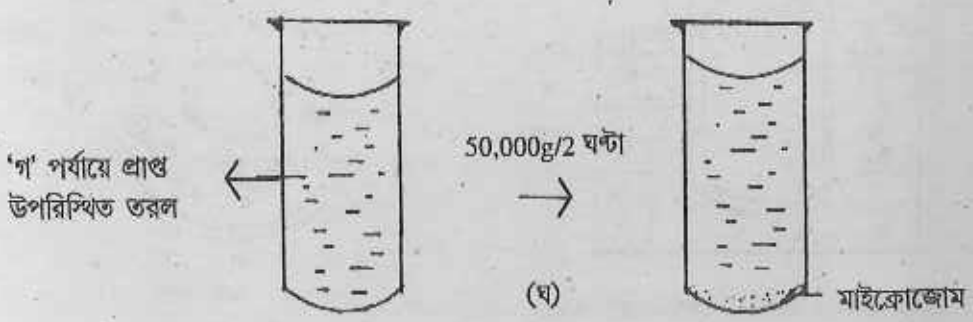

(5) ওপরের তরলকে সংগ্রহ করে শেষবারের জন্য প্রায় 300,000g বল উৎপন্নকারী গতিতে তিন ঘণ্টার জন্য ঘোরান হয়। এর ফলে নলের তলায় রাইবোজোমদের পাওয়া যায় এবং ওপরের তরলে কোষমধ্যস্থ দ্রবণীয় বস্তুরা অবস্থিত থাকে।

এইভাবে ডিফারেনশিয়াল সেন্ট্রিফিউগেশন পদ্ধতিতে গতিতে কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুদের মোটামুটিভাবে পৃথক করা হয়। (চিত্র নং 1–6)।

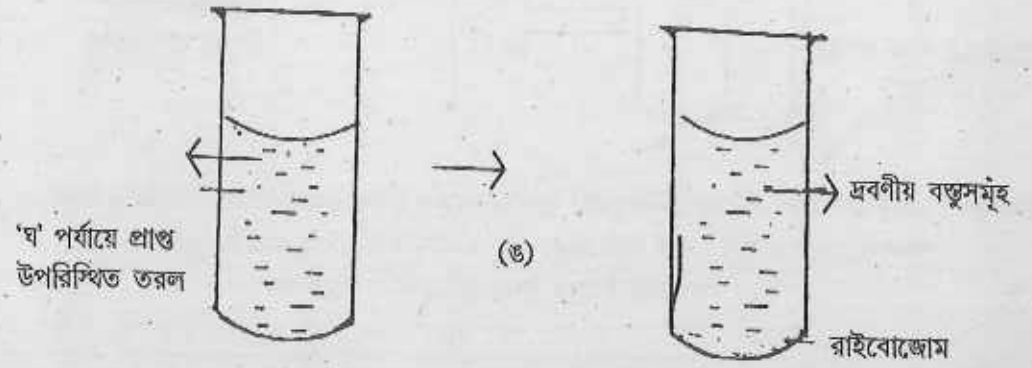

চিত্র নং 1 কলাকোষের হোমোজিনাইজেশন (পেষণ) এবং হোমোজিনেটের বিভিন্ন গতিতে সেন্ট্রিফিউগেশন

7.5 ডেনসিটি গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউগেশন

ওপরে বর্ণিত পদ্ধতির সাহায্যে প্রাপ্ত কোষীয় অঙ্গাণুদের বিশুদ্ধতা সঠিক হয় না। কেননা 12,000g উৎপন্নকারী গতিতে ঘোরানোর পর বিভিন্ন অঙ্গাণুরা একত্রে নলের তলায় থিতিয়ে পড়ে। ফলে ওপরের পদ্ধতিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন থিতানো অঙ্গানুদের সংগ্রহ করে, নির্দিষ্ট বাফার বা দ্রবণে সংরক্ষণ করে তাদের পৃথক ধরনের সেন্ট্রিফিউজ পদ্ধতিতে চালনা করা হয়। এই ধরনের সেন্ট্রিফিউজকে ডেনসিটি গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউগেশন বলা হয়। এই ক্ষেত্রে সেন্ট্রিফিউজ নলের মধ্যে বিভিন্ন পদার্থ যেমন সুক্রোজ ইত্যাদির দ্রবণকে ঘনত্বের ক্রমোচ্চ মান অনুসারে রাখা হয়, অর্থাৎ সবচেয়ে তলার সুক্রোজ দ্রবণের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি হয় এবং ক্রমশ ওপরের দিকে দ্রবণের ঘনত্ব হ্রাস পায়। এইভাবে ঘনত্বের ক্রমোচ্চ মান (gradient) তৈরি করার পর দ্রবণের ওপর কোষীয় মিশ্রিত অঙ্গাণুর দ্রবণকে স্থাপন করে নির্দিষ্ট গতিতে ঐ নলদের ঘোরান হয়। বিভিন্ন অঙ্গাণুরা তাদের ঘনত্বের মান অনুসারে তলার দিকে গমন করে কিন্তু সুক্রোজ দ্রবণের ঘনত্বের সাথে কোনও অঙ্গাণুর ঘনত্ব সমান হবার সাথে সাথেই, ঐ অঙ্গাণু সুক্রোজ দ্রবণের ঐ ঘনত্বের স্থানে সঞ্চিত হয়। এইভাবে বিভিন্ন অঙ্গাণু সুক্রোজ দ্রবণের এক এক ঘনত্ব পূর্ণস্থানে পট্টির আকারে সঞ্চিত হয়, যাদের সহজেই সম্পূর্ণভাবে এবং পৃথক ভাবে সংগ্রহ করা যায় (চিত্র নং 2)। এইভাবে কোষের নিউক্লীয় অম্লরা সিসিয়াম ক্লোরাইডের (calsium chloride) বিভিন্ন ঘনত্বপূর্ণ দ্রবণে সুস্পষ্টভাবে পৃথক হতে পারে।

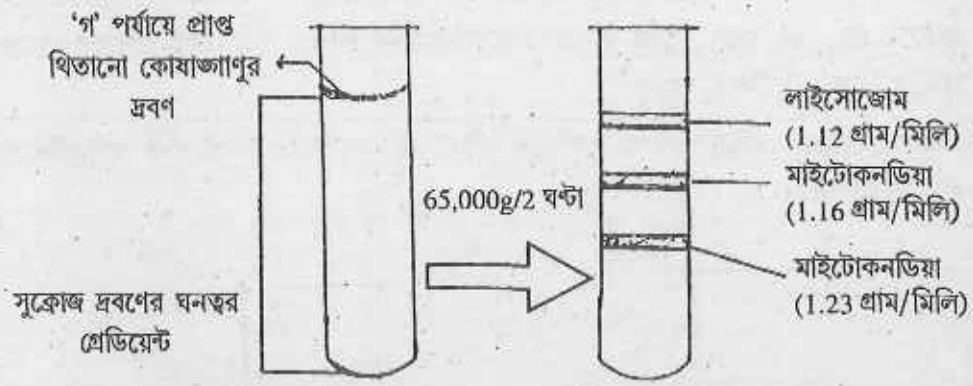

চিত্র নং 2 : ডেনসিটি গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউগেশন। সুক্রোজ দ্রবণের বিভিন্ন ঘনত্বে বিভিন্ন কোষাঙ্গাণু সক্রিয় হয়, যেমন 1.12 গ্রাম/মিলি ঘনত্বে লাইসোজোম, 1.18 গ্রাম/মিলি ঘনত্বে মাইটোকনড্রিয়া এবং 1.23 গ্রাম/মিলি সুক্রোজ দ্রবণে মাইক্রোবডি সঞ্জিত হয়।

7.6 প্রয়োগ

(1) কোষ ভগ্নাংশকরণের মাধ্যমে আমরা কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুদের পৃথক করতে পারি।

(2) বিভিন্ন অঙ্গাণুদের পৃথকীকরণ সম্ভব হয়েছে বলেই কোন্ অঙ্গাণুর কি কাজ বা তাদের সঠিক গঠন সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

(3) কোন কোষে কি কি ধরনের অঙ্গাণু উপস্থিত থাকে তা জানা যায়।

(4) বিভিন্ন ধরনের কোষ থেকে প্রাপ্ত অঙ্গাণুদের থিতানো গুণাঙ্ক একই প্রকারের কিনা বা বিভিন্ন কোষের নিউক্লীয় অম্লের আকার ও ওজন কি প্রকারের তা জানা যায়। এইভাবে জানা গেছে যে আদি নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষের রাইবোজোম 70s কিন্তু ইউক্যারিওটিক কোষের রাইবোজোম 80s প্রকৃতির হয়।

(5) কোষ অঙ্গাণুদের পৃথকীকরণের ফলে ব্যাকটেরিয়া কোষ থেকে প্লাজমিডদের সংগ্রহ করে তাদের সাহায্যে ডি. এন. এ ক্লোনিং করা হচ্ছে। এইভাবে প্লাজমিড এবং কিছু ফাজ কণার ডি. এন. একে ক্লোনিং এর বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

7.7 অনুশীলনী

1. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন (এক কথায় উত্তর দিন) ঃ

(ক) কোষ ভগ্নাংশকরণের মাধ্যমে আমরা কি পাই ?

(খ) কি কি পদ্ধতিতে কোষ ভগ্নাংশকরণ করা হয় ?

(গ) কোষ ভগ্নাংশকরণের যন্ত্রের নাম কি ?

(ঘ) কোষ ভগ্নাংশকরণের জন্য কোন্ বল কাজে লাগে ?

(ঙ) কত বলে কোষের নিউক্লিয়াস ও রাইবোজোমদের পাওয়া যায় ?

(চ) নিউক্লীয় অম্ল পৃথক করার জন্য সেন্ট্রিফিউজ নলে কি ব্যবহার করা হয় ?

2. মাঝারি প্রশ্ন ঃ

(ক) কোষ ভগ্নাংশকরণের প্রধান উদ্দেশ্য কি কি ?

(খ) কোষ ভগ্নাংশ কাকে বলে ? কোন্ মূল নীতির সাহায্যে কোষের অঙ্গাণুদের পৃথক করা হয় ?

(গ) সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্র কাকে বলে ? এই যন্ত্র কত প্রকারের হয় ?

(ঘ) কোষের পর্দাদের কিভাবে বিচ্ছিন্ন করা হয় ?

(ঙ) ডেনসিটি গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউগেশন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

(চ) কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুরা কোন্ কোন্ বলে থিতিয়ে পড়ে ?

3. বড় প্রশ্ন ঃ

(ক) কোষ ভগ্নাংশকরণের প্রয়োজনীয়তা কি কি ?

(খ) ডিফারেনশিয়াল সেন্ট্রিফিউগেশন কাকে বলে ? এই পদ্ধতির সাহায্যে কিভাবে কোষ ভগ্নাংশকরণ করা হয় ?

(গ) ডেনসিটি গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউগেশন পদ্ধতিতে কিভাবে কোষ ভগ্নাংশকরণ করা হয় ?

7.8 উত্তরাবলী

1) (ক) কোষের বিভিন্ন অঙ্গাণুদের পৃথকভাবে পাওয়া যায়।

(খ) ডিফারেনশিয়াল সেন্ট্রিফিউগেশন ও ডেনসিটি গ্রেডিয়েন্ট সেন্ট্রিফিউগেশন পদ্ধতিতে কোষ ভগ্নাংশকরণ করা হয়।

(গ) সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্র।

(ঘ) কেন্দ্রাতিগ বল

(ঙ) 800g বলে কোষের নিউক্লিয়াস 300,000g বল উৎপন্নপকারী গতিতে রাইবোজোমদের পৃথক করা হয়।

(চ) নিউক্লীয় অম্ল পৃথকীকরণের জন্য সেন্ট্রিফিউজ নলে সিসিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণের ঘনত্বের ক্রমোচ্চ মান (gradient) ব্যবহার করা হয়।

2) (ক) 7.1 অনুচ্ছেদ দেখুন।

(খ) 7.2

(গ) 7.3 এই যন্ত্র বিভিন্ন প্রকারের হয়। যে সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রে সাধারণ তাপমাত্রায় 200 থেকে 500 ঘূর্ণন সৃষ্টি করা হয় প্রতি মিনিটে তাকে টেবিল সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্র বলা হয়। যে সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রে শূন্য ডিগ্রীর নীচে প্রতি মিনিটে প্রায় 20,000 ঘূর্ণন সৃষ্টি করা হয়, তাকে কোল্ড সেন্টিফিউজ যন্ত্র বলা হয়। অন্যদিকে আলট্রা সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রে শূন্য ডিগ্রীর চেয়ে বহু কম তাপমাত্রায় প্রতি মিনিটে 80,000 থেকে 1,00,000 ঘূর্ণন সৃষ্টি করা হয়।

(ঘ) অনুচ্ছেদ 7.4.1-এর 1 নং পয়েন্ট দেখুন।

(ঙ) 7.5

(চ) নিউক্লিয়াস — 800g

মাইটোকনড্রিয়া, লাইসোজোম — 12,000g

মাইক্রোজোম — 50,000g

রাইবোজোম — 300,000 – 400,000g

3) (ক) অনুচ্ছেদ 7.1 ও 7.6 (খ) দ্রষ্টব্য

(খ) 7.4, 7.4.1 দ্রষ্টব্য

(গ) 7.5 দ্রষ্টব্য

একক 8 ❐ জৈব-পরিসংখ্যান ঃ নমুনা ও সমগ্রক (Biometry : Sample and Population)

গঠন ঃ

8.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

8.2 সমগ্রক ও নমুনা

8.3 পরিসংখ্যা নিবেশন

8.3.1 পরিসংখ্যা নিবেশন ঃ বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ

8.3.2 পরিসংখ্যা নিবেশনের সুবিধা ও অসুবিধা

8.4 লৈখিক উপায়ে রাশিতথ্যের উপস্থাপনা

8.4.1 লেখ ও চিত্রের সুবিধা-অসুবিধা

8.4.2 *x-y* লেখ

8.4.3 পাই চিত্র

8.4.4 আয়তলেখ বা হিস্টোগ্রাম

8.5 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

8.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা ঃ

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় সংখ্যাগত তথ্য (Numerical data)-এর উপর নির্ভরতা ক্রমশ বাড়ছে। প্রাণিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই কথা সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য। একটা সহজ উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। চোরাশিকারীদের দৌরাত্ম্যে বিগত কয়েক দশকে দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে বাঘের সংখ্যা ক্রমশ কমে আসে ও দেশে বিভিন্ন ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্পের সূচনা ঘটে। এই কাজে প্রথমেই বিভিন্ন বনাঞ্চলে বাঘের মোট সংখ্যা, পুরুষ ও স্ত্রী বাঘের সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানলাভে জরুরী হয়ে ওঠে। এইভাবে প্রাণিবিজ্ঞানের নানা কাজে, বিশেষত গবেষণার কাজে সংখ্যাগত তথ্যের প্রয়োজন ও ব্যবহার বাড়ছে। অতএব, বর্তমানে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার ছাত্রছাত্রীদের মতোই প্রাণিবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদেরও পরিসংখ্যান শাস্ত্র সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞানলাভ আবশ্যক হয়ে উঠছে। পরিসংখ্যান শাস্ত্রটি আদতে সংখ্যাগত তথ্যের সংকলন, শ্রেণীবিন্যাস ও বিশ্লেষণ সম্পর্কিত বিদ্যা। আলোচ্য অধ্যায়টি ছাত্রছাত্রীদের পরিসংখ্যান শাস্ত্রের সাথে প্রাথমিক পরিচয় ঘটিয়ে দিতে সাহায্য করবে। এই অধ্যায় থেকে ছাত্রছাত্রীরা জানবে—সমগ্রক ও নমুনা বলতে কি বোঝায়, সমগ্রক ও নমুনা থেকে কিভাবে

সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়, সংগৃহীত তথ্যকে কিভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা হয় ও কিভাবে সংখ্যাগত তথ্যকে লেখ (Graph) বা চিত্র (Chart)-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে।

উদ্দেশ্য ঃ

কোনও অনুসন্ধান ক্ষেত্র থেকে সেখানকার মানুষ বা প্রাণী বা উদ্ভিদ বা বস্তুগুলো থেকে নির্দিষ্ট বা আকাঙ্ক্ষিত ধরনের সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ করা, সংগৃহীত তথ্যকে সুবিন্যস্তভাবে লিপিবদ্ধ ও শ্রেণীবিভক্ত করা ও পরিশেষে, ঐ সুবিন্যস্ত ও শ্রেণীবিভক্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ করা যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্যে, তাকেই পরিসংখ্যান শাস্ত্র (Statistics) নামে আখ্যাত করা হয়েছে। পরিসংখ্যান শাস্ত্রের একটি শাখাকে জৈব-পরিসংখ্যান শাস্ত্র (Biometry) বলে। এই শাখার মূল বৈশিষ্ট্য হল এটাই যে এখানে বিভিন্ন প্রাণী ও প্রাণীদেহের জৈবিক কাজকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ করা হয় ও সেসব তথ্যের বিন্যাস, শ্রেণীবিভাগ ও বিশ্লেষণ করা হয়। সাধারণ পরিসংখ্যান শাস্ত্রের সাথে জৈব-পরিসংখ্যান শাস্ত্রের আদতে নীতিগত কোনও পার্থক্য নেই।

প্রাণিবিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে ও বিশেষত গবেষণার ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান শাস্ত্রের ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। মৎস্যবিজ্ঞানীরা জানতে চাইতে পারেন যে আমাদের দেশে মোট সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন কত, কোন্ রাজ্য থেকে সর্বাধিক সামুদ্রিক মাছ সংগৃহীত হয়, কোন্ রাজ্যে সংগ্রহের পরিমাণ কমছে ও কোন্ রাজ্যে সংগ্রহের পরিমাণ বাড়ছে ইত্যাদি। তখন তাদের পরপর কয়েক বছর বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন সমুদ্রতট থেকে সংগৃহীত সামুদ্রিক মাছের ওজন (যা কিনা আদতে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে ও সেই তথ্যকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। আবার বনবিভাগের বিজ্ঞানীরা আমাদের দেশের বাঘের সংখ্যার ক্রমিক হ্রাসবৃদ্ধি সম্পর্কে জনসাধারণকে জানাতে চাইতে পারেন। তখন তাদের পরপর কয়েক বছর বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন বনাঞ্চলে বাঘের মোট সংখ্যা, স্ত্রী ও পুরুষ বাঘের সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তারপর, একটি লেখচিত্র এঁকে তারা তাদের সংগৃহীত তথ্যকে জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত সহজবোধ্যভাবে প্রকাশ করতে পারেন। আবার, কোনও রক্তবিজ্ঞানী (Haematologist) যদি একটি সদ্য আবিষ্কৃত ওষুধের সাহায্যে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বাড়ানো যায় কিনা, সে সম্পর্কে পরীক্ষা করার কাজে লিপ্ত থাকেন, তখন তাকে একদিকে ওষুধ না খাওয়ানো কিছু ইঁদুরের রক্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ মাপতে হবে, অপরদিকে ওষুধ খাওয়ানো কিছু ইঁদুরের রক্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ মাপতে হবে। তারপর, তাকে ঐ দুই বিভাগের ইঁদুরের গড় হিমোগ্লোবিনের পরিমাণের মধ্যে কোনও পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে কিনা দেখার জন্যে পরিসংখ্যান শাস্ত্রে বর্ণিত 't-test' নামক একটি বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে বিচার করে দেখতে হবে। আবার, কোনও জনসমীক্ষক (Demographer) যদি অনুসন্ধান করে দেখতে চান যে আমাদের রাজ্যে পুরুষ ও মহিলার অনুপাত ১ ঃ ১ আছে কিনা, তখন তাকে প্রথমে রাজ্যের পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। তারপর, তাকে পুরুষ ও মহিলার গাণিতিক অনুপাত নির্ণয় করতে হবে। পরিশেষে, তাকে পরিসংখ্যান শাস্ত্রে বর্ণিত 'Chi-square test' নামক এক বিশেষ পদ্ধতিতে বিচার করে দেখতে হবে যে তার প্রাপ্ত পুরুষ ঃ স্ত্রী অনুপাতটিকে ১ ঃ ১ অনুপাত হিসাবেই স্বীকৃতি দেওয়া উচিত কিনা।

8.2 সমগ্রক ও নমুনা (Population and Sample)

পরিসংখ্যান শাস্ত্রে তথা জৈব-পরিসংখ্যান শাস্ত্রে প্রায়ই দুটো গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করা হয়। এরা হল সমগ্রক (Population) ও নমুনা (Sample)। শব্দ দুটোর সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে।

8.2.1 সমগ্রক

একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার বা তথ্য অনুসন্ধান ক্ষেত্রের একটি বিশেষ লক্ষ্যবস্তুর (যথা, সুন্দরবনে বাঘের প্রজাতি ঃ ভৌগোলিক সীমা > সুন্দরবন লক্ষ্যবস্তু > বাঘের প্রজাতি ; শ্রেণীকক্ষে ছাত্রের সংখ্যা ঃ ভৌগোলিক সীমা > শ্রেণীকক্ষ লক্ষ্যবস্তু > ছাত্রের সংখ্যা) সামগ্রিক সমষ্টিকে বলা হয় "সমগ্রক"। যেমন, সুন্দরবনের সমস্ত বাঘের সমষ্টিকে একটি সমগ্রক হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। আবার, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পাঠ্যবিষয়ের সকল ছাত্রছাত্রীর সমষ্টিকেও একটি সমগ্রক হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

পরিসংখ্যান শাস্ত্র সংক্রান্ত কাজের জন্য যদি একটি সমগ্রকের প্রতিটি একক অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তি বা প্রাণী বা উদ্ভিদ বা বস্তু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তখন ঐ তথ্য সংগ্রহের কাজকে পূর্ণ তদন্ত **(Complete enumeration)** বা সেনসাস **(Census)** বলে। যেমন, কোনও পরিসংখ্যানবিদ্ যদি নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর শরীরের ওজন মাপেন, কিংবা কোনও পরিসংখ্যানবিদ্ যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বইয়ের ক্রয়মূল্য লিপিবদ্ধ করেন, তবে এগুলো পূর্ণ তদন্তের উদাহরণ হবে। বাস্তবিক পক্ষে, একটি সমগ্রক সম্পর্কে পূর্ণ তদন্ত চালানো প্রায় অসম্ভব। এই কাজ সময় সাপেক্ষ, ব্যয় সাপেক্ষ ও জনবল নির্ভর। ফলে, তথ্য সংগ্রহের জন্য পূর্ণ তদন্তের ব্যবহার প্রায় নেই বললেই চলে। তবে, যদি একটি সমগ্রকে বিদ্যমান এককের সংখ্যা খুব কম হয়, তখন পূর্ণ তদন্তের প্রয়োগ জরুরী হয়ে পড়ে। যেমন, একটি বনাঞ্চলে সিংহের মতো একটি দুষ্প্রাপ্য প্রাণীর জলপানের গড় সময় জানার প্রয়োজন হলে বনাঞ্চলটির সকল এলাকায় অনুসন্ধান চালিয়ে বিভিন্ন সিংহ কখন জলপান করে, তা জানতে হবে। এছাড়া, কোনও সমগ্রকের কোনও বৈশিষ্ট্যের মান যথেষ্ট সূক্ষ্মতার সঙ্গে নির্ণয়ের প্রয়োজন হলেও পূর্ণ তদন্তের প্রয়োগ জরুরী হতে পারে। যেমন, কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের গড় নম্বর জানতে হলে প্রতিটি অকৃতকার্য ছাত্র বা ছাত্রীর নম্বর অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পূর্ণ তদন্তের প্রয়োগ যথার্থই অসম্ভব ও অবাস্তব হয়ে দেখা দিতে পারে। যেমন, কোনও প্রাণিবিজ্ঞানী যদি মানুষের মাথার চুলের গড় সংখ্যা নির্ণয় করতে চান, তাহলে বিভিন্ন মানুষের মাথার চুলের সংখ্যা গণনা করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

8.2.2 নমুনা

একটি সমগ্রকের কোনও একটি নির্বাচিত অংশকে নমুনা **(Sample)** বলে। যেমন, সুন্দরবনে হরিণের সংখ্যা গণনা করতে হলে সমগ্র সুন্দরবন জুড়ে গণনার কাজ চালানো সম্ভবপর নয়। তখন

হয়তো এক বর্গকিলোমিটার মাপযুক্ত পাঁচটি ছোট এলাকা বেছে নেওয়া হল ও প্রতিটি ছোট এলাকায় হরিণের সংখ্যা গুণে নেওয়া হল ও প্রতি বর্গকিলোমিটারে গড়ে কয়টি হরিণ আছে, তা হিসাব করে নেওয়া হল। এখানে প্রতিটি নির্বাচিত এলাকার সংগৃহীত তথ্য হবে সুন্দরবনের হরিণের সমষ্টিগত সমগ্রকের নমুনা।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, একটি সমগ্রক থেকে নির্বাচিত কিছু নমুনার অন্তর্ভুক্ত এককগুলোর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হলে ঐ প্রকার তথ্য সংগ্রহের কাজকে আংশিক তদন্ত বা নমুনা তদন্ত (**Partial enumeration** or **Sample survey**) বলে। এসব ক্ষেত্রে নমুনাগুলো থেকে সংগৃহীত তথ্যকেই সমগ্রকের প্রতিনিধি রূপে গণ্য করা হয় ও নমুনাগুলোর সম্পর্কে যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেগুলোই সমগ্রকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে, নমুনা তদন্তের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য কিছু বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। যত বেশি সংখ্যক নমুনা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে ও নমুনাগুলোতে অন্তর্ভুক্ত এককের সংখ্যা যত বেশি হবে, নমুনা তদন্তের গ্রহণযোগ্যতা তত বেশি হবে। এছাড়া একটি সমগ্রক থেকে নমুনা নির্বাচন করার সময় অনুসন্ধানকারী নিজের ইচ্ছামতো নির্বাচনের কাজ করবে না। এমনভাবে নমুনা নির্বাচন করতে হবে যাতে প্রতিটি নমুনাতে একটি সমগ্রকের আদর্শ চিত্র বিদ্যমান থাকে। এইভাবে নমুনা নির্বাচন করতে হবে যাতে প্রতিটি নমুনাতে একটি সমগ্রকের আদর্শ চিত্র বিদ্যমান থাকে। এইভাবে নমুনা নির্বাচনকে সমসম্ভব নমুনা চয়ন (**Random sampling**) বলা হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, একজন অনুসন্ধানকারীকে যদি পশ্চিমবাংলার পাখি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, তবে অট্টালিকাবহুল ও গাছপালাবিহীন কলকাতা শহর কখনও একটি আদর্শ নমুনা হবে না। তাকে এমন কিছু এলাকা বাছতে হবে যেখানে যথেষ্ট সংখ্যক গাছপালা আছে, আবার মোটামুটি জনবসতিও আছে এবং কিছু পুকুর-খাল-বিলও আছে। এরকম জায়গায় জঙ্গলের পাখি, লোকালয়ের পাখি (কাক-চড়ুই ইত্যাদি) ও জলচর পাখি, সবই দেখা যাবে। অনুরূপভাবে, কোনও অনুসন্ধানকারী যদি যেসব বিবাহিত মহিলা লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের উপর তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী হন, তাহলে নমুনা হিসাবে তাকে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বেছে নিতে হবে। মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট কলেজগুলোই এক্ষেত্রে আদর্শ নমুনা হবে। বালিকা বিদ্যালয়গুলো আদর্শ নমুনা হিসাবে বাছা যাবে না, কারণ সেখানে বিবাহিতা ছাত্রীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য হবে।

অনুশীলনী-১

১। জৈব-পরিসংখ্যান শাস্ত্র কাকে বলে? প্রাণিবিজ্ঞানে পরিসংখ্যান শাস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।

উঃ এই অধ্যায়ের 'প্রস্তাবনা' অংশ দেখ।

২। সমগ্রক বলতে কি বোঝায়? পূর্ণ তদন্ত কি? পূর্ণ তদন্ত বহুল প্রচলিত নয় কেন? কখন পূর্ণ তদন্ত জরুরী বলে বিবেচিত হয়?

উঃ এই অধ্যায়ের '8.2.1' অংশ দেখ।

৩। নমুনা বলতে কি বোঝায়? আংশিক তদন্ত কি? সমসম্ভব নমুনা চয়ন বলতে কি বোঝায়? পরিসংখ্যানের কাজে আদর্শ নমুনা নির্বাচনের কিছু উদাহরণ দাও।

উঃ এই অধ্যায়ের '8.2.2' অংশ দেখ।

8.3 পরিসংখ্যা নিবেশন (Frequency distribution)

পরিসংখ্যান শাস্ত্রে পরিসংখ্যা নিবেশন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়, কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার আগে আমাদের কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক। নীচে শব্দগুলো ও তাদের অর্থ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা হল।

(ক) চলক (Variable) : একটি সমগ্রক বা নমুনার অন্তর্গত এককগুলোর (ব্যক্তির বা প্রাণীর বা উদ্ভিদের বা বস্তুর) যেসব বৈশিষ্ট্যকে সংখ্যা বা রাশির দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভবপর, সে সব বৈশিষ্ট্যকে চলক বা পরিমেয় বৈশিষ্ট্য (Variable) বলে। যেমন, তকগুলো মানুষের বয়স ১০, ১২, ১৭, ২৯, ৫৭, ৭২ বছর ইত্যাদি হতে পারে ; কতকগুলো মানুষের ওজন ৩৯, ৪২, ৪৭, ৫২, ৫৭, ৬২, ৭০ কিলোগ্রাম ইত্যাদি হতে পারে ; কতগুলো মানুষের মাসিক আয় ১০০০, ১৫০০, ২০০০, ৩৩০০, ৪২০০, ৬৪০০, ৯৫০০ টাকা ইত্যাদি হতে পারে। এইভাবে মানুষের বয়স, ওজন, মাসিক আয় ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রত্যেকটি এক একটি চালক।

(খ) অপরিমেয় বৈশিষ্ট্য (Attribute) : একটি সমগ্রক বা নমুনার অন্তর্গত এককগুলোর যেসব বৈশিষ্ট্যকে সংখ্যা বা রাশির দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, শুধুই ভাষার দ্বারা বা কিছু নির্দিষ্ট শব্দের দ্বারা বর্ণনা করা যায়, সেসব বৈশিষ্ট্যকে অপরিমেয় বৈশিষ্ট্য বলে। যেমন, কতগুলো মানুষের ধর্ম যথাক্রমে হিন্দু, ইসলাম, খ্রীষ্ট ধর্ম হতে পারে ; কতগুলো মানুষের বৃত্তি যথাক্রমে ওকালতি, শিক্ষকতা, ডাক্তারী ইত্যাদি হতে পারে ; কতকগুলো মানুষের লিঙ্গ পুরুষ অথবা স্ত্রী হতে পারে। এখানে মানুষের ধর্ম, বৃত্তি, লিঙ্গ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রত্যেকটি অপরিমেয় বৈশিষ্ট্য।

(গ) চলকের প্রসার (Range) : কোনও নির্দিষ্ট চলকের বিভিন্ন মানগুলো একটি সমগ্রক বা নমুনার অন্তর্গত এককগুলো থেকে সংগ্রহ করে আনার পরে ঐ চলকের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের মধ্যবর্তী ব্যবধান বা অন্তরফলকে ঐ চলকের প্রসার (Range) বলে। যেমন, একটি গ্রামের বাসিন্দাদের মাসিক আয় সম্পর্কে তথ্য নিয়ে দেখা গেল যে তাদের মাসিক আয় ৫০, ১০০, ৫০০, ১০০০, ২০০০, ২৫০০, ৩৩০০, ৪৬০০, ৬৫০০ টাকা ইত্যাদি হতে পারে। এখানে মাসিক আয় একটি চলক ও চলকটির মান ক্ষুদ্রতম ৫০ টাকা ও বৃহত্তম ৬৫০০ টাকা হতে পারে। ফলে, মাসিক আয়ের প্রসার হল ৬৫০০ – ৫০ = ৬৪৫০ টাকা।

(ঘ) বিচ্ছিন্ন চলক (Discrete variable) : কিছু কিছু চলক এমন প্রকৃতির হয় যে তারা একটি নির্দিষ্ট সীমা বা প্রসারের মধ্যে কেবলমাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট ও বিচ্ছিন্ন মান গ্রহণ করতে সক্ষম। এই জাতীয় চলককে বিচ্ছিন্ন চলক (Discrete variable) বলে। যেমন, কিছু পরিবারের সদস্য সংখ্যা ২, ৩, ৪, ৫, ৮, ১০ জন ইত্যাদি হতে পারে, কিন্তু কখনও ২.৪ বা ৩.৬ বা ৯.৮ হতে পারে না। আবার, ফুলের পাপড়ির সংখ্যা ৪, ৫, ১০, ২০, ৫০ ইত্যাদি হতে পারে, কিন্তু কখনও ৪.৪, ৫.৭, ৯.৮, ১৯.৯ ইত্যাদি হতে পারে না। কয়েকটি ফুটবল ম্যাচে গোলের সংখ্যা ০, ১, ২, ৩, ৪, ৬ গোল ইত্যাদি হতে পারে, কিন্তু কখনও ০.৭, ১.৬, ২.৯, ৫.৪ ইত্যাদি হতে পারে না। অতএব, পরিবারের সদস্যের সংখ্যা ফুলের পাপড়িড়র সংখ্যা ও খেলায় গোলের সংখ্যা বিচ্ছিন্ন চলকের উদাহরণ।

(ঙ) অবিচ্ছিন্ন চলক **(Continuous variable)** : কিছু কিছু চলক এমন প্রকৃতির হয় যে তারা একটি নির্দিষ্ট সীমা বা প্রসারের মধ্যে যে কোনও অন্তর্বর্তী মান গ্রহণ করতে সক্ষম। এই ধরনের চলককে অবিচ্ছিন্ন চলক বলে। যেমন, একটি শ্রেণীর ছাত্রদের উচ্চতা ১২৫, ১৩৪.৬, ১৩৫, ১৩৮.১, ১৩৯, ১৩৯.৫, ১৪৭, ১৫২.৫, ১৬০ সেন্টিমিটার হতে পারে, অর্থাৎ ছাত্রদের উচ্চতা ১২৫ সেন্টিমিটার থেকে ১৬০ সেন্টিমিটারের মধ্যে যে কোনও মান গ্রহণ করতে সক্ষম। ছাত্রদের ওজনের বেলাতেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যাবে, তাদের ওজন ৪৫, ৪৫.৪, ৪৭, ৪৭.৯, ৪৯.২, ৫০, ৫৪.৭, ৫৫ কিলোগ্রাম হতে পারে বা ৪৫ থেকে ৫৫ কিলোগ্রামের মধ্যে যে কোনও মান গ্রহণে সক্ষম। অতএব, মানুষের উচ্চতা ও মানুষের ওজন অবিচ্ছিন্ন চলকের উদাহরণ। এছাড়া, মানুষের আয়, মানুষের বয়স, দিনের তাপমাত্রা, এগুলোও অবিচ্ছিন্ন চলকের উদাহরণ।

(চ) রাশিতথ্য **(Data)** : কোনও সমগ্রক বা নমুনার উপর অনুসন্ধান চালিয়ে তার অন্তর্ভুক্ত এককগুলো (ব্যক্তি বা প্রাণী বা উদ্ভিদ বা বস্তুগুলো) থেকে একটি নির্দিষ্ট চলক সংক্রান্ত যে সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তাকেই পরিসংখ্যান শাস্ত্রের ভাষায় রাশিতথ্য **(Data)** বলে। সবেমাত্র সংগ্রহ করা রাশিতথ্যে চলকের বিভিন্ন মানগুলো অনির্দিষ্টভাবে সাজানো থাকে বলে তাকে বিশৃঙ্খল রাশিতথ্য **(Raw data)** বলে। যেমন, একটি পরীক্ষাগারে কয়েকটি ইঁদুরের ওজন যথাক্রমে ২২, ১৮, ২৯, ২২, ২৮, ২২, ২৬, ২২, ৩২, ও ২৯ গ্রাম। এটি একটি সদ্য সংগৃহীত বিশৃঙ্খল রাশিতথ্যের উদাহরণ। অনেক সময়ই সদ্য সংগৃহীত রাশিতথ্যের প্রকৃতি দ্রুত বোঝা মুশকিল হয়ে যায়, বিশেষত যদি নমুনাটিতে এককের সংখ্যা অনেক বেশি হয়। যেমন, ৫০টি ইঁদুরের ওজন নেওয়া হলে সদ্য সংগৃহীত রাশিতথ্য দেখে দ্রুত কোনও মন্তব্য করা কঠিন হতে পারে। এই কারণে পরিসংখ্যানবিদ্‌রা সদ্য সংগৃহীত রাশিতথ্যকে সঠিকভাবে বিন্যস্ত করেন। রাশিতথ্যের মানগুলোকে মানের ক্রম অনুসারে সাজানো যেতে পারে। যেমন, পূর্বোক্ত ইঁদুরগুলোর ওজন যথাক্রমে ১৮, ২২, ২২, ২২; ২৬, ২৮, ২৯ ও ৩২ গ্রাম। এবারে, রাশিতথ্যটিতে দেখেই বোঝা গেল যে সবচেয়ে হালকা ইঁদুরের ওজন ১৮ গ্রাম, সবচেয়ে ভারী ইঁদুরের ওজন ৩২ গ্রাম ও ২২ গ্রাম ওজনযুক্ত ইঁদুরের সংখ্যায় ভারী। সঠিকভাবে সাজানো রাশিতথ্যকে সুশৃঙ্খল রাশিতথ্য **(Arranged data)** বলে। রাশিতথ্যকে মানের ক্রমানুসার বাদে অন্যান্য ভাবেও সাজানো যেতে পারে। যেমন, কয়েকজন ছাত্রের পরীক্ষায় মানের ক্রমঅনুসারে সাজানো যায়, আবার তাদের ক্রমিক নম্বরের সাথে সামঞ্জস্য রেখেও সাজানো যায়। যদি একটি নমুনার অন্তর্ভুক্ত এককগুলো থেকে একই সাথে দুটি চলক সংক্রান্ত সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তবে প্রাপ্ত রাশিতথ্যকে দ্বিচলক রাশিতথ্য **(Bivariate data)** বলে। নীচে এরকম রাশিতথ্যের একটা উদাহরণ দেওয়া হল :

কিছু মাছের দৈর্ঘ্য ('x' চলক) :	৬	৮	৯	১০	১২	১৫	ইঞ্চি
ঐ মাছগুলোর ওজন ('y' চলক) :	৫০	৯০	১২৫	২১০	৩৩৫	৪৫০	গ্রাম

(ছ) পরিসংখ্যা **(Frequency)** : একটি রাশিতথ্যে একটি চলকের একই মান এক বা একাধিক বার উপস্থিত থাকতে পারে। একটি চালকের একটি মান একটি রাশিতথ্যে যতবার উপস্থিত থাকে,

সেই সংখ্যাকে ঐ চলকের ঐ মানের পরিসংখ্যা (Frequency) বলে। যেমন, ১০টি ইঁদুরের ওজন যদি ১৮, ২২, ২২, ২২, ২২, ২৬, ২৮, ২৯, ও ৩২ গ্রাম হয়, তবে '১৮'-এর পরিসংখ্যা হল '১', '২২'-এর পরিসংখ্যা হল '৪' আবার '২৯'-এর পরিসংখ্যা হল '১' ও '৩২'-এর পরিসংখ্যা হল '১'।

এখানে আরও উল্লেখ্য এই যে যদি একটি রাশিতথ্যে চলকের মানগুলো শ্রেণীবিভক্ত থাকে, সেক্ষেত্রে একটি শ্রেণীভুক্ত মানগুলো রাশিতথ্যে যতবার উপস্থিত থাকে, সেই সংখ্যাই ঐ শ্রেণীটির পরিসংখ্যা হিসাবে বিবেচিত হয়। নীচে একটি উদাহরণ দেওয়া হল ঃ

ইঁদুরের ওজন	ইঁদুরের সংখ্যা
১৫-২০ গ্রাম	৯টি
২০-২৫ গ্রাম	৭টি
২৫-৩০ গ্রাম	৮টি
৩০-৩৫ গ্রাম	১টি

এখানে '১৫-২০' শ্রেণীটির পরিসংখ্যা হল '৯', '২০-২৫' শ্রেণীটির পরিসংখ্যা হল '৭', '২৫-৩০' শ্রেণীটির পরিসংখ্যা হল '৮' ও '৩০-৩৫' শ্রেণীটির পরিসংখ্যা হল '১'।

8.3.1 পরিসংখ্যা নিবেশন ঃ বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ (Frequency distribution : Characteristics and types)

সদ্য সংগৃহীত রাশিতথ্যে একটি চালকের বহু সংখ্যক মান বিশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। ফলে, এরকম একটি রাশিতথ্য দেখে চালকটির মানগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে দ্রুত কোনও ধারণা করা সম্ভবপর হয় না। এই কারণে, সদ্য সংগ্রহ করার পরে একটি রাশিতথ্যে চলকের মানগুলোকে সঠিক বা সুবিধাজনক ভাবে সাজানো হয়। ফলে, বিশৃঙ্খল রাশিতথ্যটি সুশৃঙ্খল রাশিতথ্যে পরিণত হয়। তবে, সুশৃঙ্খল রাশিতথ্য তৈরি হলেই পরিসংখ্যান সংক্রান্ত কাজ জলবৎ তরল হয়ে যায় না। কারণ, একটি রাশিতথ্যে একটি চলকের একই মান কয়েকবার বা অনেকবার উপস্থিত থাকতে পারে ; যেমন, একটি শ্রেণীর ৫০ জন ছাত্রের নম্বর নির্দেশক রাশিতথ্যে একই নম্বর কয়েকজন ছাত্র পেতেই পারে, অর্থাৎ একই নম্বরের (মান-এর) পরিসংখ্যা একের বেশি হতেই পারে। এরকম ঘটনাও একটি রাশিতথ্যকে দ্রুত বোঝার পক্ষে বাধার সৃষ্টি করে।

উপরোক্ত কারণগুলোর জন্য পরিসংখ্যানবিদ্‌রা অনেক সময়ই একটি রাশিতথ্যের অন্তর্ভুক্ত বহুসংখ্যক মানগুলোকে স্বল্প পরিসরে ও বোধগম্য রূপে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে সুবিধাজনক, সংক্ষিপ্ত উপায়ে ছোট থেকে বড়, এই ক্রম অনুসারে সারিবদ্ধ করেন ও একই সাথে সারিবদ্ধ মানগুলোর পাশে পাশে তাদের পরিসংখ্যা নির্দেশ করেন। এই কাজটিকে পরিসংখ্যা নিবেশন (Frequency distribution) বলে। আর এইভাবে তৈরি ছকটিকে পরিসংখ্যা ছক (Frequency table) বলে। প্রতিটি পরিসংখ্যা ছকের একটি নাম দেওয়া বাঞ্ছনীয়। পরিসংখ্যা নিবেশন দুই রকমের হতে পারে ঃ

(ক) সরল পরিসংখ্যা নিবেশন (Simple frequency distribution) : এই ধরনের পরিসংখ্যা নিবেশন জটিলতাবিহীন। এখানে একটি চলকের মানগুলো স্বল্প সংখ্যক হয় ও বিভিন্ন মানগুলোকে পরপর তাদের ছোট থেকে বড় ক্রম অনুসারে সারিবদ্ধ করা হয় ও একই সাথে সারিবদ্ধ মানগুলোর পাশে পাশে তাদের পরিসংখ্যা নির্দেশ করা হয়। নীচে একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

কিছু ইঁদুরের ওজন সংক্রান্ত পরিসংখ্যা ছক

ইঁদুরের ওজন (চলক)	ইঁদুরের সংখ্যা (পরিসংখ্যা)
২০ গ্রাম	৪
২২ গ্রাম	২
২৫ গ্রাম	৮
২৮ গ্রাম	৬
৩০ গ্রাম	৩
৩৫ গ্রাম	২
	মোট = ২৫

উপস্থাপিত পরিসংখ্যা ছকটি দেখলেই বোঝা যাবে যে এখানে ইঁদুরের মোট সংখা =২৫, সর্বনিম্ন ওজন =২০ গ্রাম, সর্বাধিক ওজন =৩৫ গ্রাম, বিভিন্ন ওজনের ইঁদুরের পরিসংখ্যা বিভিন্ন ও ২৫ গ্রাম ওজনযুক্ত ইঁদুরের সংখ্যাই সর্বাধিক।

(খ) শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা নিবেশন (Grouped frequencey distribution) : যখন একটি রাশিতথ্যে একটি চালকের বহু সংখ্যক মান উপস্থিত থাকে, তখন পরিসংখ্যানবিদ্‌রা ঐ বহুসংখ্যক মানগুলোকে সংক্ষেপে ও বোধগম্যরূপে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে কতগুলো সুবিধাজনক শ্রেণীতে (Classes) বিভক্ত করেন ও শ্রেণীগুলোকে পরপর তাদের মানের ক্রম অনুসারে সারিবদ্ধ করেন ও একই সাথে সারিবদ্ধ শ্রেণীগুলোর পাশে পাশে তাদের পরিসংখ্যাগুলো নির্দেশ করেন। এই কাজটিকে শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা নিবেশন (Grouped frequency distribution) বলে। একটি উদাহরণ দেওয়া হল :

অনেকগুলো মাছের দৈর্ঘ্য-সংক্রান্ত পরিসংখ্যা ছক

মাছের দৈর্ঘ্য (চলকের শ্রেণীবিভাগ)	মাছের সংখ্যা (পরিসংখ্যা)
১.৫-৫.৫ ইঞ্চি	৫০০
৫.৫-৯.৫ ইঞ্চি	৪১০
৯.৫-১৩.৫ ইঞ্চি	২৫০
১৩.৫-১৭.৫ ইঞ্চি	১২৫
১৭.৫-২১.৫ ইঞ্চি	১১৫
২১.৫-২৫.৫ ইঞ্চি	১০০
	মোট =১৫০০

শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা নিবেশন সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

(১) পরিসংখ্যা ছকে সংগৃহীত রাশিতথ্যের অন্তর্গত চলকের সর্বনিম্ন ও সর্বাধিক মান যেন অবশ্যই উপস্থিত থাকে।

(২) চলকের মানগুলোকে এমনভাবে শ্রেণীবিভক্ত করতে হবে যাতে প্রতিটি শ্রেণীর শ্রেণীপ্রসারের দৈর্ঘ্য সমান হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে একটি শ্রেণীর মধ্যে প্রদর্শিত চলকের নিম্নতম ও উর্ধ্বতম মানকে যুগ্মভাবে, শ্রেণীপ্রসার **(Class interval)** বলে ও একটি শ্রেণীর অন্তর্গত চলকের উর্ধ্বতম ও নিম্নতম মানের অন্তরফলকে শ্রেণীপ্রসারের দৈর্ঘ্য **(Width of class interval)** বলে। এখানে উপস্থাপিত পরিসংখ্যা ছকে প্রথম শ্রেণীটির শ্রেণীপ্রসার হল '১.৫-৫.৫' ও পঞ্চম শ্রেণীটির শ্রেণীপ্রসার হল '২১.৫-২৫.৫'। প্রতিটি শ্রেণীর শ্রেণীপ্রসারের দৈর্ঘ্য সমান (৫.৫ − ১.৫ = ৪, ৯.৫ − ৫.৫ = ৪ ইত্যাদি)।

(৩) একটি পরিসংখ্যা ছকে শ্রেণীর সংখ্যা খুব বেশি বা খুব কম হওয়া উচিত নয়, মাঝারি (পাঁচ-ছয়টি থেকে দশ-বারোটির মধ্যে) হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

(৪) শ্রেণীগুলোকে পরিসংখ্যা ছকে খেয়ালখুশি মতো সাজানো চলবে না। তাদের চলকের মানের ছোট থেকে বড় ক্রম অনুসারে সাজাতে হবে। উপস্থাপিত ছকে '১.৫-৫.৫', '৫.৫-৯.৫' এইভাবে শ্রেণীগুলোকে উপর থেকে নীচে পরপর সাজানো হয়েছে।

(৫) শ্রেণীগুলোর মধ্যে কখনো কোনও ফাঁক রাখা চলবে না। যেমন, '১.৫-৫.৫' শ্রেণীটির পরেই কখনও '৯.৫-১৩.৫' শ্রেণীতে যাওয়া যাবে না। পূর্বোক্ত শ্রেণী দুটো মাঝখানে '৫.৫-৯.৫' শ্রেণীটিকে দেখাতেই হবে, এমনকি যদি এই শ্রেণীভুক্ত কোনও মাছ নাও উপস্থিত থাকে। সেক্ষেত্রে, '৫.৫-৯.৫' শ্রেণীটি দেখিয়ে তার পরিসংখ্যা '০' হিসাবে উল্লেখ করার পরেই '৯.৫-১৩.৫' শ্রেণীটিকে দেখাতে হবে।

(৬) উপস্থাপিত পরিসংখ্যা ছকটি দেখলে আরও বোঝা যাবে যে একটি শ্রেণীর অন্তর্গত সর্বোচ্চ মান পরবর্তী শ্রেণীর অন্তর্গত সর্বনিম্ন মানের সমান। যেমন, '১.৫-৫.৫' শ্রেণীর অন্তর্গত সর্বোচ্চ মান হল '৫.৫', আর পরবর্তী '৫.৫-৯.৫' শ্রেণীটির অন্তর্গত সর্বনিম্ন মানও হল '৫.৫'। এই জাতীয় শ্রেণীগুলোর প্রত্যেকটির অন্তর্গত নিম্নতম মানকে নিম্ন শ্রেণীসীমানা **(Lower class boundary)** ও সর্বোচ্চ মানকে উর্ধ্ব শ্রেণীসীমানা **(Upper class boundary)** বলে। এই জাতীয় শ্রেণীবিভাগ থেকে বোঝা যায় যে প্রথম শ্রেণীটিতে চলকের মান ১.৫১ থেকে শুরু করে ৫.৫০ পর্যন্ত হতে পারে, দ্বিতীয় শ্রেণীটিতে চলকের মান ৫.৫১ থেকে শুরু করে ৯.৫০ পর্যন্ত হতে পারে ও তৃতীয় শ্রেণীটিতে চলকের মান ৯.৫১ থেকে শুরু করে ১৩.৫০ পর্যন্ত হতে পারে। অর্থাৎ চলকটি একটি অবিচ্ছিন্ন চলক। কিন্তু যদি শ্রেণীবিভাগটি নীচের ছকের মতো হত, তবে তার তাৎপর্য অন্যরকম হত।

কিছু ছাত্রের প্রাপ্ত নম্বর-সংক্রান্ত পরিসংখ্যা ছক

প্রাপ্ত নম্বর (চলকের শ্রেণীবিভাগ)	ছাত্র সংখ্যা (পরিসংখ্যা)
১১-২০	৪
২১-৩০	৩
৩১-৪০	২৪
৪১-৫০	৪০
৫১-৬০	৪
	মোট = ৭৫

সর্বশেষ উপস্থাপিত ছকটিতে প্রথম শ্রেণীটির সর্বোচ্চ মান ও দ্বিতীয় শ্রেণীটির সর্বনিম্ন মান স্বতন্ত্র। এই জাতীয় শ্রেণীগুলোর প্রত্যেকটির অন্তর্গত নিম্নতম মানকে নিম্ন শ্রেণীসীমা **(Lower class limit)** ও সর্বোচ্চ মানকে ঊর্ধ্ব শ্রেণীসীমা **(Upper class limit)** বলে। এই জাতীয় শ্রেণীবিভাগ থেকে বোঝা যায় যে চলকটি একটি বিচ্ছিন্ন চলক, অর্থাৎ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরগুলো ১১, ১২, ১৬, ২০ ইত্যাদি হতে পারে, কিন্তু ১১.১, ১৬.৪, ২০.২, ২৯.৪ ইত্যাদি হতে পারে না। কখনো কখনো পরিসংখ্যা ছকে অবিচ্ছিন্ন চলকের ক্ষেত্রেও শ্রেণীগুলোর শ্রেণীসীমা দেখানো থাকে কিন্তু শ্রেণীসীমানা দেখানো থাকে না। সেক্ষেত্রে, ছকটিকে নতুন করে লিপিবদ্ধ করে নিতে হয় ও এই কাজ করার সময় নিম্ন শ্রেণীসীমা থেকে ০.৫ বিয়োগ করে নিয়ে ও ঊর্ধ্ব শ্রেণীসীমার সাথে ০.৫ যোগ করে নিয়ে যথাক্রমে নিম্ন ও ঊর্ধ্ব শ্রেণীসীমানা বের করা হয়। যেমন, যদি বলা থাকত মাছের দৈর্ঘ্যের দুটি শ্রেণী হল যথাক্রমে '২-৫' ও '৬-৯' তাহলে বুঝে নিতে হবে যে এখানে শ্রেণীসীমা দেওয়া আছে। অঙ্ক কষবার আগে আমাদের শ্রেণীসীমানা বের করে নিতে হবে। শ্রেণীসীমানা বের করার পর শ্রেণী দুটো হবে যথাক্রমে '১.৫-৫.৫' ও '৫.৫-৯.৫'।

(৭) একটি শ্রেণীর নিম্ন ও উচ্চ শ্রেণীসীমানার মান দুটোকে যোগ করে যোগফলকে ২ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায়, তাকে ঐ শ্রেণীটির মধ্যবিন্দু **(Mid-point or Class mark)** বলে। যেমন, '১.৫-৫.৫' শ্রেণীটির মধ্যবিন্দু হল (১.৫ + ৫.৫) = ৭ ÷ ২ = ৩.৫। অঙ্ক কষবার সময় প্রায়ই শ্রেণীগুলোর মধ্যবিন্দু বের করার প্রয়োজন হয়।

8.3.2 পরিসংখ্যা নিবেশনের সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and demerits of frequency distribution)

পরিসংখ্যা বিভাজনের একাধিক সুবিধা রয়েছে। যেমন (১) এর সাহায্যে বড় একটি রাশিতথ্যকে সংক্ষেপে দেখানো যায় ও একই সাথে চলকের মানগুলোর পরিসংখ্যাও দেখানো যায়। (২) পরিসংখ্যা ছক দেখে সহজেই চলকের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মানকে শনাক্ত করা যায়। (৩) এর সাহায্যে চলকের মানগুলোর কোনও নির্দিষ্ট ঝোঁক (Trend) আছে কিনা বোঝা যায়। (৪) পরিসংখ্যা ছক দেখে সংখ্যাগুরু মান (Mode) বা সংখ্যাগুরু শ্রেণী (Model class) সহজে শনাক্ত করা যায়। (৫) পরিসংখ্যা ছক গঠন করলে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত হিসাবনিকাশ ও বিশ্লেষণ করা অনেক সহজ হয়ে ওঠে।

তবে, পরিসংখ্যা নিবেশনের কিছু অসুবিধাও আছে (১) পরিসংখ্যা ছকে চলকের প্রতিটি মানকে স্বতন্ত্র ভাবে দেখানো হয় না, একসাথে কিছু মানকে এক একটি শ্রেণীভুক্ত করে দেখানো হয়। (২) একটি পরিসংখ্যা ছকে প্রদর্শিত শ্রেণীগুলির অন্তর্গত সমস্ত মানগুলোই বাস্তবে সমগ্রক বা নমুনার মধ্যে নাও দেখা যেতে পারে। যেমন, মাছের একটি শ্রেণী '১.৫-৫.৫ ইঞ্চি' হলেও বাস্তবে ১.৬ ইঞ্চি বা ৫.৪ ইঞ্চি লম্বা কোনও মাছ নমুনার মধ্যে নাও থাকতে পারে। (৩) পরিসংখ্যা ছকে একটি শ্রেণীর পরিসংখ্যা দেখা যায়, কিন্তু একটি শ্রেণীর অন্তর্গত প্রতিটি মানের পরিসংখ্যা পৃথকভাবে দেখা যায় না। যেমন, মাছের একটি শ্রেণী '১.৫-৫.৫ ইঞ্চি' ও শ্রেণীটির পরিসংখ্যা '৫০০' হতে পারে, কিন্তু এর থেকে বোঝা যাচ্ছে না ১.৫ ইঞ্চি লম্বা মাছের পরিসংখ্যা কত বা ২.৩ ইঞ্চি লম্বা মাছের পরিসংখ্যাই বা কত।

অনুশীলনী-২

১। চলক কি? চলকের প্রকারভেদ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উঃ এই অধ্যায়ের '8.3' অংশের (ক) (ঘ) ও (ঙ) ভাগগুলো দেখ।

২। রাশিতথ্য বলতে কি বোঝায়? বিশৃঙ্খল ও সুশৃঙ্খল রাশিতথ্যের পার্থক্য কি? দ্বি-চলক রাশিতথ্য বলতে কি বোঝায়?

উঃ এই অধ্যায়ে '8.3' অংশের (চ) ভাগ দেখ।

৩। পরিসংখ্যা নিবেশন বলতে কি বোঝায়? সরল পরিসংখ্যা নিবেশন কি? শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা নিবেশন সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণ পেশ কর।

উঃ এই অধ্যায়ের '8.3.1' অংশ দেখ।

৪। পরিসংখ্যা নিবেশনের সুবিধা ও অসুবিধা বিবৃত কর।

উঃ এই অধ্যায়ের '8.3.2' অংশ দেখ।

8.4 লৈখিক উপায়ে রাশিতথ্যের উপস্থাপনা (Diagrammatic representation of data)

পরিসংখ্যান শাস্ত্রে রাশিতথ্যকে বোধগম্য করার জন্য শ্রেণীবিন্যস্ত করা হয়। কিন্তু অনেক সময়ই শ্রেণীবিন্যস্ত রাশিতথ্য দেখে তার প্রকৃতি অনুধাবন করা সহজসাধ্য হয় না। কারণ, কেবলমাত্র সংখ্যার ব্যবহারে গঠিত রাশিতথ্যের শ্রেণীবিন্যাস আমাদের মনে স্বল্প সময়ের মধ্যে গভীরভাবে দাগ কাটতে নাও পারে। এই কারণে, অনেক ক্ষেত্রেই রাশিতথ্যকে লেখ (Graph) বা চিত্র (Chart) মারফত প্রকাশ করা হয়। লেখ বা চিত্রের সাহায্যে শ্রেণীবিন্যস্ত ও শ্রেণীবিন্যস্ত নয়, এমন দুই ধরনের রাশিতথ্যকেই প্রকাশ করা যেতে পারে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ প্রায়ই পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত রাশিতথ্যকে লেখ বা চিত্র মারফত প্রকাশ করে থাকে। প্রাণিবিজ্ঞানীরাও এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

8.4.1 লেখ ও চিত্রের সুবিধা-অসুবিধা

লেখ বা চিত্র চোখে দেখা যায় বলে এদের সাহায্যে রাশিতথ্য সম্পর্কে সহজেই একটা ধারণা করে

নেওয়া যায়। এদের সাহায্যে বিভিন্ন রাশি তথ্যমালার মধ্যে তুলনা করা চলে। রাশিতথ্যের মধ্যে কোনও বিশেষ ঝোঁক (Trend) থাকলে তাও লেখ বা চিত্র মারফত প্রকাশিত হয়। কখনো কখনো লেখ বা চিত্রের সাহায্যে কোনও চলকের অন্তর্বর্তী মান সম্পর্কেও ধারণা করা সম্ভবপর হতে পারে।

তবে, লেখ বা চিত্র মারফত প্রকাশিত রাশিতথ্যে বিস্তারিত বিবরণ থাকে না। একটি ছক (Table)-এর সাহায্যে প্রকাশিত রাশিতথ্যে কোনও চলকের সঠিক মান পাওয়া যায়, কিন্তু লেখ বা চিত্রের সাহায্যে প্রকাশিত তথ্যে চলকের সঠিক মান নাও পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া, লেখ বা চিত্র আঁকার কাজ খুব সহজ নয়, এর জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় করতে হয় ও এর জন্যে প্রয়োজনীয় সাবধনতা অবলম্বন না করলে রাশিতথ্য সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে।

8.4.2 x-y লেখ (x-y Curve)

পরিসংখ্যান শাস্ত্রে x-y লেখ কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। যদি দুটো চলক এমনভাবে পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত হয় যে 'x' চলকের যে কোনও একটি নির্দিষ্ট মানের জন্য 'y' চলকের একটি নির্দিষ্ট মান পাওয়া সম্ভব, তখন 'x' ও 'y' চলক দুটির মানগুলোর মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করার জন্য x-y লেখ ব্যবহার করা হয়।

x-y লেখ আঁকার পদ্ধতিটি সহজ। প্রথমে, একটি ছক কাগজের উপর পরস্পরের সাথে সমকোণে দুটো অক্ষ বা স্কেলযুক্ত সরলরেখা আঁকা হয়। অনুভূমিক সরলরেখাটিকে **x-অক্ষ (x-axis)** বলে ও উল্লম্ব সরলরেখাটিকে y-অক্ষ **(y-axis)** বলে। অক্ষ দুটোর ছেদবিন্দুকে মূলবিন্দু **(Origin)** বলে। মূলবিন্দুটিকে 'o' দ্বারা সূচিত করা হয়। অক্ষ দুটো যথাক্রমে 'x' ও 'y' চলককে নির্দেশ করে। এবার, 'x' চলকের একটি নির্দিষ্ট মান ও তার সাথে সম্পর্কিত 'y' চলকের একটি নির্দিষ্ট মানকে কেবলমাত্র একটি সাধারণ বিন্দুর দ্বারা ছক কাগজে সংস্থাপন করা হয়। মূলবিন্দু থেকে যথাক্রমে x-অক্ষ ও y-অক্ষের দিকে চলক দুটোর মান অনুসারে অগ্রসর হয়ে দুটো কাল্পনিক সরলরেখা আঁকলে রেখা দুটোর ছেদবিন্দুই হবে পূর্বোক্ত সাধারণ বিন্দুটির অবস্থান। এইভাবে, একের পর এক সাধারণ বিন্দু ছক কাগজে সংস্থাপন করা হয়। পরিশেষে, সাধারণ বিন্দুগুলোকে রেখার সাহায্যে যোগ করলেই x-y লেখ পাওয়া যায়।

প্রাণিবিজ্ঞানে x-y লেখ ব্যবহারের একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। একটি পুকুরে উৎপাদিত রুইমাছের দৈর্ঘ্য ও ওজন নীচে দেওয়া হল।

মাছের দৈর্ঘ্য ('x' চলক)	মাছের ওজন ('y' চলক)
৫ সেন্টিমিটার	১০ গ্রাম
৬ সেন্টিমিটার	১২ গ্রাম
৭ সেন্টিমিটার	১৫ গ্রাম
৮ সেন্টিমিটার	২০ গ্রাম
৯ সেন্টিমিটার	৩০ গ্রাম

প্রথমে, ছক কাগজে সঠিক স্কেলযুক্ত x-অক্ষ ও y-অক্ষ এঁকে নেওয়া হল। এবার 'x' চলকের একটি নির্দিষ্ট মান (যথা ৫ সেন্টিমিটার) ও তার সাথে সম্পর্কিত 'y' চলকের নির্দিষ্ট মান (যথা ১০ গ্রাম) এর জন্য একটি সাধারণ বিন্দু 'ক' ছক কাগজে সংস্থাপন করা হল। ঐ সাধারণ বিন্দুটির অবস্থান এমন হবে যাতে x-অক্ষ থেকে y-অক্ষের দিকে তার দূরত্ব হবে ১০ একক (১০ গ্রাম এর নির্দেশক) ও y-অক্ষ থেকে x-অক্ষের দিকে তার দূরত্ব হবে ৫ একক (৫ সেন্টিমিটার এর নির্দেশক)। এই পদ্ধতিতে যথাক্রমে 'খ', 'গ', 'ঘ' ও 'ঙ' নামক সাধারণ বিন্দুকেও ছক কাগজে সংস্থাপন করা হল। পরিশেষে, 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' ও 'ঙ' বিন্দুকে রেখা দ্বারা যোগ করে x-y লেখাটি পাওয়া গেল (চিত্র দ্রষ্টব্য)।

x-y লেখ-এর সাহায্যে আমরা সহজেই 'x' ও 'y' নামক দুটো চলকের পরস্পরের সাথে সম্পর্ককে বুঝে নিতে পারি। 'x' চলকের মানের বৃদ্ধি ঘটলে 'y' চলকের মান কতটা বৃদ্ধি পায় বা হ্রাস পায়, সেটা এই লেখ-এর মাধ্যমে সহজেই অনুধাবন করা যায়। তবে, এই লেখ অনেক সময়ই রাশিতথ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেয় না। এছাড়া, এই লেখা আঁকবার সময় x-অক্ষ ও y-অক্ষ বরাবর স্কেল নির্বাচন করা খুব সহজ নয়। সুষ্ঠুভাবে স্কেল নির্বাচন না করতে পারলে লেখটি ছক কাগজের ব্যাপক অংশ জুড়ে জড়িয়ে যায় বা ছোট অংশের মধ্যেই সীমিত থাকে ও দেখতে অসুন্দর হয়ে ওঠে। সঠিকভাবে স্কেল নির্বাচন করলে লেখটি মাঝারি আকারেরও সুদৃশ্য হয়।

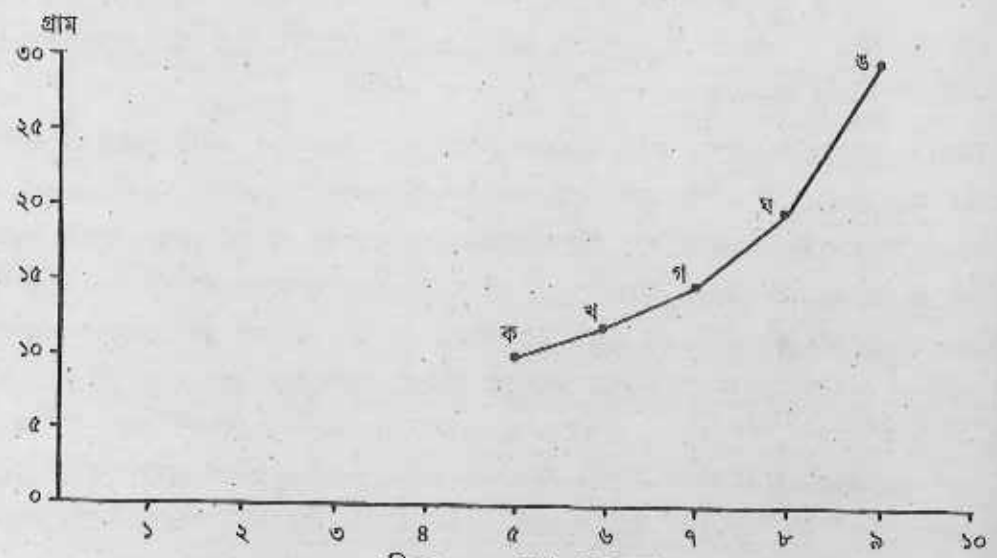

চিত্র ১ : x-y লেখ-এর নমুনা

8.4.3 পাইচিত্র (Pie chart)

পরিসংখ্যান শাস্ত্রে অনেক সময়ই পাইচিত্র নামক একরকমের লৈখিক পদ্ধতিতে পরিসংখ্যান-সংক্রান্ত রাশিতথ্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে। পাইচিত্রে একটি বৃত্ত (প্রকৃতপক্ষে বৃত্তটির ক্ষেত্রফল) পূর্ণ রাশিতথ্যকে প্রকাশ করে ও কয়েকটি ব্যাসার্ধের সাহায্যে পূর্ণ বৃত্তটিকে এমন কয়েকটি বৃত্তাংশে ভাগ করা হয় যাতে কিনা বৃত্তাংশগুলোর কেন্দ্রস্থ কোণগুলো পূর্ণ রাশিতথ্যের বিভিন্ন অংশের ঠিক সমানুপাতিক হয়।

একটি পাইচিত্র আঁকতে গেলে প্রথমে একটি বৃত্ত এঁকে নেওয়া হয়। বৃত্তটির মোট ক্ষেত্রফলকে রাশিতথ্যের সামগ্রিক মান বা ১০০% হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এখন যেহেতু একটি পূর্ণবৃত্ত তার কেন্দ্রের চারপাশে মোট ৩৬০° কোণ উৎপন্ন করে, সেহেতু বলা যেতে পারে যে বৃত্তটির কেন্দ্রস্থ ৩৬০° কোণ শতকরা ১০০ ভাগ রাশিতথ্যের মানকে প্রকাশ করে। অর্থাৎ রাশিতথ্যের শতকরা একভাগ (১%) মান বৃত্তকেন্দ্রে ৩.৬° কোণ উৎপন্ন করে। এরপর রাশিতথ্যের বিভিন্ন অংশগুলোকে পূর্ণ রাশিতথ্যের শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হয়। যদি রাশিতথ্যের একটি অংশ বা অংশতথ্য পূর্ণতথ্যের শতকরা 'x' ভাগ হয়, তবে ঐ অংশটি বৃত্তকেন্দ্রে $x \times ৩.৬°$ কোণ উৎপন্ন করবে। অপর একটি অংশ তথ্য যদি পূর্ণতথ্যের শতকরা 'y' ভাগ হয়, তবে ঐ অংশটি বৃত্তকেন্দ্রে $y \times ৩.৬°$ কোণ উৎপন্ন করবে। এইভাবে পূর্ণ রাশিতথ্যের বিভিন্ন অংশগুলো বৃত্তকেন্দ্রে কি কি মাপের কেন্দ্রস্থ কোণ উৎপন্ন করবে, তা নির্ণয় করে নেওয়া হয়। এইবার, বৃত্তটির কেন্দ্রে পূর্বোক্ত কেন্দ্রস্থ কোণগুলো পরপর আঁকা হয়। এর ফলে, বৃত্তটি কয়েকটি বৃত্তাংশে বিভক্ত হয় ও প্রত্যেকটি বৃত্তাংশ একেকটি অংশতথ্যকে নির্দেশ করে।

পাইচিত্র আঁকার সময় আরও কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে। সবচেয়ে বড় মানের অংশতথ্যের নির্দেশক কেন্দ্রস্থ কোণটিকে প্রথমে আঁকতে হবে। তারপর ক্রমশ ক্ষুদ্রতর মানের অংশতথ্যের নির্দেশক কেন্দ্রস্থ কোণগুলোকে ঘড়ির কাঁটার সরণের মতো (Clockwise) পরপর ডানদিকে আঁকতে হবে। এছাড়া প্রতিটি বৃত্তাংশকে আলাদা আলাদা রঙ বা চিহ্ন দিয়ে বোঝানো যেতে পারে, যা পাইচিত্রকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করে তোলে। এছাড়া প্রতিটি বৃত্তাংশের মধ্যে অংশতথ্যের নাম ও শতকরা পরিমাণ (পূর্ণ রাশিতথ্যের সাপেক্ষে) লিখে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রাণিবিজ্ঞানে পাইচিত্র ব্যবহারের একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরা যাক, একটি পুকুরে উৎপাদিত মোট মাছের সংখ্যা ১০০০টি। তার মধ্যে রুই মাছ ৫০০টি, কাতলা ২৫০টি, মৃগেল ১৫০টি ও তেলাপিয়ার সংখ্যা ১০০টি। এক্ষেত্রে, পূর্ণ রাশিতথ্যের মান ১০০০ কে আমরা ১০০% ধরতে পারি। ফলে রুই মাছের শতকরা মান ৫০%, কাতলার শতকরা মান ২৫%, মৃগেলের শতকরা মান ১৫% ও তেলাপিয়ার শতকরা মান ১০%। এখন একটি বৃত্ত আঁকা হল, যার কেন্দ্রস্থ মোট কোণের পরিমাপ ৩৬০°। পাইচিত্র আঁকতে গেলে রুই মাছের নির্দেশক কেন্দ্রস্থ কোণ হবে $৫০ \times ৩.৬° = ১৮০°$, কাতলার নির্দেশক কেন্দ্রস্থ হবে $২৫ \times ৩.৬° = ৯০$, মৃগেলের নির্দেশক কেন্দ্রস্থ কোণ হবে $১৫ \times ৩.৬° = ৫৪°$ ও তেলাপিয়ার নির্দেশক কেন্দ্রস্থ কোণ হবে $১০ \times ৩.৬° = ৩৬°$। এখন বৃত্তটির কেন্দ্রে যথাক্রমে ১৮০°, ৯০°, ৫৪° ও ৩৬° মাপের চারটি কোণ আঁকলে পাইচিত্রটি পাওয়া যাবে। প্রতিটি বৃত্তাংশে মাছের নাম ও তার শতকরা মান লিখে দেওয়া বাঞ্ছনীয় (চিত্র-২ দ্রষ্টব্য)।

পাইচিত্রের সুবিধাগুলো হল—(১) পাইচিত্র দৃষ্টি-আকর্ষক হওয়ায় এর মাধ্যমে সহজেই কোনও রাশিতথ্য সম্পর্কে সামগ্রিক একটি ধারণা করে নেওয়া যায় ও (২) একটি পূর্ণ রাশিতথ্যের বিভিন্ন অংশগুলোর শতকরা মান সম্পর্কেও একটি পাইচিত্র থেকে ধারণা পাওয়া সম্ভবপর হয়।

তবে, পাইচিত্রের কিছু অসুবিধাও আছে। যেমন, (১) পাইচিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন অংশতথ্যের শতকরা মানগুলো বোধগম্য হলেও তাদের প্রকৃত নাম (Absolute values) বোধগম্য হয় না (২)

পাইচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত রাশিতথ্যে বিস্তারিত বিবরণ থাকে না ও (৩) পাইচিত্র আঁকা সময় সাপেক্ষ ও কিছুটা কষ্টসাধ্য।

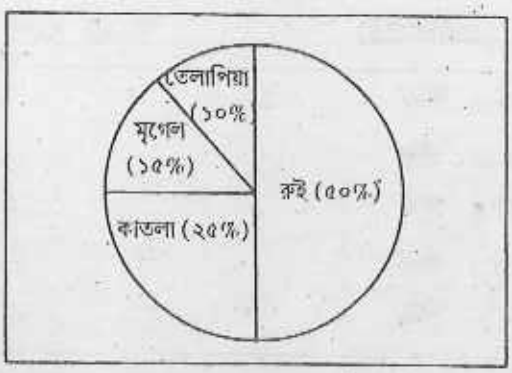

চিত্র ২ : পাইচিত্রের নমুনা

8.4.4 আয়তলেখ বা হিস্টোগ্রাম (Histogram)

পরিসংখ্যান শাস্ত্রে শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা নিবেশনের রাশিতথ্যকে অনেক সময়ই আয়তলেখ নামক লৈখিক পদ্ধতির সাহায্যে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। আয়তলেখ হল একটি অনুভূমিক সরলরেখার উপরে অঙ্কিত পরস্পরের সাথে সংলগ্ন এমন একগুচ্ছ আয়তক্ষেত্র যাদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রফল অনুরূপ শ্রেণীপরিসংখ্যার সাথে সমানুপাতিক।

একটি আয়তলেখ আঁকতে গেলে প্রথমে ছক কাগজে একটি স্কেল যুক্ত অনুভূমিক সরলরেখা আঁকা হয়। এরপর পরিসংখ্যা ছকের থেকে প্রদর্শিত শ্রেণীগুলির শ্রেণীসীমানাসমূহ ঐ অনুভূমিক রেখার উপরে পরপর নির্দেশ করতে হয়। শ্রেণীসীমানাগুলোর মধ্যে কোনও ফাঁক রাখা চলবে না। অতঃপর অনুভূমিক রেখাটির উপর পরপর কতগুলি আয়তক্ষেত্র এমনভাবে আঁকা হয়, যাতে কিনা প্রতিটি আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা একটি অনুরূপ শ্রেণীর পরিসংখ্যার সাথে সমানুপাতিক হয়। বলা বাহুল্য যে এই পদ্ধতিতে আঁকা প্রতিটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পরিসংখ্যা ছকের একটি অনুরূপ শ্রেণীর পরিসংখ্যাকে নির্দেশ করে। এছাড়া আয়তক্ষেত্রগুলোর ক্ষেত্রফলের সমষ্টি পরিসংখ্যা ছকের সামগ্রিক পরিসংখ্যাকে প্রকাশ করে। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হল, একটি আয়তক্ষেত্রের ভূমি একটি অনুরূপ শ্রেণীর শ্রেণীপ্রসারের দৈর্ঘ্যকে নির্দেশ করে।

আয়তলেখ আঁকবার সময় সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে যে অনুভূমিক রেখাটির উপর নির্দেশিত শ্রেণীসীমানাগুলোর মধ্যে যেন কোনও ফাঁক না থাকে। যদি পরিসংখ্যা নিবেশনে প্রতিটি শ্রেণীপ্রসারের দৈর্ঘ্য সমান হয় তবে আয়তক্ষেত্রগুলোর উচ্চতা অনুরূপ শ্রেণীপরিসংখ্যার সাথে সমানুপাতিক করে নিলেই চলবে। কিন্তু যদি শ্রেণীপ্রসারগুলোর দৈর্ঘ্য সমান না হয়, তবে বিভিন্ন আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা নীচে দেওয়া সূত্র অনুসারে ঠিক করতে হবে।

আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা = শ্রেণীপরিসংখ্যা ÷ শ্রেণীপ্রসারের দৈর্ঘ্য

প্রাণিবিজ্ঞানে আয়তলেখ ব্যবহারের একটি উদারণ দেওয়া যাক। একটি পুকুরে উপস্থিত মাছের দৈর্ঘ্য ও সংখ্যা নীচে দেওয়া হল।

মাছের দৈর্ঘ্য (শ্রেণীপ্রসার)	মাছের সংখ্যা (শ্রেণীপরিসংখ্যা)
২.৫-৫.৫ ইঞ্চি	২০
৫.৫-৮.৫ ইঞ্চি	৩৫
৮.৫-১১.৫ ইঞ্চি	১৫
১১.৫-১৪.৫ ইঞ্চি	২৫
১৪.৫-১৭.৫ ইঞ্চি	১০

এক্ষেত্রে, ছক কাগজে একটি স্কেলযুক্ত অনুভূমিক রেখার উপর যথাক্রমে ২.৫, ৫.৫, ৮.৫, ১১.৫, ১৪.৫ ও ১৭.৫ ইঞ্চিকে নির্দেশ করতে হবে। তারপর রেখাটির উপর পর পর কতগুলো আয়তক্ষেত্র সমানভাবে আঁকতে হবে যাতে কিনা প্রত্যেকটি আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা একটা অনুরূপ শ্রেণীর শ্রেণীপরিসংখ্যার সাথে সমানুপাতিক হয়। যেমন, প্রথম আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা ২ ইঞ্চি হলে (শ্রেণীপরিসংখ্যা =২০), দ্বিতীয় আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা হবে ৩.৫ ইঞ্চি (শ্রেণীপরিসংখ্যা = ৩৫), তৃতীয় আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা হবে ১.৫ ইঞ্চি (শ্রেণীপরিসংখ্যা = ১৫), চতুর্থ আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা হবে ২.৫ ইঞ্চি (শ্রেণীপরিসংখ্যা = ২৫) ও পঞ্চম আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা হবে ১ ইঞ্চি (শ্রেণীপরিসংখ্যা = ১০)। এই উদাহরণে প্রতিটি শ্রেণীর শ্রেণীপ্রসারের দৈর্ঘ্য সমান (৫.৫ – ২.৫ = ৩, ৮.৫ – ৫.৫ = ৩, ১১.৫ – ৮.৫ = ৩ ইত্যাদি)। ফলে আয়তলেখটি সহজেই আঁকা যাবে (চিত্র-৩ দ্রষ্টব্য)। এখানে আয়তক্ষেত্রগুলোর উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য কোনও সূত্র প্রয়োগের দরকার নেই।

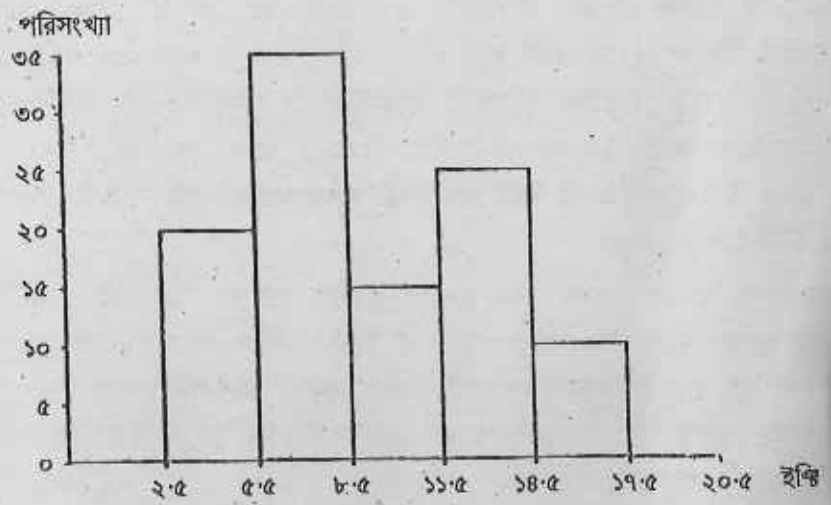

চিত্র ৩ : আয়তলেখ-এর নমুনা

আয়তলেখ-এর সুবিধা নানাপ্রকার (১) আয়তলেখ-এর সাহায্যে আমরা সহজেই শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজনের রাশিতথ্যকে অনুধাবন করতে পারি, (২) বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের শ্রেণীপ্রসারের দৈর্ঘ্য ও শ্রেণীপরিসংখ্যাগুলো সরাসরি প্রত্যক্ষ করতে পারি ও (৩) আয়তলেখ-এর সাহায্যে সরাসরি সংখ্যাগুরু মান (Mode) নির্দেশক শ্রেণীটিকে শনাক্ত করা যায়। যেমন, এখানে প্রদত্ত চিত্রে (চিত্র নং ৩) ৫.৫-৮.৫ শ্রেণীটিই হল সংখ্যাগুরু মান নির্দেশক শ্রেণী (Modal class), কারণ এই শ্রেণীটির শ্রেণীপরিসংখ্যাই হল সর্বাধিক (৩৫)। তবে আয়তলেখ-এর অসুবিধা এই যে যদি কখনও শ্রেণীগুলোর শ্রেণীপ্রসারের দৈর্ঘ্যগুলো বিভিন্ন হয়, তখন আয়তলেখ দেখে সহজে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রেণীপরিসংখ্যাগুলো অনুধাবন করা সম্ভব হয় না।

অনুশীলনী-৩

১। লেখ ও চিত্রের প্রয়োজনীয়তা কি? এদের সুবিধা-অসুবিধা কি?

উঃ এই অধ্যায়ের '8.4' ও '8.4.1' অংশগুলো দেখ।

২। x-y লেখ কি? এর আঁকার পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণনা কর। এই লেখার সুবিধা ও অসুবিধা কি?

উঃ এই অধ্যায়ের '8.4.2' অংশ দেখ।

৩। পাইচিত্র কি? এর আঁকার পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণনা কর। এই লেখার সুবিধা ও অসুবিধা কি?

উঃ এই অধ্যায়ের '8.4.3' অংশ দেখ।

৪। আয়তলেখ কি? এর আঁকার পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণনা কর। এই লেখার সুবিধা ও অসুবিধা কি?

উঃ এই অধ্যায়ের '8.4.4' অংশ দেখ।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

বড় প্রশ্ন ঃ

১। জৈব-পরিসংখ্যান শাস্ত্রে সমগ্রক ও নমুনা শব্দ দুটোর অর্থ ব্যাখ্যা কর ও এদের থেকে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি আলোচনা কর।

উঃ এই অধ্যায়ের '8.2.1' ও '8.2.2' অংশ দুটো দেখ।

২। পরিসংখ্যা নিবেশনের বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

উঃ এই অধ্যায়ের '8.3.1' অংশ দেখ।

৩। x-y লেখ-এর সংজ্ঞা, অঙ্কনপদ্ধতি ও সুবিধা-অসুবিধা বিবৃত কর।

উঃ এই অধ্যায়ের '8.4.2' অংশ দেখ।

৪। পাই চিত্র-এর সংজ্ঞা, অঙ্কনপদ্ধতি ও সুবিধা-অসুবিধা বিবৃত কর।

উঃ এই অধ্যায়ের '8.4.3' অংশ দেখ।

৫। আয়তলেখ-এর সংজ্ঞা, অঙ্কনপদ্ধতি ও সুবিধা-অসুবিধা বিবৃত কর।

উঃ এই অধ্যায়ের '8.4.4' অংশ দেখ।

৬। একটি পুকুরে উৎপাদিত মোট মাছের সংখ্যা ২০০০টি। তার মধ্যে রুই মাছ ১০০০টি, কাতলা ৫০০টি, মৃগেল ৩০০টি ও তেলাপিয়ার সংখ্যা ২০০টি। এই রাশিতথ্যকে একটি পাইচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ কর।

উঃ পুকুরে উৎপাদিত মোট মাছের সংখ্যা ২০০০টি। তার মধ্যে রুই মাছ ১০০০টি, কাতলা ৫০০টি, মৃগেল ৩০০টি ও তেলাপিয়ার সংখ্যা ২০০টি। এক্ষেত্রে পূর্ণ রাশিতথ্যের মান ২০০০-কে আমরা ১০০% ধরতে পারি। ফলে রুই মাছের শতকরা মান ৫০%, কাতলার শতকরা মান ২৫%, মৃগেলের শতকরা মান ১৫% ও তেলাপিয়ার শতকরা মান ১০%। এখন একটি বৃত্ত আঁকা হল, যার কেন্দ্রস্থ মোট কোণের পরিমাপ হল ৩৬০°। পাইচিত্র আঁকতে গেলে রুই মাছের নির্দেশক কেন্দ্রস্থ কোণ হবে ৫০× ৩.৬° = ১৮০°, কাতলার নির্দেশক কেন্দ্রস্থ কোণ হবে ২৫× ৩.৬° = ৯০°, মৃগেলের নির্দেশক কেন্দ্রস্থ কোণ হবে ১৫× ৩.৬° = ৫৪° ও তেলাপিয়ার নির্দেশক কেন্দ্রস্থ কোণ হবে ১০× ৩.৬° = ৩৬°। এখন বৃত্তটির কেন্দ্রে যথাক্রমে ১৮০°, ৯০°, ৫৪° ও ৩৬° মাপের চারটি কোণ আঁকলে পাইচিত্রটি পাওয়া যাবে। প্রতিটি বৃত্তাংশ মাছের নাম ও তার শতকরা মান লিখে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

৭। একটি পুকুরে উপস্থিত পোনা মাছের দৈর্ঘ্য ও সংখ্যা নীচে দেওয়া হল, রাশিতথ্যটিকে একটি আয়তলেখের সাহায্যে প্রকাশ কর।

পোনা মাছের দৈর্ঘ্য (শ্রেণীপ্রসার)	মাছের সংখ্যা (শ্রেণীপরিসংখ্যা)
১.৫-৪.৫ ইঞ্চি	২৫
৪.৫-৭.৫ ইঞ্চি	৩৫
৭.৫-১০.৫ ইঞ্চি	১৫
১০.৫-১৩.৫ ইঞ্চি	৪০
১৩.৫-১৬.৫ ইঞ্চি	১০

উঃ ছক কাগজে একটি স্কেলযুক্ত অনুভূমিক রেখার উপর যথাক্রমে ১.৫, ৪.৫, ৭.৫, ১০.৫, ১৩.৫, ও ১৬.৫ ইঞ্চিকে নির্দেশ করতে হবে। তারপর, রেখাটির উপর পর পর কতগুলো আয়তক্ষেত্র এমনভাবে আঁকতে হবে যাতে কিনা প্রত্যেকটি আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা একটি অনুরূপ শ্রেণীর শ্রেণীপরিসংখ্যার সাথে সমানুপাতিক হয়। যেমন, প্রথম আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা ২.৫ ইঞ্চি হলে (শ্রেণীপরিসংখ্যা = ২৫), দ্বিতীয় আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা হবে ৩.৫ ইঞ্চি (শ্রেণীপরিসংখ্যা = ৩৫), তৃতীয় আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা হবে ১.৫ ইঞ্চি (শ্রেণীপরিসংখ্যা = ১৫), চতুর্থ আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা হবে ৪.০ ইঞ্চি (শ্রেণীপরিসংখ্যা = ৪০) ও পঞ্চম আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা হবে ১ ইঞ্চি (শ্রেণীপরিসংখ্যা = ১০)। আয়তক্ষেত্রগুলোর উচ্চতা ইচ্ছা করলে ২.৫, ৩.৫ ইত্যাদির পরিবর্তে সেন্টিমিটারেও বসানো যেতে পারে।

মাঝারি প্রশ্ন ঃ

১। প্রাণিবিজ্ঞানে পরিসংখ্যান শাস্ত্রের প্রয়োগ সম্পর্কে টীকা লেখ।

উঃ এই অধ্যায়ের প্রথমে 'প্রস্তাবনা' অংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দেখ।

২। নমুনা তদন্ত সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।

উঃ এই অধ্যায়ের '8.2.2' অংশ দেখ।

৩। চলক শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা কর ও চলকের শ্রেণীবিভাগ কর।

উঃ এই অধ্যায়ের '8.3.' অংশের (ক), (ঘ), ও (ঙ) ভাগগুলো দেখ।

৪। পরিসংখ্যা নিবেশনের সুবিধা ও অসুবিধা বিবৃত কর।

উঃ এই অধ্যায়ের '8.3.2' অংশ দেখ।

৫। সরল পরিসংখ্যা নিবেশন সম্পর্কে একটি টীকা দেখ।

উঃ এই অধ্যায়ের '8.3.1' অংশের (ক) ভাগটি লেখ।

ছোট প্রশ্ন ঃ

১। জৈব-পরিসংখ্যান শাস্ত্র কি ?

উঃ এই অধ্যায়ের গোড়ায় 'প্রস্তাবনা' অংশের প্রথম অনুচ্ছেদ দেখ।

২। সমসম্ভব নমুনা চয়ন কি ?

উঃ এই অধ্যায়ের '8.2.2' অংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষ ভাগ দেখ।

৩। অপরিমেয় বৈশিষ্ট্য কাকে বলে ?

উঃ এই অধ্যায়ের '8.3' অংশের (খ) ভাগটি দেখ।

৪। চলকের প্রসার বলতে কি বোঝায় ?

উঃ এই অধ্যায়ের '8.3' অংশের (গ) ভাগটি দেখ।

৫। লেখ ও চিত্রের সুবিধা ও অসুবিধা বিবৃত কর।

উঃ এই অধ্যায়ের '8.4.1' অংশ দেখ।

৬। পরিসংখ্যা বলতে কি বোঝায় ?

উঃ এই অধ্যায়ের '8.3' অংশের (ছ) ভাগ দেখ।

৭। পাইচিত্রের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি ?

উঃ এই অধ্যায়ের '8.4.3' অংশের শেষ দুটো অনুচ্ছেদ দেখ।

৮। আয়তলেখের সুবিধা ও অসুবিধা কি কি ?

উঃ এই অধ্যায়ের '8.4.4' অংশের শেষ অনুচ্ছেদ দেখ।

একক 9 ❐ মধ্যগামিতা ও তার পরিমাপক সমূহ (Measures of Central Tendency : Mean, Mode and Median)

গঠন ঃ

9.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

9.2 মধ্যগামিতার বা কেন্দ্রীয় প্রবণতার (Central tendency) বিভিন্ন মাপক সমূহ

9.3 উপযুক্ত পরিমাপকের গুণাবলী

9.4 যৌগিক গড় (Mean)

9.4.1 যৌগিক গড়ের সূত্রাবলী ও তার প্রয়োগ

9.4.2 যৌগিক গড়ের সুবিধা, অসুবিধা ও ব্যবহার

9.5 মধ্যমান বা মধ্যমা (Median)

9.5.1 বিভিন্ন সূত্রাবলী ও তার প্রয়োগ

9.5.2 উপযুক্ততা, অনুপযুক্ততা ও ব্যবহার

9.6 সংখ্যাগরিষ্ঠ মান বা ভূয়িষ্ঠক (Mode)

9.6.1 বিভিন্ন সূত্রাবলী ও তার প্রয়োগ

9.6.2 সুবিধা ও অসুবিধা

9.7 Mean, Median ও Mode-এর পারস্পরিক সম্পর্ক (Relation) ও তার প্রয়োগ

9.8 প্রশ্নাবলী

9.9 উত্তরমালা

9.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা ঃ

কোনো রাশিতথ্যমালার চলকের মানগুলির নিবেশন (Distribution) পর্যবেক্ষণ পরিসংখ্যান বিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মানগুলির নিবেশন চরিত্রে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রাশির কেন্দ্রীয় প্রবণতা ও তার বিস্তৃতি। রাশির কেন্দ্রীয় প্রবণতা বা মধ্যগামিতা (Central tendency) হল মানগুলির একটি কেন্দ্রীয় মান বা গড় মানের অবস্থান নির্ণয় করা। কেন্দ্রীয় মান বা গড় মান (Average) হল সংগৃহীত রাশিতথ্যের এমন একটি গাণিতিক মান যা ঐ নিবেশনের সব মানগুলির প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতে

পারে। যে সকল পরিমাপকের সাহায্যে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ করা হয় তাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপক (Measures of central tendency) বলে। গড়, মধ্যমা, ভূমিষ্ঠক ইত্যাদি হল কেন্দ্রীয় প্রবণতার বিভিন্ন পরিমাপক। কেন্দ্রীয় মান সর্বদা নিবেশনের মানগুলির অন্তর্বর্তী সংখ্যা এবং একে কেন্দ্র করে অন্য মানগুলি অবস্থান করায় এটি নিবেশন সম্পর্কে একটি গড় ধারণা তৈরি করে।

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- কেন্দ্রীয় প্রবণতার ধারণা করতে পারবেন।
- কেন্দ্রীয় প্রবণতার মাপকগুলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে পারবেন।
- কেন্দ্রীয় প্রবণতার বিভিন্ন পরিমাপকগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- রাশিতথ্যমালার বিশ্লেষণকালে উক্ত পরিমাপকগুলির প্রয়োগ করতে পারবেন।
- কেন্দ্রীয় প্রবণতার বিশ্লেষণোত্তর ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারবেন।

9.2 কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central) / কেন্দ্রিকতা (Tendency)-র বিভিন্ন মাপক সমূহ (Different measures of central tendency) ঃ

কেন্দ্রিকতার মাপকগুলি মূলত তিন প্রকারের। এগুলি হল গড়, মধ্যমা এবং ভূমিষ্ঠক/ভৃষক। গড় পরিমাপকটি পুনরায় তিন প্রকারের হয়, যথা—গাণিতিক গড়/সমক গড়, জ্যামিতিক গড় এবং বিবর্ত যৌগিক গড়/সমঞ্জস গড়। তবে আলোচ্য অংশে গড় বলতে আমরা গাণিতিক গড়কেই বোঝাবো। নিম্নে ছকের সাহায্যে বিভিন্ন পরিমাপকগুলি দেখানো হল ঃ

পরবর্তী অধ্যায়ে গাণিতিক গড়, মধ্যমা ও ভৃষক সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে। আলোচ্য অংশে জ্যামিতিক গড় ও সমঞ্জস গড় সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

● জ্যামিতিক গড় ঃ কোনো একটি চলক-এর n সংখ্যক পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে n সংখ্যক পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত মানগুলির গুণফলের n-তম root-ই হল চলকটির জ্যামিতিক গড়, অর্থাৎ n সংখ্যক পর্যবেক্ষণগুলি $x_1, x_2, x_3, ..., x_n$ হলে জ্যামিতিক গড় $\sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times x_3 \times ..... \times x_n} = (x_1 \times x_2 \times ..... \times x_n)^{1/n}$ ।

জ্যামিতিক গড়কে সাধারণত $\bar{X}_g$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একে লগারিদম্ এ প্রকাশ করা হয়—

$$\log \bar{x}_g = \frac{1}{n}[\log x_1 + \log x_2 + \log x_3 + \ldots\ldots + \log x_n]$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \log x_1$$

$$\therefore \bar{X}_g = \text{Anti log}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \log x_i\right]$$

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল প্রত্যেকটি পর্যবেক্ষণের লগারিদ্মগুলির গাণিতিক গড়ই হল জ্যামিতিক গড়।

$x_1, x_2, x_3, \ldots\ldots, x_n$ পর্যবেক্ষণগুলির যথাক্রমে $f_1, f_2, f_3, \ldots\ldots f_n$, অর্থাৎ অবনীকৃত (ungrouped) পরিসংখ্যা নিবেশনে উপস্থিত থাকলে সেক্ষেত্রে জ্যামিতিক গড়

$$\bar{X}_g = \sqrt[n]{x_1^{f_1} \times x_2^{f_2} \times x_3^{f_3} \times \ldots\ldots \times x_n^{f_n}}$$

বা, $\bar{X}_g = \left[x_1^{f_1} \times x_2^{f_2} \times x_3^{f_3} \times \ldots\ldots \times x_n^{f_n}\right]^{1/n}$ হবে।

$$\therefore \log \bar{X}_g = \frac{1}{n}[f_1 \log x_1 + f_2 \log x_2 + f_3 \log x_3 + \ldots\ldots + f_n \log x_n]$$

বা, $= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} f_i \log x_i$

বা, $\bar{X}_g = \text{Anti log}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \log x_i\right]$

জ্যামিতিক গড়ের ক্ষেত্রে একটি বিষয় সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, তা হল এই গণনার ক্ষেত্রে সমস্ত পর্যবেক্ষণগুলিকে ধনাত্মক হতে হবে অর্থাৎ 0 অপেক্ষা বড় হতে হবে।

সাধারণত অনুপাত, হার বা শতকরার গড় নির্ণয় কালে এই পরিমাপকটির প্রয়োগ করা হয়। জীববিদ্যায় জীবের বৃদ্ধির বা অনুজীববিদ্যার ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেনের গড় পরিমাপক জ্যামিতিক গড় দ্বারাই গণনা করা য়ে থাকে।

● **সমঞ্জস গড় ঃ** কোনো চলক-এর n সংখ্যক পর্যবেক্ষণের অনোন্যকগুলির (reciprocals)-এর গাণিতিক গড়। এর অনোন্যককে সমঞ্জস গড় বলে।

সুতরাং, $x_1, x_2, x_3, \ldots\ldots x_n$ পর্যবেক্ষণে

$$HM = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{x_3} + \ldots\ldots + \frac{1}{x_n}} = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i}}$$

সমঞ্জস গড়কে সাধারণত $\overline{X}_4$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। $x_1, x_2, x_3, \ldots\ldots, x_n$ পর্যবেক্ষণগুলি যথাক্রমে $f_1, f_2, f_3, \ldots\ldots, f_n$ frequence-তে উপস্থিত থাকলে অর্থাৎ অবনীকৃত পরিসংখ্যা নিবেশনের-এর ক্ষেত্রে

$$\overline{X}_n = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{f_i}{x_i}}$$

সমঞ্জস গড়ের প্রয়োগ খুব কম ক্ষেত্রে করা হয়। সমঞ্জস গড় ক্ষুদ্রতম মানকে সর্বাপেক্ষা বেশি এবং বৃহত্তম মানকে সবচেয়ে কম গুরুত্ব দেয়। সে কারণে কোনো নিবেশন পর n-এর মান কম হলে এবং সেখানে এককের মান বেশ বড় ও বেশ ছোট হলে সেখানে HM -এর প্রয়োগ করা যায়।

9.3 কেন্দ্রিকতার উপযুক্ত পরিমাপকের গুণাবলী

সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক G. U. Yule-এর মতানুযায়ী চলকের কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপকারী উপযুক্ত পরিমাপকের নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় গুণাবলী থাকা একান্ত আবশ্যক ঃ

(1) এর সংজ্ঞা সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন। অর্থাৎ এর সংজ্ঞাটি পরিষ্কার ভাবে অনুধাবনযোগ্য হবে। এটি দ্ব্যর্থক হবে না অর্থাৎ সকলের কাছে এটি একটিই অর্থ বহন করবে।

(2) এটি সহজবোধ্য হবে এবং সহজ গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয়যোগ্য হবে— এর অর্থ এমন হওয়া উচিত যাতে গণিতজ্ঞ ও যাঁরা গণিতজ্ঞ নন সকলের কাছেই এটি বোধগম্য হয়। এর নির্ণয় প্রক্রিয়াও তাই অবশ্যই সহজ হওয়া উচিত।

(3) পর্যবেক্ষণকারী সকল মানগুলি নির্ণয় প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হবে—অর্থাৎ পরিমাপকটির হিসাবকালে সমস্ত মানগুলির অংশগ্রহণ আবশ্যিক হবে।

(4) এটি পুনরায় পরবর্তী গাণিতিক বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হবে—অর্থাৎ কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপকটি বিভিন্ন গাণিতিক বিশ্লেষণের উপযুক্ত হবে।

(5) মানের নমুনা সংগ্রহকালীন তারতম্যে এটির মানের সামান্যতম পরিবর্তন হবে—কোনো চলক (variable)-এর মানগুলি নমুনা সংগ্রহকালে কখনো কখনো পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনে মাপকটির মান সামান্যতম পরিবর্তিত হলে সেই পরিমাপককে উপযুক্ত গণ্য করা হয়।

(6) প্রান্তীয় মানগুলিকে অসঙ্গতভাবে প্রভাবিত করতে পারবে না।

9.4 যৌগিক গড় (Mean or Arithmetic mean)

কোনো একটি চল বা variable-এর রাশিগুলির কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপক হিসাবে যৌগিক গড় অন্যতম। কোনো নির্দিষ্ট চলের সংখ্যাগুলির সমষ্টিকে রাশিগুলির মোট সংখ্যার মান দ্বারা ভাগ করলে প্রাপ্ত ভাগফলকেই ঐ চল বা রাশির যৌগিক গড় বলা হয়।

9.4.1 যৌগিক গড়ের সূত্রাবলী ও তার প্রয়োগ ঃ

(ক) অশোধিত রাশিতথ্যের যৌগিক গড় (Mean of raw data) ঃ

রাশিতথ্য অবিন্যস্ত অবস্থায় সংগৃহীত হয় পরে পদ্ধতি অনুযায়ী এই তথ্য পুনর্বিন্যস্ত করা হয়। অবিন্যস্ত রাশিতথ্যকে বলা হয় "অশোধিতত রাশিতথ্য"।

অশোধিত রাশিতথ্যের ক্ষেত্রে রাশিগুলির পরিসংখ্যান বা frequency বিবেচনা করা হয়। সংখ্যাগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে বিবেচনা করা হয়।

যদি $x_1, x_2, x_3 \ldots\ldots\ldots\ldots x_n$ রাশিগুলি n সংখ্যায় থাকে তবে যৌগিক গড় বা $\bar{x}$ কে নিম্নলিখিত সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \ldots\ldots + x_n}{n}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$$

উদাহরণ 1 ঃ কোনো একটি পরীক্ষায় পরিসংখ্যান বিদ্যা বিষয়ে 5-টি ছাত্রের নিম্নলিখিত প্রাপ্ত মানের যৌগিক গড় নির্ণয় করুন ?

প্রাপ্তমান ঃ 50, 55, 62, 65, 68.

সমাধান ঃ ধরি $\bar{x}$ হল ছাত্রদের প্রাপ্ত মানের যৌগিক গড়।

$\therefore$ ছাত্রদের প্রাপ্ত মানগুলির বা অবেক্ষণ সমূহের (observations) যোগফল $= 50 + 55 + 62 + 65 + 68 = 300 = \sum x$

$\therefore$ ছাত্র সংখ্যা $= 5 = n$

$\therefore$ যৌগিক গড় $\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = \frac{300}{5} = 60$

অশোধিত রাশিতথ্যের যৌগিক গড়কে সরল যৌগিক গড়ও বলে।

(খ) শোধিত ও গোষ্ঠীযুক্ত রাশিতথ্যের যৌগিক গড় (Mean of grouped data) ঃ

গোষ্ঠীযুক্ত রাশিতথ্যের চলসংখ্যার পরিসংখ্যানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কোনো একটি পর্যবেক্ষণ তথ্যমালায় একটি পর্যবেক্ষণ যতবার আবর্তিত হয় তাকেই সংক্ষেপে ঐ পর্যবেক্ষণের frequency বা পরিসংখ্যা বলা হয়।

যেমন বিজ্ঞান বিষয়ে কোনো পরীক্ষায় 10 জন ছাত্র প্রত্যেকে 60 নম্বর করে পেয়ে থাকলে 60 পর্যবেক্ষণের পরিসংখ্যা (f) হল 10.

মনে করুন $x_1, x_2, x_3, \ldots\ldots\ldots x_n$ পর্যবেক্ষণগুলি যথাক্রমে $f_1, f_2, f_3 \ldots\ldots f_x$ পরিসংখ্যানে আছে। তবে সেই পর্যবেক্ষণগুলির যৌগিক গড় বা $\bar{x}$ নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা প্রকাশিত হবে।

$$\bar{x} = \frac{f_1x_1 + f_2x_2 + f_3x_3 + \ldots\ldots + f_nx_n}{f_1 + f_2 + f_3 + \ldots\ldots + f_n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} f_ix_i}{\sum f_i} = \frac{\sum_{i=1}^{n} f_ix_i}{N}$$

যেখানে $N = f_1 + f_2 + f_3 + \ldots\ldots + f_n$

উদাহরণ 2 : কোনো একটি বিদ্যালয়ের 10ম শ্রেণীর 30 জন ছাত্রের ওজন নিম্নের পরিসংখ্যান ছকে দেখানো হল। এদের দেহের ওজনের যৌগিক গড় নির্ণয় করুন।

দেহের ওজন (kg)	52	58	60	65	68	70	75
ছাত্র সংখ্যা	7	5	4	6	3	3	2

সমাধান : ছাত্রের ওজনকে x এবং ছাত্রসংখ্যাকে f ধরে পাই

ওজন (x)	ছাত্র সংখ্যা (f)	fx
52	7	364
58	5	290
60	4	240
65	6	390
68	3	204
70	3	210
75	2	150
মোট	30	1848

এখানে $\sum fx = 1848$ এবং $\sum f = 30 = N$

$\therefore$ যৌগিক গড় $\bar{x} = \frac{\sum fx}{N} = \frac{1848}{30} = 61.6$ kg.

সুতরাং ছাত্রদের ওজনের যৌগিক গড় $\bar{x}$ হল 61.6 kg.

উদাহরণ 3 : নীচের ছকে প্রদত্ত 100 জন ছাত্রের প্রাপ্তমানের যৌগিক গড় নির্ণয় করুন।

প্রাপ্ত নম্বর (x)	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
ছাত্র সংখ্যা (y)	2	7	17	29	29	10	3	2	1

সমাধান : এখানে প্রাপ্ত নম্বরগুলিকে 9টি শ্রেণীতে (class) ভাগ করা হয়েছে যার প্রতিটির প্রথম সংখ্যাটি হল নিম্নশ্রেণী সীমা (lower limit) এবং উপরেরটি হল উচ্চশ্রেণী সীমা (upper limit)। যথা 10-20; এখানে 10 ল নিম্ন ও 20 হল উচ্চশ্রেণী সীমা। এই ধরনের পরিসংখ্যান তথ্যে যৌগিক গড় নির্ণয়কালে প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যবিন্দু (Mid point or class mark) নির্ণয় করা হয়।

$$\text{মধ্যবিন্দু} = \frac{\text{নিম্নশ্রেণী সীমা} + \text{উচ্চশ্রেণী সীমা}}{2}$$

প্রাপ্ত নম্বর	মধ্যবিন্দু (mid value = m)	পরিসংখ্যান (f)	$f.m.$
10-20	15	2	30
20-30	25	7	175
30-40	35	17	595
40-50	45	29	1305
50-60	55	29	1595
60-70	65	10	650
70-80	75	3	225
80-90	85	2	170
90-100	95	1	95
	মোট	100	4840

এখানে $\sum f = N = 100$ এবং $\sum fm = 4840$

যৌগিক গড় $\bar{x} = \frac{\sum fm}{\sum f} = \frac{\sum fm}{N} = \frac{4840}{100} = 48.4$

সুতরাং ছাত্রদের প্রাপ্তমানের যৌগিক গড় 48.4।

9.4.2 যৌগিক গড়ের সুবিধা, অসুবিধা ও ব্যবহার

একটি আদর্শ কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপক হিসাবে যৌগিক গড় অন্যতম। কারণ একটি আদর্শ গড়ের যে সব বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তার অধিকাংশই যৌগিক গড়ে বর্তমান। এই কারণে যৌগিক গড়কে পরিসংখ্যান বিদ্যায় ব্যাপক ভাবে প্রয়োগ করা হয়।

সুবিধা (Merits) ঃ

(1) এটি সহজবোধ্য।

(2) একে খুব সহজেই গণনা করা যায়।

(3) গণনাকালে সমস্ত পর্যবেক্ষণগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(4) এটি যথাযথভাবে গাণিতিক সূত্র দ্বারা প্রকাশযোগ্য।

(5) নমুনা সংগ্রহকালে যে চাঞ্চল্য (sampling fluctuation) বর্তমান থাকে তাহা যৌগিক গড়কে সবচেয়ে কম প্রভাবিত করে।

(6) দুটি বা দুই-এর অধিক রাশি তথ্যমালাকে এর দ্বারা সবচেয়ে ভালোভাবে পরিমাপ করা যায়।

(7) যৌগিক গড়কে পরিসংখ্যান বিদ্যার পরবর্তী গাণিতিক গণনায় সহজেই প্রয়োগ করা যায়।

অসুবিধা (Demerits) ঃ

(1) যৌগিক গড় গণনায় প্রতিটি পর্যবেক্ষণের উপস্থিতি প্রয়োজন। কোনো একটি পর্যবেক্ষণ অনুপস্থিত থাকলে এর গণনা সম্ভব নয়।

(2) পর্যবেক্ষণের বৃহৎ মানগুলি যৌগিক গড়কে প্রভাবিত করে।

(3) খুব শীঘ্র রাশিতথ্যমালা পর্যবেক্ষণ করে যৌগিক গড়ের মান নির্ণয় সম্ভব হয় না।

(4) মুক্ত প্রান্ত শ্রেণী বিশিষ্ট (open end class) রাশিতথ্যমালার ক্ষেত্রে এই গড় নির্ণয় সম্ভব নয়।

ব্যবহার (Uses) ঃ

(1) ব্যবহারিক পরিসংখ্যান বিদ্যায় এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

(2) প্রাককালীন মান (extimates) সর্বদা যৌগিক গড় দ্বারা নির্ণয় করা হয়।

(3) ব্যবসায়ীগণ ব্যবহার ব্যায় (operation cost) নির্ণয় কালে একক প্রতি লাভ, মানুষ প্রতি উৎপাদন বা যন্ত্র প্রতি উৎপাদন, মাসিক গড় আয় ও ব্যয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে যৌগিক গড় প্রয়োগ করে থাকেন।

(4) পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

9.5 মধ্যমান বা মধ্যমা (Median)

মধ্যমা হল চলরাশি তথ্যের কেন্দ্রীয় প্রবণতার অপর একটি পরিমাপ। রাশিতথ্যের পর্যবেক্ষণগুলিকে মানের ঊর্ধ্বক্রমে সজ্জিত করলে রাশিগুলির ঠিক মধ্যস্থানে (middle-most of central value) অবস্থিত সংখ্যা মানকে মধ্যমা বা median বা মধ্যমান বলা হয়।

অন্যভাবে বলা যায় রাশিতথ্যমালার যে মানটি ঊর্ধ্বক্রমে সজ্জিত পর্যবেক্ষণগুলিকে সমান দুটি অংশে বিভক্ত করে তাকে মধ্যমা বলা হয়।

9.5.1 মধ্যমানের সূত্রাবলী ও তার প্রয়োগ

(ক) অশোধিত রাশিতথ্যের মধ্যমান নির্ণয় ঃ

অশোধিত রাশিতথ্যের মধ্যমান নির্ণয় কালে মানগুলিকে ঊর্ধ্বক্রমে বা নিম্নক্রমে সজ্জিত করা হয়। n-এর মান জোড় বা বিজোড় সংখ্যা অনুসারে নিম্নলিখিত দুটি ভাবে মধ্যমান নির্ণয় করা হয়।

● 'n'-এর মান যখন বিজোড় ঃ এক্ষেত্রে $\frac{n+1}{2}$ তম অবস্থানে প্রাপ্ত রাশির মানটি মধ্যমান হয়।

∴ মধ্যমান বা $\text{Me} = \frac{n+1}{2}$ তম মান।

উদাহরণ 4 ঃ নিম্নলিখিত সংখ্যাসমূহের মধ্যমান নির্ণয় করুন।

সংখ্যাগুলি হল—2, 7, 3, 5, 6, 4, 9.

সমাধান ঃ পর্যবেক্ষণগুলিকে মানের ঊর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে পাই, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

এখানে $n = 7$

$\therefore$ Median বা Me $= \frac{n+1}{2}$ তম মান

$= \frac{7+1}{2}$ তম মান

$= \frac{8}{2}$ তম মান $= 4$ তম (৪র্থ)

এখানে উর্ধ্বক্রমে সাজানো পর্যবেক্ষণের ৪র্থ মান হল 5

$\therefore$ সংখ্যাগুলির Median বা Me = 5.

● n-এর মান যখন জোড় সংখ্যা ঃ

পর্যবেক্ষণগুলির মানসংখ্যা যখন n তখন দুটি মধ্যস্থ মান পাওয়া যায় যথা $\frac{n}{2}$ তম এবং $\left(\frac{n}{2}+1\right)$ তম মান।

$\therefore$ এক্ষেত্রে মধ্যমান বা median হল উপরি উল্লিখিত দুটি মানের গড় মান।

$\therefore$ Me $= \frac{\frac{n}{2}+\left(\frac{n}{2}+1\right)}{2}$

উদাহরণ 5 ঃ কোনো একটি ক্রিকেট ম্যাচে 10 জন খেলোয়াড়ের রান সংখ্যা যথাক্রমে 5, 19, 42, 61, 30, 21, 0, 52, 36, 27। মধ্যমান নির্ণয় করুন।

সমাধান ঃ উক্ত রাশিতথ্যের মানগুলিকে উর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে পাই, 0, 5, 19, 21, 27, 30, 36, 42, 52, 61

এখানে $n = 10$.

$\therefore$ Me $= \frac{\frac{n}{2}\text{তম}+\left(\frac{n}{2}+1\right)\text{তম মান}}{2}$

$= \frac{\frac{10}{2}\text{তম}+\left(\frac{10}{2}+1\right)\text{মান}}{2}$

$= \frac{5\text{তম}+6\text{ষ্ঠ মান}}{2}$

$= \frac{27+30}{2} = \frac{57}{2} = 28.5$

$\therefore$ মধ্যমান = 28.5.

জোড় সংখ্যার ক্ষেত্রে মধ্যমান সংখ্যা ঐ রাশিতথ্যের মান অপেক্ষা পৃথক হয়।

(খ) শোধিত বা গোষ্ঠীযুক্ত রাশিতথ্যের মধ্যমান নির্ণয় ঃ

কোনো একটি রাশিতথ্যের বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের পরিসংখ্যান বা frequency থাকলে নিম্নলিখিত দুটি উপায়ে মধ্যমান নির্ণয় করা হয়।

নির্দিষ্ট পূর্ণমান চলকের মধ্যমা নির্ণয় ঃ

$x_1, x_2, x_3 \ldots\ldots x_n$ n সংখ্যক পর্যবেক্ষণের পরিসংখ্যাগুলি যথাক্রমে $f_1, f_2, f_3 \ldots\ldots f_n$ হলে এবং $\sum f = n$ হলে নিম্নলিখিত ধাপের দ্বারা মধ্যমান নির্ণয় করা হয়।

(1) প্রথমত পর্যবেক্ষণগুলিকে ঊর্ধ্বক্রমে সাজাতে হয়।

(2) দ্বিতীয়ত পরিসংখ্যাগুলিকে ক্রমযৌগিক লঘিষ্ঠক্রমিকভাবে সাজাতে হয় (Less than cumulative frequency)।

(3) তৃতীয়ত $\frac{n}{2}$ নির্ণয় করতে হয়।

(4) চতুর্থত $\frac{n}{2}$ অপেক্ষা নিকটতম বড় ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যাকে নির্ণয় করতে হয়।

(5) এই পরিসংখ্যা যে পর্যবেক্ষণ মানের জন্য নির্দিষ্ট সেই মানটি মধ্যমান হয়।

উদাহরণ 6 ঃ নিম্নলিখিত রাশিতথ্য থেকে median বা মধ্যমান নির্ণয় করুন।

ছাত্র সংখ্যা ঃ	6	4	16	7	8	2
প্রাপ্ত নম্বর ঃ	21	9	25	50	40	80

সমাধান ঃ ছাত্রদের প্রাপ্ত নম্বরগুলিকে ঊর্ধ্বক্রমে সাজিয়ে নিম্নের ছকটি পাই,

প্রাপ্ত নম্বর (x)	পরিসংখ্যা (f)	Less than cumulative frequency
9	4	4
20	6	10
25	16	26
40	8	34
50	7	41
80	2	43

$n = \sum f = 43.$

এখানে $n = 43.$

$\therefore$ Median বা Me $= \left(\frac{n+1}{2}\right)$ তম মান

$= \left(\frac{43+1}{2}\right)$ তম মান

$= 22$ তম মান।

$\therefore$ 22 অপেক্ষা বড় less than cumulative frequency-এর মান হল 26.

এই 26 মানটি যে x মানের জন্য তার মান হল 25.

$\therefore$ মধ্যমান Me = 25 নম্বর।

অবিচ্ছিন্ন চলকের মধ্যমান নির্ণয় (Continuous varieties) :

রাশিতথ্যমালাকে পরিসংখ্যার ছকে সজ্জিত করলে এবং শ্রেণী (class) ও শ্রেণী অন্তর (class-interval) হিসাবে চলককে দেখালে নিম্নলিখিত ধাপে মধ্যমান নির্ণয় করা হয়।

(i) প্রথমতঃ পরিসংখ্যাগুলিকে ক্রমযৌগিক লঘিষ্ঠ ক্রমানুসারে (less than cumulative frequency) সাজানো হয়।

(ii) দ্বিতীয়তঃ $\frac{n}{2}$ নির্ণয় করা হয়।

(iii) তৃতীয় ধাপে $\frac{n}{2}$-এর মান অপেক্ষা নিকটবর্তী ক্রমযৌগিক লঘিষ্ঠক্রমিক পরিসংখ্যা নির্ধারণ করা হয়। ঐ পরিসংখ্যা যে শ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য সেই শ্রেণীকে মধ্যমান শ্রেণী বলে গণ্য করা হয়।

(iv) অন্তিমধাপে নিম্নলিখিত সূত্র প্রয়োগে মধ্যমান নির্ণয় করা হয়।

$$\therefore \text{Me} = l_1 + \frac{h}{f}\left(\frac{N}{2} - C\right)$$

এখানে Me = নির্ণেয় মধ্যমান

N = $\sum f$ = মোট পরিসংখ্যা

l_1 = মধ্যমান যে শ্রেণীতে অবস্থিত সেই শ্রেণীর নিম্নসীমা।

h = মধ্যমান যে শ্রেণীর সেই শ্রেণীর class interval বা শ্রেণী প্রসারের দৈর্ঘ্য (Width of the median class interval)

C = যে শ্রেণীতে মধ্যমান আছে তার পূর্ববর্তী শ্রেণীর নিম্নগামী ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যান।

উদাহরণ 7 : নীচের ছকে একটি শহরের জনসংখ্যার বয়সের বিস্তৃতি দেওয়া হল। এর মধ্যমান নির্ণয় করুন ?

বয়স (বৎসর)	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70 ও তার উর্ধ্বে
লোকসংখ্যা (হাজার)	2	3	4	3	2	1	2.5	1

সমাধান : গণনাকার্য নীচের ছকে দেখানো হল—

বয়স শ্রেণী	পরিসংখ্যা (f)	নিম্নগামী ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা (LCF)
0-10	2	2
10-20	3	5
20-30	4	9
30-40	3	12
40-50	2	14
50-60	1	15
60-70	2.5	16.5
70 বা তার উর্ধ্বে	1	18.5

$\sum f = N = 18.5$

এখানে $\frac{N}{2} = \frac{18.5}{2} = 9.25$

∴ 9.25-এর ঠিক পরের নিম্নগামী ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা হল 12।

∴ 30-40 হল মধ্যমান শ্রেণী।

∴ নির্ণেয় মধ্যমান $\text{Me} = l_1 + \frac{h}{f}\left(\frac{N}{2} - C\right)$

$\begin{bmatrix} l_1 = 30 \\ h = 40 - 30 = 10 \\ f = 3 \\ c = 9 \end{bmatrix}$

$= 30 + \frac{10}{3}(9.25 - 9)$

$= 30 + \frac{10}{3} \times 0.25$

$= 30 + \frac{10}{3} \times \frac{25}{100} = 30 + \frac{25}{30}$

$= \frac{925}{30} = 30.83$ বছর

∴ মধ্যমানের মান 30.83 বছর।

9.5.2 মধ্যমান ব্যবহারের সুবিধা, অসুবিধা ও ব্যবহার

মধ্যমান ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে।

সুবিধা (Merits) ঃ

(1) এটি যৌগিক গড় অপেক্ষা সহজবোধ্য।

(2) এটির গণনাকার্য যৌগিক গড় অপেক্ষা সহজ।

(3) এটির মান অতি উচ্চ বা অতি নিম্নমানের রাশি দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

(4) এটির মান রাশিতথ্যমালার বিস্তৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

(5) গোষ্ঠীভুক্ত পরিসংখ্যা (grouped frequency)-র ক্ষেত্রে শ্রেণীবিভাগের প্রসারের দৈর্ঘ্যের তারতম্যে এবং মুক্তপ্রান্তীয় শ্রেণী (open-end-class)-র ক্ষেত্রে মধ্যমান প্রভাবিত হয় না। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপে মধ্যমানের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(6) যে সমস্ত চলককে সংখ্যাদ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না অর্থাৎ গুণগত চলকে (attributes)-র ক্ষেত্রে মধ্যমান প্রয়োগে কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ করা যায়।

অসুবিধা (Demerits) ঃ

(1) এটিতে সমস্ত পর্যবেক্ষণগুলির অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন না হলে এটি উপযুক্ত পরিমাপক হিসাবে ব্যবহার করা যায় না।

(2) নমুনা সংগ্রহের চাঞ্চল্য হেতু এর মানের বিশেষ পরিবর্তন হয়।

(3) পরিসংখ্যানবিদ্যার পরবর্তী গণনা কার্যগুলিতে একে প্রয়োগ করা যায় না।

(4) এটি অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত মানকে প্রকাশ করে না।

(5) এর মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রাশিতথ্যমালার প্রত্যেকটি পর্যবেক্ষণের অন্তর্ভুক্তি না হওয়ায় পরিমাপকটি যৌগিক অপেক্ষা কম গ্রহণযোগ্য।

ব্যবহার (Uses) : রাশিবিজ্ঞানের বীজগাণিতিক গণনাকার্যে একে প্রয়োগ করতে না পারার কারণে এর ব্যবহার সীমিত। তবে অপরিমেয় বৈশিষ্ট্যের (attribute) ক্ষেত্রে এটি সর্বোত্তম পরিমাপক হিসাবে গণ্য হয়।

9.6 সংখ্যাগরিষ্ঠ মান বা ভূয়িষ্ঠক (Mode)

সংখ্যাগরিষ্ঠ মান (Mode) হল চল রাশিতথ্যের কেন্দ্রীয় প্রবণতার সর্বাধিক সহজবোধ্য পরিমাপক। রাশিতথ্য-মালায় চলকের যে মানটি সবচেয়ে বেশিবার পাওয়া যায় সেই মানটি হল চলকের সংখ্যাগরিষ্ঠমান বা ভূয়িষ্ঠক।

9.6.1 সংখ্যাগরিষ্ঠমানের সূত্রাবলী ও তার প্রয়োগবিধি :

অশোধিত রাশিতথ্যের ক্ষেত্রে যে মানটি সর্বাপেক্ষা অধিক বার উপস্থিত থাকে সেই মানটি হল ভূয়িষ্ঠক।

উদাহরণস্বরূপ, 10 শিশুর ওজন যথাক্রমে 4, 4, 5, 6, 7, 5; 5, 7, 5 ও 5 কিগ্রা.

এখানে 5 সংখ্যাটি সর্বাধিক পাঁচবার আছে।

∴ সংখ্যাগরিষ্ঠ মান হল 5 কিগ্রা.

শোধিত গণনসাধ্য মানগ্রাহী চলকের ক্ষেত্রে যে মানটি সর্বাধিক পরিসংখ্যা বা ফ্রিকয়েন্সীতে আছে সেটি হল ভূয়িষ্ঠক।

উদাহরণস্বরূপ, 30 cm, 40 cm ও 50 cm উচ্চতার মটর গাছের সংখ্যা যথাক্রমে 14, 28 ও 10, এখানে 40 cm উচ্চতার মটরগাছ সর্বাধিক পরিসংখ্যায় (frequency = 28) আছে।

সুতরাং, 40 cm হল মটর গাছের ভূয়িষ্ঠক বা mode।

অবিচ্ছিন্ন চলকের ক্ষেত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠমান নির্ণয় নিম্নলিখিত দুটি ধাপে করা হয়।

প্রথম ধাপ : অবিচ্ছিন্ন চলরাশি তথ্যমালাকে প্রথমে শ্রেণীবদ্ধ পরিসংখ্যা বিভাজন প্রক্রিয়ায় শ্রেণীবিভাগ করে যে শ্রেণীর পরিসংখ্যা সর্বাধিক তা নির্ণয় করা হয়। এই শ্রেণীটিকে মোডাল শ্রেণী (Modal class) বলা হয়।

দ্বিতীয় ধাপ : মোডাল শ্রেণী নির্ধারণের পর নিম্নলিখিত সূত্র প্রয়োগে সংখ্যাগরিষ্ঠমান নির্ণয় করা হয়।

Mode (Mo) $= l_1 + \frac{h(f_1 - f_0)}{2f_1 - f_0 - f_2}$ এখানে l_1 = মোডাল শ্রেণীর নিম্নসীমা (lower limit)

h = মোডাল শ্রেণীর শ্রেণী প্রসারের দৈর্ঘ্য (class width of modal class)

f_1 = সংখ্যাগুরু মান শ্রেণী বা modal class-এর পরিসংখ্যা

f_0 = সংখ্যাগুরু মান শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর পরিসংখ্যা

f_2 = সংখ্যাগুরু মান শ্রেণীর পরবর্তী শ্রেণীর পরিসংখ্যা

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ (1) অনেক ক্ষেত্রে উপরোক্ত সূত্র সঠিক সংখ্যাগরিষ্ঠমান দিতে অসমর্থ হয়। কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠমান সেক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুমান শ্রেণী (modal class)-তে অবস্থান না করে অন্য শ্রেণীতে থাকে। এধরনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সূত্র প্রয়োগ করা যায় ঃ

$$\text{Mo} = \text{Mode} = l_1 + \frac{h \times (f_0)}{f_0 + f_2}$$

(2) শ্রেণীবিভাগগুলির প্রসারের দৈর্ঘ্য সমান (same class width) হলে তবেই উপরের দেওয়া দুটি সূত্রের প্রয়োগ সম্ভব।

(3) শ্রেণীবিভাগগুলির প্রসারের দৈর্ঘ্য অসমান হলে যৌগিক গড় মধ্যমান ও সংখ্যাগরিষ্ঠমানের যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে তা থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মান নির্ণয় বিধেয়।

সম্পর্কটি হল—

যৌগিক গড় – সংখ্যাগরিষ্ঠমান = 3 (যৌগিক গড় – মধ্যমান)

উদাহরণ 8 ঃ নীচের ছকে ছাত্রদের Biometry পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হল। সংখ্যাগরিষ্ঠমান নির্ণয় করুন।

প্রাপ্ত নম্বর	ছাত্র সংখ্যা
0-5	7
5-10	10
10-15	16
15-20	32
20-25	24

সমাধান ঃ পরিসংখ্যা ছকে 15-20 শ্রেণীর পরিসংখ্যা (frequency) 32, যা সর্বাধিক। সুতরাং 15-20 শ্রেণীটি হল মোডাল শ্রেণী (modal class) বা সংখ্যাগুরু শ্রেণী।

এখানে $l_1 = 15$, $f_1 = 32$, $f_0 = 16$, $f_2 = 24$ এবং $h = 5$

$\therefore$ সংখ্যাগরিষ্ঠমান $= l_1 + \frac{h(f_1 - f_0)}{2f_1 - f_0 - f_2}$

$$= 15 + \frac{5(32-16)}{2\times32-16-24}$$

$$= 15 + \frac{5\times16}{64-40}$$

$$= 15 + \frac{18}{24} = 15 + 3.33 = 18.33$$

∴ নির্ণেয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মান 18.33.

9.6.2 সংখ্যাগরিষ্ঠমানের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা (Merits) :

(1) এটি সহজেই অনুধাবনযোগ্য।

(2) এর মান সহজেই নির্ণয়যোগ্য।

(3) কিছু ক্ষেত্রে কেবল পর্যবেক্ষণ দ্বারাই এর মান নির্ণয় করা যায়।

(4) লেখচিত্রের দ্বারাও এর মান নির্ণীত হয়।

(5) পর্যবেক্ষণের অতি উচ্চমান ও অতি নিম্নমান একে প্রভাবিত করে না।

(6) এর মান রাশিতথ্যমালার বিস্তৃতির উপর নির্ভরশীল নয়।

(7) রাশিতথ্যমালা সংক্ষিপ্ত হলে উপযুক্ত সজ্জাক্রমের (arrangement of data) প্রয়োজন হয় না।

(8) জীববিজ্ঞান সহ অন্যান্য বিজ্ঞান শাখা ও বাণিজ্যিক শাখায় ও দৈনন্দিন জীবনের যৌগিক গড় ও মধ্যমান অপেক্ষক এর প্রয়োগ বেশি।

অসুবিধা (Demerits) :

(1) বিভিন্ন সূত্রের প্রয়োগ সম্ভব বলে এর বিভিন্ন মান পাওয়া যায়, যা গণনাকার্যে অসুবিধার সৃষ্টি করে।

(2) রাশিতথ্যমালার মানগুলির পরিসংখ্যা (frequency) সমান হলে এর প্রয়োগ করা যাবে না বা কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠ মান থাকে না।

(3) পরিসংখ্যানবিদ্যার পরবর্তী গাণিতিক বিশ্লেষণে এর প্রয়োগ সম্ভব নয়।

(4) রাশিতথ্যমালার পরিসংখ্যা কম হলে এর প্রয়োগ তাৎপর্যহীন হয়।

9.7 যৌগিক গড় (Mean), মধ্যমা (Median) ও ভূয়িষ্ঠকের (Mode) পারস্পরিক সম্পর্ক

রাশিতথ্যমালার পর্যবেক্ষণগুলি বিভিন্ন প্রকার নিবেশন বা বিভাজনে (distribution) থাকে। অবিচ্ছিন্ন চলকের ক্ষেত্রে প্রতিসাম্য নিবেশন বা নর্মাল নিবেশন হল এক বিশেষ প্রকার নিবেশন। এ ধরনের

নিবেশন যথাযথ হলে যৌগিক গড়, মধ্যমা ও ভূয়িষ্ঠকের মান পরস্পর সমান হয় (চিত্র - 1ক)। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে

$$\text{Mean} = \text{Median} = \text{Mode}$$

তবে নিবেশন দক্ষিণায়ত অসমপক্ষতা (positive skew) প্রকৃতির হলে নিম্নলিখিত সম্পর্ক দেখা যায়

$\overline{X} > Me > Mo$ (চিত্র-1খ)

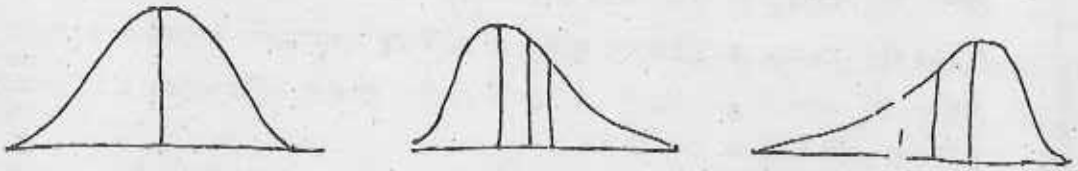

$\overline{X}$ MeMo
প্রতিসাম্য নিকেশন
'ক'

Mo Me $\overline{X}$
দক্ষিণায়ত অসমপক্ষতা
'খ'

$\overline{X}$ MeMo
বামায়ত অসমপক্ষতা
'গ'

চিত্র 1 বিভিন্ন প্রকার অসমপক্ষতায় যৌগিক গড় ($\overline{X}$) , মধ্যমা (Me) ও ভূয়িষ্ঠকের (Mo)-এর অবস্থান।

আবার নিবেশন বামায়ত অসমপক্ষতা (negative skew) প্রদর্শন করলে সম্পর্ক নিম্নরূপ হয় (চিত্র-1গ)

$$Mo > Me > \overline{X}$$

নিবেশন বা বিভাজন চরম অসমপক্ষতায় না থাকলে যৌগিক গড়, মধ্যমা ও ভূয়িষ্ঠকের পারস্পরিক সম্পর্ক নিম্নরূপ ঃ

$$\text{Mean} - \text{Mode} = 3\,(\text{Mean} - \text{Median})$$

বা, $\text{Mode} = 3\,\text{Median} - 2\,\text{Mean}$

উদাহরণ 9 ঃ স্বাভাবিক মানুষের নাড়ীস্পন্দনের হারের যৌগিক গড় ও মধ্যমা যথাক্রমে 72 বার প্রতি মিনিটে এবং 70 বার প্রতি মিনিটে। তবে মানুষের নাড়ীস্পন্দন হারের ভূয়িষ্ঠক মান কত ?

সমাধান ঃ এখানে যৌগিক গড় বা, $\overline{X} = 72$

এবং মধ্যমা বা, $Me = 70$

আমরা জানি $\text{Mode} = 3\,\text{Median} - 2\,\text{Mean}$

$\therefore$ এখানে $\text{Mode} = 3 \times 70 - 2 \times 72$

$= 210 - 144$

$= 66$ বার প্রতি মিনিটে

$\therefore$ নির্ণেয় ভূয়িষ্ঠক 66 বার প্রতি মিনিটে।

9.8 প্রশ্নাবলী

[1] সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(a) চলরাশি তথ্যমালার কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে কি বোঝায় ?

(b) কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপক কাহাকে বলে ? এই পরিমাপকগুলি কি কি ?

(c) যৌগিক গড়, মধ্যমান ও ভূয়িষ্ঠক-এর সংজ্ঞা দিন।

(d) যৌগিক গড়, মধ্যমান ও ভূয়িষ্ঠকের সুবিধা বা অসুবিধার তুলনামূলক আলোচনা করুন।

(e) যৌগিক গড় মধ্যমান ও ভূয়িষ্ঠক এই তিনটি কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপকের মধ্যে কোন্‌টি সর্বাপেক্ষা বেশি প্রচলিত এবং কেন ?

[2] শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(a) প্রতিসাম্য নিবেশনের ক্ষেত্রে যৌগিক গড়, মধ্যমান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মান পরস্পর .... সমান।

(b) নিবেশন দক্ষিণায়ত, অসমপক্ষতা প্রকৃতির হলে যৌগিক গড়ের মান ভূয়িষ্ঠকের মান অপেক্ষা ..... ।

(c) নিবেশন বামায়ত অসমপক্ষতা প্রদর্শন করলে যৌগিক গড়ের মান ভূয়িষ্ঠকের মান অপেক্ষা ..... ।

(d) ভূয়িষ্ঠক $= (3 \times ....) - (2 \times .....)$

(e) মুক্তপ্রান্ত শ্রেণীর বিভাজনে ..... কেন্দ্রীয় পরিমাপক ব্যবহৃত হয়।

[3] দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী ঃ

(a) যৌগিক গড় কি ? অশোধিত রাশিতথ্য, শোধিত ও গোষ্ঠীযুক্ত রাশিতথ্যের যৌগিক গড় কিভাবে নির্ণয় করা হয় ?

(b) একটি গ্রামের ৯৫০ (950) টি পরিবারের শিশু সংখ্যা গণনা নিম্নে দেওয়া হল।

শিশু সংখ্যা No of children	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12
পরিবারের সংখ্যা No of families	272	328	205	120	15	10

(Mean ও Median) (মীন ও মিডিয়ান) নির্ণয় কর।

(c) 1000টি পরিবারে মাসিক প্রোটিন খাদ্যের খাদ্য গ্রহণের মান নিম্নে দেওয়া হল।

প্রোটিন খাদ্য (কেজিতে)	40-60	60-80	80-100	100-120	120-140
পরিবার সংখ্যা	50	f_1	500	f_2	50

এখানে মধ্যমান 87.5 হলে f_1 ও f_2 নির্ণয় করুন।

9.9 উত্তরমালা

অনুশীলনী [1] (a) 9.1

(b) 9.1 ও 9.2

(c) 9.4, 9.5 ও 9.6

(d) 9.4.2, 9.5.2, 9.6.2

(e) 9.4.2, 9.5.2, 9.6.2 পড়ে নিজে তুলনামূলক প্রবন্ধ লিখুন।

অনুশীলনী [2] শূন্যস্থান পূরণ ঃ

(a) — সমান, (b) — বড় (c) — ছোট, (d) 3 × মেডিয়ান — 2 × মীন, (e) — মধ্যমান।

অনুশীলনী [3] (a) 9.4

(b) মীন = 3.54, মেডিয়ান = 3.24

(c) $f_1 = 262.50$

$f_2 = 137.50$

একক 10 ❐ বিস্তৃতি (Dispersion) ও সমক ভ্রান্তি (Standard Error)

গঠন ঃ

10.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

10.2 বিস্তৃতির সংজ্ঞা ও পরিমাপকসমূহ

10.3 উপযুক্ত বিস্তৃতি মাপকের গুণাবলী

10.4 প্রসার (Range)

10.4.1 সংজ্ঞা

10.4.2 সুবিধা ও অসুবিধা

10.5 আন্তঃচতুর্থক অর্ধপ্রসার (Semi interquartile range)

10.5.1 সংজ্ঞা ও সূত্র

10.5.2 নির্ণয় প্রণালী

10.5.3 উদাহরণ

10.5.4 চতুর্থক বিচ্যুতির সুবিধা ও অসুবিধা

10.5.5 চতুর্থক পার্থক্যের গুণাঙ্ক

10.6 গড় বিচ্যুতি (Mean deviation)

10.6.1 সংজ্ঞা

10.6.2 সূত্র

10.6.3 উদাহরণ

10.6.4 গড় বিচ্যুতির সুবিধা ও অসুবিধা

10.6.5 গড় বিচ্যুতির গুণাঙ্ক

10.7 সমক বিচ্যুতি (Standard deviation)

10.7.1 সংজ্ঞা

10.7.2 সূত্র

10.7.3 উদাহরণ

10.7.4 সমক বিচ্যুতির সুবিধা ও অসুবিধা

10.7.5 ভেদমান (Variance) ও ভেদাঙ্ক (Coefficient of variation)

10.8 সমক ভ্রান্তি (Standard error)
10.8.1 সমক ভ্রান্তির সূত্রাবলী
10.8.2 ব্যবহার
10.9 প্রশ্নাবলী
10.10 উত্তরাবলী

6.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা ঃ

আগের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে-কোনো রাশিতথ্যমালার পর্যবেক্ষণগুলি একটি কেন্দ্রীয় মানের চারিপাশে অবস্থান করে। যাকে রাশিতথ্যের কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলে। এই কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপগুলিও পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এখন দুটি পরিসংখ্যা বিভাজন বা রাশিতথ্যমালার কেন্দ্রীয় প্রবণতার মান অনেক ক্ষেত্রে এক হয়। যেমন সৌরভ ও শচীন দুই খেলোয়াড়ের দশটি একদিবসীয় ক্রিকেট ম্যাচের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ ঃ

											মোট রান
সৌরভ :	45,	38,	55,	32,	40,	36,	42,	41,	39,	42	= 400
শচীন :	13,	70,	32,	18,	55,	6,	90,	3,	33,	80	= 400

এখানে প্রত্যেকের রানের যৌগিক গড় 40। আপাতভাবে দুজনেই সমমানের খেলোয়াড়। কিন্তু দুজনের ম্যাচের পরিসংখ্যান বিশেষভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় সৌরভের প্রতিটি ম্যাচের রান সংখ্যা ও রানের যৌগিক গড় সংখ্যার পার্থক্য শচীন অপেক্ষা অনেক কম। অর্থাৎ সৌরভের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণগুলি কেন্দ্রীয় মানের খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে। অপরদিকে শচীনের ক্ষেত্রে এই মানগুলি কেন্দ্রীয় মান থেকে অনেক বেশি বিস্তৃত। কাজেই কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ দিয়ে একটি রাশি তথ্যমালাকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায় না। প্রতিটি মান গড় মানের তুলনায় কিভাবে বিস্তৃত (Scattered) (প্রতিটি মান ও তাদের গড় মানের পার্থক্য কতটা) সেটিও রাশিতথ্যমালায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় মান বা গড়মান থেকে মানগুলির পার্থক্যকে রাশিতথ্যমালার বিস্তৃতি (Dispersion) বলে।

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠ করলে আপনি,

- রাশিতথ্যমালার বিস্তৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাবেন।
- বিস্তৃতির পরিমাপ সমূহ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারবেন।
- বিস্তৃতির পরিমাপগুলির গাণিতিক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- প্রাণিবিদ্যার বিভিন্ন চলরাশির পরিসংখ্যানবিদ্যায় এই পরিমাপের প্রয়োগ করতে পারবেন।

10.2 বিস্তৃতির (Dispersion) সংজ্ঞা ও পরিমাপকসমূহ

কোনো রাশিতথ্যমালার মানগুলি তাদের কেন্দ্রীয় মানের চারিদিকে কিভাবে বিস্তৃত তা যে সংখ্যাগত পরিমাপ দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাকে বিস্তৃতির পরিমাপক (Measures of dispersion) বলে।

বিস্তৃতির পরিমাপসমূহকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—অনাপেক্ষিক পরিমাপক (Absolute measures) ও আপেক্ষিক পরিমাপক (Relative measures)। যে সংখ্যাগত পরিমাপে চলকের এককটি রক্ষিত হয় তাকে অনাপেক্ষিক পরিমাপ বলে। অপরদিকে পরিমাপটি অনুপাত হিসেবে প্রকাশিত হলে এক বিহীন হয় এবং একে আপেক্ষিক পরিমাপ বলে।

নিম্নে বিস্তৃতির বিভিন্ন পরিমাপগুলিকে ছকে প্রকাশ করা হল ঃ

বিস্তৃতির পরিমাপকসমূহ

অনাপেক্ষিক পরিমাপক	আপেক্ষিক পরিমাপক
→ প্রসার (Range)	→ ভেদাঙ্ক বা প্রসার গুণাঙ্ক (Coefficient of variation)
→ আন্তঃচতুর্থক অর্ধপ্রসার (Semi interquartile)	→ চতুর্থক পার্থক্যের গুণাঙ্ক (Coefficient of quartile deviation)
→ গড় বিচ্যুতি (Mean deviation)	→ গড় বিচ্যুতির গুণাঙ্ক (Coefficient of mean deviation)
→ সম্যক বিচ্যুতি বা প্রমাণ বিচ্যুতি (Standard deviation)	

10.3 উপযুক্ত বিস্তৃতির পরিমাপকের গুণাবলী (Requisites of a good measure of dispersion)

একটি উপযুক্ত বিস্তৃতি পরিমাপকের নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা আবশ্যক।

(1) এটির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা থাকবে (rigidly defined)

(2) সহজবোধ্য ও সহজ গণনাযুক্ত হবে (easy to understand and calculate)

(3) রাশিতথ্যমালার সকল মান গণনায় অন্তর্ভুক্ত হবে (based on all observations)

(4) পরিসংখ্যানবিদ্যার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের গণনাকালে একে প্রয়োগ করা যাবে (amenable to further mathematical treatment)

(5) নমুনাসংগ্রহের চাঞ্চল্যে এর মানের পরিবর্তন খুব সামান্য হবে (least affected by sampling fluctuations)

(6) রাশিতথ্যমালা অতি উচ্চ ও অতি নিম্নমান একে প্রভাবিত করবে না (not affected by extreme values)

10.4 প্রসার (Range)

10.4.1 রাশিতথ্যমালার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্নমানের পার্থক্যকে প্রসার বা রেঞ্জ বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, 4 জন পুরুষের ওজন যথাক্রমে 50, 60, 65 ও 70kg হলে প্রসারের মান = (70 – 50) kg = 20 kg.

∴ প্রসার (Range) = সর্বোচ্চ মান – সর্বনিম্ন মান

প্রসার একটি অনাপেক্ষিক পরিমাপক। অপরপক্ষে প্রসার গুণাঙ্ক (Coefficient of range) হল একটি আপেক্ষিক পরিমাপক। এটি নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা প্রকাশ করা হয় ঃ

$$\text{প্রসার গুণাঙ্ক} = \frac{\text{সর্বোচ্চ মান} - \text{সর্বনিম্ন মান}}{\text{সর্বোচ্চ মান} + \text{সর্বনিম্ন মান}}$$

প্রসার গুণাঙ্ক এককবিহীন পরিমাপক।

10.4.2 প্রসারের সুবিধা (Merits) ও অসুবিধা (Demerits)

সুবিধা (Merits) ঃ

(1) এটি সহজবোধ্য ও সহজেই পরিমাপ করা যায়।

(2) কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ দ্বারা এটি নির্মীত হয়।

অসুবিধা (Demerits) ঃ

(1) রাশিতথ্যমালার সব মান ব্যবহৃত হয় না।

(2) মুক্ত প্রান্ত শ্রেণীর ক্ষেত্রে এটিকে ব্যবহার করা যায় না।

(3) পরবর্তী গাণিতিক বিশ্লেষণে এটি ব্যবহার করা যায় না।

(4) নমুনা সংগ্রহের চাঞ্চল্যে এটি প্রভাবিত হয়।

(5) রাশিতথ্যের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের উপর এটি নির্ভর করে।

10.5 আন্তঃচতুর্থক অর্ধপ্রসার বা চতুর্থক বিচ্যুতি

আমরা আগেই জেনেছি যে রাশিতথ্যের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান প্রসারকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। এই ধরনের এটিকে এড়াতে বিস্তৃতির আর একটি পরিমাপ ব্যবহৃত হয়। একে আন্তঃচতুর্থক অর্ধপ্রসার (Semi interquartile range) বা চতুর্থক বিচ্যুতি (Quartile deviation) বলে। এখানে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। অর্থাৎ পরিসংখ্যা বিভাজনের দুইদিকের চতুর্থক (quarter)-কে বাদ দেওয়া হয়।

10.5.1 সংজ্ঞা

উচ্চ চতুর্থক (Upper quartile) ও নিম্ন চতুর্থক (Lower quartile) এর বিয়োগফলের অর্ধাংশকেই আন্তঃচতুর্থক অর্ধপ্রসার বলা হয়।

অর্থাৎ চতুর্থক বিচ্যুতি $= \frac{Q_3 - Q_1}{2}$

যেখানে Q_1 = নিম্ন চতুর্থক Q_3 = উচ্চ চতুর্থক।

$(Q_3 - Q_1)$ হল দুটি চতুর্থকের ব্যবধান। তাই একে আন্তঃচতুর্থক প্রসার এবং এর অর্ধাংশকে আন্তঃচতুর্থক অর্ধপ্রসার বলা হয়।

10.5.2 নির্ণয় প্রণালী

চতুর্থক বিচ্যুতি নির্ণয় নিম্নলিখিতভাবে করা হয়।

(1) রাশিতথ্যমালাকে ঊর্ধ্বক্রমে সজ্জিত করা হয়।

(2) মোট পরিসংখ্যা বা 'N' নির্ণয় করা হয়।

(3) $N/4$ গণনা করা হয় বা নিম্ন চতুর্থক বা Q_1 নামে পরিচিত হয়। এটি নির্ণয়ের পূর্বে পরিসংখ্যাকে নিম্নগামী ক্রমযৌগিক (less than cumulative frequency) অনুসারে সাজাতে হয়।

(4) গোষ্ঠীযুক্ত পরিসংখ্যা বিভাজনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা Q_1 নির্ণয় করা হয়।

$$Q_1 = l + \frac{h}{f}\left(\frac{N}{4} - C\right)$$

যেখানে l = নিম্নসীমা, h = শ্রেণী প্রসারের দৈর্ঘ্য,

f = পরিসংখ্যা (frequency),

c = নিম্ন চতুর্থক শ্রেণীর পূর্ববর্তী শ্রেণীর পরিসংখ্যা।

(5) $\frac{3N}{4}$ নির্ণয় করা হয়। যা উচ্চ চতুর্থক বা Q_3 নামে পরিচিত। গোষ্ঠীযুক্ত পরিসংখ্যা বিভাজনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত সূত্র দ্বারা Q_3 নির্ণীত হয়।

$$\therefore Q_3 = l + \frac{h}{f}\left(\frac{3N}{4} - C\right)$$

(6) পরিশেষে $\frac{Q_3 - Q_1}{2}$ সূত্র দ্বারা চতুর্থক বিচ্যুতি নির্ণয় করা হয়।

10.5.3 উদাহরণ 1

নিম্নের পরিসংখ্যা বিভাজন ছক থেকে চতুর্থক বিচ্যুতি নির্ণয় করুন।

শ্রেণী (Class)	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70
পরিসংখ্যা (Frequency)	4	8	11	15	11	7	4

সমাধান :

x	f	Less than cumnlative frequency (LCF)
0-10	4	4
10-20	8	12
20-30	11	23
30-40	15	38
40-50	11	49
50-60	7	56
60-70	4	60

এখানে $N = \sum f = 60$

$\therefore \frac{N}{4} = \frac{60}{4} = 15$; এটি LCF 12 অপেক্ষা বেশি কিন্তু LCF 13 অপেক্ষা কম। সুতরাং, নিম্ন চতুর্থক শ্রেণী (Lower quartile class) হল $20 - 30$

$$\therefore Q_1 = 20 + \frac{10}{11}(15 - 12)$$
$$= 20 + \frac{30}{11}$$
$$= 20 + 2{\cdot}73 = 22{\cdot}73.$$

এখানে $\frac{3}{4}N = \frac{3}{4} \times 60 = 45$; এটি LCF 38 থেকে বেশি কিন্তু LCF 49 থেকে কম। সুতরাং, উচ্চ চতুর্থক শ্রেণী (Upper quartile class) হল $40 - 50$

$$\therefore Q_3 = 40 + \frac{10}{11}(45 - 38)$$
$$= 40 + \frac{70}{11}$$
$$= 40 + 6{\cdot}36 = 46{\cdot}36$$

$$\therefore \text{চতুর্থক বিচ্যুতি} = \frac{Q_3 - Q_1}{2} = \frac{46{\cdot}36 - 22{\cdot}73}{2}$$
$$= \frac{23{\cdot}63}{2} = 11{\cdot}82$$

$\therefore$ নির্ণেয় চতুর্থক বিচ্যুতি হল $= 11{\cdot}82$

10.5.4 চতুর্থক বিচ্যুতির সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা (Merits) :

(1) এটি সহজবোধ্য ও সহজে নির্ণয়যোগ্য।

(2) এটি প্রসার (rang) পরিমাপক অপেক্ষা ভালো একটি অতি উচ্চ ও অতি নিম্নমান দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

(3) এটি প্রসার অপেক্ষা ভালো পরিমাপক কারণ একটি রাশিতথ্যমালার 50% মানকে অন্তর্ভুক্ত করে।

(4) মুক্ত প্রান্ত শ্রেণীর ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহার করা যায় এবং সেই হিসেবে বিস্তৃতির সকল পরিমাপক অপেক্ষা ভালো।

অসুবিধা (Demerits) :

(1) এটি রাশিতথ্যমালার সব মানকে অন্তর্ভুক্ত করে।

(2) পরিসংখ্যানবিদ্যার পরবর্তী গণনাকার্যে একে ব্যবহার করা যায় না।

(3) নমুনা সংগ্রহের চাঞ্চল্য হেতু এর মানের বিশেষ পরিবর্তন হয়।

10.5.5 চতুর্থক পার্থক্যের গুণাঙ্ক

চতুর্থক বিচ্যুতি একটি অনাপেক্ষিক পরিমাপ। অপরদিকে চতুর্থক পার্থক্যের গুণাঙ্ক (Coefficient of quartile) একটি আপেক্ষিক পরিমাপ। এটি নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

$$\text{চতুর্থক বিচ্যুতি গুণাঙ্ক} = \frac{(Q_3 - Q_1)/2}{(Q_3 + Q_1)/2}$$

$$= \frac{Q_3 - Q_1}{Q_3 + Q_1}$$

10.6 গড় বিচ্যুতি (Mean deviation)

বিস্তৃতির এই পরিমাপে পরিসংখ্যা বিভাজনের যৌগিক গড় বা মধ্যমা থেকে মানসমূহের বিচ্যুতির গড় মানকে ধরা হয়। এখানে বিচ্যুত মানগুলির চিহ্নকে অমান্য করা হয়। অর্থাৎ যৌগিক গড় 6 ও একটি মান 3 হলে বিচ্যুতি $3-6=-3$ না ধরে 3 ধরা হয়। যাকে চরম মান (Absolute value) 3 বলা যায়।

10.6.1 সংজ্ঞা (Definition)

গড় বিচ্যুতি হল একপ্রকার অনাপেক্ষিক বিস্তৃতি পরিমাপক যা কোনো চল রাশিতথ্যমালার যৌগিক গড়, মধ্যমা বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মান থেকে চলকের মানসমূহের চরম পার্থক্যের (Absolute deviation) যৌগিক গড়ের মানের সমান।

10.6.2 সূত্র (Fomula)

$x_1, x_2, x_3 \ldots\ldots\ldots\ldots x_n$, n সংখ্যক পর্যবেক্ষণের মানসমূহের যৌগিক গড় $\overline{X}$ হলে

$$\text{গড় বিচ্যুতি (Mean deviation)} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|x - \overline{X}\right|$$

$x_1, x_2, x_3 \ldots\ldots\ldots\ldots x_n$, n সংখ্যক পর্যবেক্ষণের পরিসংখ্যা যথাক্রমে $f_1, f_2, f_3 \ldots\ldots\ldots\ldots f_n$ হলে

$$\text{গড় বিচ্যুতি} = \frac{1}{n}\sum f\left(\left|x - \overline{X}\right|\right)$$

10.6.3 উদাহরণ 2

নীচের গোষ্ঠীযুক্ত পরিসংখ্যা ছক থেকে গড় বিচ্যুতি নির্ণয় করুন।

শ্রেণী (x)	0 – 4	4 – 8	8 – 12	12 – 16	16 – 20
পরিসংখ্যা (f)	4	6	8	5	2

সমাধান ঃ সূত্র প্রয়োগের পূর্বে নীচের ছকটি দেওয়া হল—

x	f	m (মধ্যমান)	fm	$\overline{X}$	$\lvert m - \overline{X}\rvert$	$f\lvert m - \overline{X}\rvert$
0-4	4	2	8	$\overline{X} = \frac{\sum fm}{n}$	7·2	28·8
4-8	6	6	36	$= \frac{230}{25}$	3·2	19·2
8-12	8	10	80	$= 9{\cdot}2$	0·8	6·4
12-16	5	14	70		4.8	24.0
16-20	2	18	36		8.8	17.6
মোট	25		230			96·0

$\therefore$ গড় বিচ্যুতি $= \frac{\sum f(x - \overline{X})}{n}$

$= \frac{96}{25} = 3{\cdot}84$

$\therefore$ নির্ণেয় গড় বিচ্যুতি 3·84.

10.6.4 গড় বিচ্যুতির সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা **(Merits)** ঃ

(1) এটির সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া যায়।

(2) এটি সহজবোধ্য ও গণনা সাধ্য।

(3) এটি রাশিতথ্যমালার সব মানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

(4) এটি অতি উচ্চ ও অতি নিম্নমানের দ্বারা কম প্রভাবিত হয়।

(5) এটি কেন্দ্রীয় মান থেকে বিচ্যুতি প্রদর্শন করে বলে বিভিন্ন নিবেশনের (distribution) তুলনা করা যায়।

অসুবিধা **(Demerits)** ঃ

(1) এটি নির্ধারণকালে বিচ্যুতির চিহ্নকে অগ্রাহ্য করা হয় বলে এর মধ্যে কৃত্রিমতা প্রকাশ পায় এবং এটিকে পরবর্তী গণনাকার্যে ব্যবহার করা যায় না।

(2) গড় বিচ্যুতির ক্ষেত্রে মধ্যমানকে গণনা কার্যে ধরলে গড় বিচ্যুতির সর্বাপেক্ষা ভালো মান পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যমান নিজেই কেন্দ্রীয় প্রবণতার সঠিক পরিমাপক নয়।

(3) মুক্ত প্রান্ত শ্রেণীর ক্ষেত্রে এর দ্বারা বিস্তৃতি পরিমাপ সম্ভব নয়।

(4) সমাজ বিজ্ঞানে এটি সাধারণত প্রয়োগ করা হয় না।

10.6.5 গড় বিচ্যুতির গুণাঙ্ক (Coefficient of mean deviation)

গড় বিচ্যুতির সাপেক্ষে বিস্তৃতির আপেক্ষিক পরিমাপ (Relative measure) হলে গড় বিচ্যুতির গুণাঙ্ক।

(1) গড় বিচ্যুতির গুণাঙ্ক $= \frac{\text{যৌগিক গড় থেকে গড় বিচ্যুতি}}{\text{যৌগিক গড়}}$

(2) গড় বিচ্যুতির গুণাঙ্ক $= \frac{\text{মধ্যমান থেকে গড় বিচ্যুতি}}{\text{মধ্যমান}}$

10.7 সমক বিচ্যুতি বা প্রমাণ বিচ্যুতি (Standard deviation)

কেন্দ্রীয় মানের চতুর্দিকে রাশিতথ্যমালার মানগুলির বিচ্যুতি পরিমাপকালে সমক বিচ্যুতি একটি প্রমাণ পরিমাপক হিসেবে গণ্য হয়।

এটি পরিমাপ কালে বিচ্যুতির চিহ্নকে উপেক্ষা করা হয় না। তাই এটি গড় বিচ্যুতির অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য।

10.7.1 সংজ্ঞা

কোনো একটি রাশিতথ্যমালার মানগুলি সমক বিচ্যুতি বলতে আমরা যৌগিক গড় থেকে মানগুলির বিচ্যুতির বর্গের গড়ের বর্গমূলকে বুঝি। সংক্ষেপে তাই একে "গড় হইতে বিচ্যুতির বর্গের গড়" বা "রুট মিন স্কোয়ার ডিভিয়েশন ফ্রম্ মিন" বলা হয়।

10.7.2 সূত্র

$x_1, x_2, x_3 \ldots\ldots\ldots\ldots x_n$, n সংখ্যক পর্যবেক্ষণের যৌগিক গড় $\overline{X}$ হলে, সম্যক বিচ্যুতি $= \sqrt{\frac{\sum(x-\overline{X})^2}{n}}$ সমক বিচ্যুতিকে গ্রীক বর্ণমালার σ(sigma) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$x_1, x_2, x_3 \ldots\ldots\ldots\ldots x_n$ সংখ্যক পর্যবেক্ষণের পরিসংখ্যা যথাক্রমে $f_1, f_2, f_3 \ldots\ldots\ldots\ldots f_n$ হলে (যেখানে $\sum f = n$)

সমক বিচ্যুতি $= \sqrt{\frac{\sum f(x-\overline{X})^2}{n}}$

সমক বিচ্যুতিকে অন্যসূত্র দ্বারাও প্রকাশ করা যায় ঃ

(1) সমক বিচ্যুতি $(\sigma) = \sqrt{\frac{\sum x^2}{n} - \left(\frac{\sum x}{n}\right)^2} = \sqrt{\frac{\sum x^2}{n} - (\overline{X})^2}$

(2) সমক বিচ্যুতি $= \sqrt{\frac{\sum fx^2}{n} - \left(\frac{\sum fx}{n}\right)^2}$

$= \sqrt{\frac{\sum fx^2}{n} - (\overline{X})^2}$ [যেখানে $\sum f = n$]

10.7.3 উদাহরণ 3

একই প্রজাতির চারটি পতঙ্গের সন্ধিপদের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 16, 13, 17, 22 মি.মি। পায়ের দৈর্ঘ্যের সমক বিচ্যুতি (Standard deviation) নির্ণয় করুন।

সমাধান ঃ এখানে পায়ের যৌগিক গড় $\overline{X} = \frac{\sum x}{n} = \frac{16+13+17+22}{4}$

$= \frac{68}{4} = 17$ mm.

x	$\overline{X}$	$x - \overline{X}$	$(x - \overline{X})^2$
13		−4	16
16	17	−1	1
17		0	0
22		+5	25
$n = 4$			42

$\therefore \sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \overline{X})^2}{n}} = \sqrt{\frac{42}{4}} = 3{\cdot}2$ mm.

$\therefore$ ঐ পতঙ্গের সন্ধিপদের সমক বিচ্যুতি 3·2 mm.

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি দ্বারা সমাধান ঃ

x	$\overline{X}$	x^2
13		169
16	17	256
17		289
22		484
$n = 4$		1198

$$\therefore \sigma = \sqrt{\frac{\sum x^2}{n} - (\bar{X})^2}$$

$$= \sqrt{\frac{1198}{4} - 289}$$

$$= \sqrt{299 \cdot 5 - 289} = \sqrt{10 \cdot 5} = 3 \cdot 2\text{mm.}$$

10.7.4 সমক বিচ্যুতির সুবিধা অসুবিধা

সুবিধা (Merits) ঃ

(1) এর সংজ্ঞা সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়।

(2) এটি রাশিতথ্যমালার সব মানকে অন্তর্ভুক্ত করে।

(3) এটি বিচ্যুতির ক্ষেত্রে চিহ্নকে উপেক্ষা করে না বলে পরিসংখ্যান বিদ্যারই পরবর্তী গণনাকালে এর বহুল প্রচলন আছে।

(4) এটি সহপরিবর্তন (Co-relation) বা সহগতির ক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়।

(5) এটির মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই।

(6) নমুনা চাঞ্চল্যে এর মান সর্বাপেক্ষা কম প্রভাবিত হয়।

(7) দুই বা ততোধিক পরিসংখ্যা শ্রেণীর মিলিত বিস্তৃতি পরিমাপ কালে (Combined dispersion) এটি ব্যবহৃত হয়।

অসুবিধা (Demerits) ঃ

(1) এটির গণনা করা অপেক্ষাকৃত কঠিন।

(2) এটি খুব সহজবোধ্য নয়।

(3) এটি অতি উচ্চ ও নিম্ন মানকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

10.7.5 ভেদমান (Variance) এবং ভেদাঙ্ক (Coefficient of variation)

সমক বিচ্যুতির বর্গ করলে যে মানটি পাওয়া যায় তাকে রাশিতথ্যমালার ভেদমান বলে।

$$\therefore \quad \text{ভেদমান } \sigma^2 = \frac{\sum (x - \bar{X})^2}{n}$$

সমক বিচ্যুতির সাহায্যে বিস্তৃতির একটি আপেক্ষিক মান পাওয়া যায় সম্ভব যাকে ভেদাঙ্ক বলে।

$$\text{ভেদাঙ্ক} = \frac{\text{সমক বিচ্যুতি}}{\text{যৌগিক গড়}} \times 100$$

10.8 সমক ভ্রান্তি (Standard error)

নমুনাজ নিবেশনের (Sampling distribution) দুটি প্রয়োজনীয় ধর্ম হল গড় বা যৌগিক গড় (mean) এবং সমক বিচ্যুতি (Standard deviation)। এর প্রথমটি নিবেশনের অবস্থান নির্ণয়ে সাহায্যকারী এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ সমক বিচ্যুতি নিবেশনের বিস্তৃতি নির্ধারক। এ দুটি ছাড়াও আর একটি পরিমাপের অবতারণা করা হয়। যাকে সমক ভ্রান্ত বা Standard error বলে। কোনো একটি নমুনাঙ্কের (Statistic) সমক বিচ্যুতিকে নিবেশনের সমক ভ্রান্তি বলে। কাজেই নমুনাজ নিবেশনের সমক বিচ্যুতিকেই সমক ভ্রান্তি (Standard error) বলা হয়।

10.8.1 সমক ভ্রান্তির সূত্রাবলী

অসীম পূর্ণক (Infinite population)-এর ক্ষেত্রে সমক ভ্রান্তি নির্ণয়ে সাধারণত নিম্নলিখিত গাণিতিক সূত্র প্রয়োগ করা হয় ঃ

(1) যৌগিক গড়ের সমক ভ্রান্তি $(SE_{\bar{x}}) = \frac{\text{সমক বিচ্যুতি}}{\sqrt{n}}$ [n = পর্যবেক্ষণ সংখ্যা]

$$= \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

(2) সমক বিচ্যুতির সমক ভ্রান্তি $(SE_{\sigma}) = \frac{\text{সমক বিচ্যুতি}}{\sqrt{2n}}$

$$= \frac{\sigma}{\sqrt{2n}}$$

(3) ভেদাঙ্কের সমক ভ্রান্তি $(SE_{cor}) = \frac{\text{ভেদাঙ্ক}}{\sqrt{2n}}$

10.8.2 ব্যবহার (Utility)

(1) কোনো প্রকল্পকে (Hypothesis) বিচার (Test) কালে এটি একটি প্রয়োজনীয় পরিমাপ। এক্ষেত্রে প্রকল্পকে 5% সংশয়মাত্রায় বিচার করা হয়।

(2) কোনো নমুনার (Sample) বিশ্বাসযোগ্যতার অভাবে (Unreliability) ধারণা সমক ভ্রান্তি দ্বারা করা হয়।

(3) $\frac{1}{\text{সমক ভ্রান্তি}}$ অপর দিকে নমুনার বিশ্বাসযোগ্যতার মাপকাঠি।

10.9 প্রশ্নাবলী

(1) সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(a) চলরাশি তথ্যমালার বিস্তৃতি কি ? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন ?

(b) বিস্তৃতির পরিমাপক বলতে কি বোঝায় ?

(c) বিস্তৃতির অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিক পরিমাপক কি ? এইগুলির প্রত্যেকটির প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।

(d) উপরোক্ত বিস্তৃতিতে পরিমাপকের কি কি গুণাবলী থাকা প্রয়োজন ?

(e) চতুর্থক বিচ্যুতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

(f) গড় বিচ্যুতির সংজ্ঞা দিন। এর সূত্রগুলি আলোচনা করুন।

(g) সমক ভ্রান্তি কি ? এর সম্পর্কে কি কি জানেন আলোচনা করুন।

(2) সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(a) প্রসার = মান — (.....)

(b) প্রসার নির্ণয়ে রাশিতথ্যমালার সব মান ব্যবহৃত ..... ।

(c) গড় বিচ্যুতি পরিমাপে বিচ্যুতমানগুলির চিহ্নকে ..... করা হয় ?

(d) সমক বিচ্যুতি = ...

(e) যৌগিক গড়ের সমক ভ্রান্তি = ...

(f) ভেদমান = ...

(3) দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন

(a) সমক বিচ্যুতি বলতে কি বোঝেন ? ইহার সুবিধা অসুবিধাগুলি কি কি ?

10টি *Patella vulgaris* পাথুরে সমুদ্রতীরে যে গোলাকার স্থান আবদ্ধ থাকে তার ব্যাস ও প্যাটেলার সংখ্যা নীচের ছকে দেওয়া হল ঃ

আবদ্ধ স্থানের ব্যাস (mm)	34	36	37	39	41	43
প্যাটেলার সংখ্যা	1	2	2	2	2	1

Mean ও Standard deviation নির্ণয় করুন।

(b) বিভিন্ন প্রকার অনাপেক্ষিক ও আপেক্ষিক বিস্তৃতির পরিমাপ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

10.10 উত্তরমালা

অনুশীলনী

[1] (a) 10.1

(b) 10.2

(c) 10.2

(d) 10.2.1

(e) 10.4

(f) 10.5.1

(g) 10.7

[2] (a) সর্বনিম্ন

(b) হয় না

(c) অমান্য করা

(d) $\sqrt{\frac{\sum(x-\bar{X})^2}{n}}$

(e) $\frac{\text{সমক বিচ্যুতি}}{\sqrt{n}}$

(f) $\sigma^2 = (\text{সমক বিচ্যুতি})^2$

[3] (a) 10.6

যৌগিক গড় = 38.3 mm.

sd = 2.65 mm

(b) 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6

একক 11 ❐ সম্ভাবনা (Probability)

গঠন ঃ

11.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

11.2 আবশ্যিকতা (Necessity) ও সম্ভাব্যতা (Chance)

11.3 সম্ভাবনা সম্পর্কিত পরিভাষা

11.3.1 প্রচেষ্টা (Trial)

11.3.2 নমুনাদেশ (Sample space)

11.3.3 গনন সাধ্য ও অবিচ্ছিন্ন নমুনাদেশ

11.3.4 ঘটনা (Event)

11.3.4.1 মুখ্য ঘটনা ও সাধারণ ঘটনা (Null event & Simple event)

11.3.4.2 যৌগিক ঘটনা (Compound event)

11.3.4.3 সামগ্রিক ঘটনা (Exhaustive event)

11.3.4.4 পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা (Mutually exclusive event)

11.3.4.5 সমসম্ভাব্য ঘটনা (Equaly likely event)

11.3.4.6 অনপেক্ষ (Independent) ও সাপেক্ষ (Dependent)

11.3.4.7 সর্তসাপেক্ষ ও পরস্পর অনপেক্ষ সম্ভাবনা ঘটনা

11.4 সম্ভাবনার সংজ্ঞা

11.5 সম্ভাবনা সম্পর্কিত উপপাদ্য সমূহ

11.5.1 সংযোজন উপপাদ্য (Addition theorem)

11.5.2 গুণন উপপাদ্য (Multiplicative theorem)

11.6 সারাংশ

11.7 অনুশীলনী

11.8 উত্তরমালা

11.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা ঃ

রাশি বিজ্ঞানে সম্ভাবনা তত্ত্বের জন্ম মূলত gambling theory বা জুয়াসেলার তত্ত্ব থেকে হয়েছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক ঘটনাই সম্ভাব্যতার খেলা মাত্র। যেমন মুদ্রার টসিং (Tossing of coins), পাশার চাল, তাসখেলা প্রভৃতি। পরবর্তীকালে এই সম্ভাবনা তত্ত্বকে গণিতের চাহিদা সংক্রান্ত ধারণার সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং বিজ্ঞানী বারনোলী (Bernoulli) সম্ভাবনা তত্ত্বকে বিভিন্ন শাখায় প্রয়োগ করেন এবং বর্তমানে এটি প্রয়োগিক গণিত বিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে পরিগণিত হয়। বাণিজ্য, বিজ্ঞান অর্থনীতি শাখায় এর প্রয়োগ সর্বজনবিদিত।

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠ করলে আপনি—

(1) সম্ভাবনার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারবেন।

(2) সম্ভাবনা তত্ত্বের বিভিন্ন পরিভাষা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।

(3) সম্ভাবনা সম্পর্কিত উপপাদ্যগুলি জানতে পারবেন।

(4) সম্ভাবনা সম্পর্কিত উপপাদ্যগুলিকে ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারবেন।

11.2. আবশ্যিকতা (Necessity) ও সম্ভাব্যতা (Chance)

সম্ভাবনার সংজ্ঞা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কালে দুটি শব্দ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এগুলি হল আবশ্যিকতা (Necessity) ও সম্ভাব্যতা (Chance)।

আবশ্যিকতা (Necessity) ঃ হাত থেকে কোনো বস্তুকে উপরে ছুঁড়লে সেটি মাটিতে এসে পড়ে। অর্থাৎ যে ঘটনাটির পরিণাম নিশ্চিতভাবে জানা যায় তাকে আবশ্যিকতা বলে। যেমন জলে পর্যাপ্ত তাপ দিলে এটি অবশ্যই বাষ্পে পরিণত হবে।

সম্ভাব্যতা (Chance) ঃ লুডো খেলার সময় লুডোর ঘুঁটি নিক্ষেপ করলে এক থেকে ছয়ের মধ্যে যে-কোনো সংখ্যা উপরিতলে থাকতে পারে। কিন্তু কোন্‌টি থাকবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। যে ঘটনার পরিণাম নিশ্চিতভাবে নির্মিত হয় না তাকেই সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌গণ সম্ভাব্যতা আখ্যা দেন।

11.3 সম্ভাবনা সম্পর্কিত পরিভাষা

সম্ভাবনা তত্ত্ব ব্যাখ্যার পূর্বে কয়েকটি পরিভাষা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। এগুলি হল—

11.3.1 প্রচেষ্টা (Trial or random experiment)

একটি পরীক্ষাকালে যদি তার অন্তর্গত পর্যবেক্ষণগুলির কোন্‌টি উপস্থিত হবে তা নিশ্চিতভাবে

জানা যায় না কিন্তু কোন্‌টি উপস্থিত হবে তা সংখ্যাতাত্ত্বিক নিয়ম মানে তখন তাকে প্রচেষ্টা বা পরীক্ষণ বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মুদ্রা টস্ করা।

11.3.3 নমুনাদেশ (Sample space)

একটি পরীক্ষার অন্তর্গত সব পর্যবেক্ষণগুলিকে একত্রে প্রচেষ্টার নমুনাদেশ বলা হয়।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যদি আমরা একটি মুদ্রাকে টস করি এবং তার হেড দিক্‌টিকে। দ্বারা ও (Tail) টেল ধারটিকে '0' দ্বারা প্রকাশ করি তবে 1, 0 একত্রে প্রচেষ্টার নমুনাদেশ হিসেবে ধরা হয়।

11.3.3 গনন সাধ্য এবং অবিচ্ছিন্ন নমুনাদেশ

একটি নমুনাদেশের গণকগুলি সসীম বা অসীম হওয়া সত্ত্বেও গণনাসাধ্য হয় তখন তাকে গননসাধ্য নমুনাদেশ বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটি মুদ্রার হেডকে উপরে রাখার জন্য যত বেশি বার টস করা যায় তখন পরিণামগুলি ধারাবাহিকভাবে 1; (0, 1); (1, 0, 1); (0, 0, 0, 1) প্রভৃতি প্রকৃতির হয় এবং এগুলি গণন সাধ্য নমুনাদেশ হিসেবে বিবেচিত হয়।

অপরদিকে যে নমুনাদেশের গণকগুলি অসীম এবং অগননযোগ্য হয় তাকে অ-নমুনাদেশ বলে। এক্ষেত্রে নমুনা বিন্দুগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে সজ্জিত থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একটি তলের বিন্দুসমূহ।

11.3.4 ঘটনা

একটি প্রচেষ্টা বা ট্রায়ালে একটি সম্ভাব্য পরিণামকে সেই প্রচেষ্টার বা ট্রায়ালের ঘটনা বা Event বলে।

যেমন—মুদ্রাকে একবার টস করা একটি প্রচেষ্টা হলে মুদ্রার হেড দর্শনকে একটি Event বা ঘটনা বলে। অপরদিকে ঐ রকম আর একটি প্রচেষ্টায় টেল দেখা দিলে সেটিও একটি Event হিসেবে নির্ণীত হয়।

11.3.4.1 মুখ্যঘটনা ও সাধারণ ঘটনা

একটি ঘটনার কোনো নমুনাবিন্দু না থাকলে তাকে মুখ্য ঘটনা বা Null event বলে।

একটি ঘটনায় একটি মাত্র নমুনা বিন্দু থাকলে তাকে সাধারণ ঘটনা বলে। যেমন লুডোর ঘুঁটিকে একবার চাল দিলে সেটি একটি ঘটনা এবং সেখানে '6' দেখা দিলে সেটি একটি সাধারণ ঘটনা বা Simple event।

11.3.4.2 যৌগিক ঘটনা

যখন দুই বা ততোধিক সাধারণ সম্পর্কিত ঘটনা এক সঙ্গে (Simultaneous) ঘটে তখন তাকে যৌগিক ঘটনা বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় লুডোর ঘুঁটিকে দুবার পরপর চাল দিলে একবার তিন ও আর একবার চার পড়লে যোগফল হয় 7 (সাত)। সে ক্ষেত্রে এটি হল যৌগিক ঘটনা। দুটি সাধারণ ঘটনা যথাক্রমে A ও B হলে তাদের যৌগিক ঘটনাকে AB দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং তার সম্ভাবনাকে P(AB) বলে।

11.3.4.3 সামগ্রিক ঘটনা

একটি পর্যবেক্ষণকালে সম্ভাব্য সকল প্রকার পরিণামকে একত্রে সামগ্রিক বা Exhaustive event বলা হয়।

একটি লুডোর ঘুঁটিকে চাল দিলে 1, 2, 3, 4, 5, 6-এর যে-কোনো একটি আসতে পারে। তবে এখানে আসার সম্ভাব্য পরিণাম ছয় ('6') সুতরাং, '6' হল সামগ্রিক ঘটনা।

11.3.4.4 পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা

একটি পর্যবেক্ষণের একটি ঘটনা যদি অপর সম্ভাব্য ঘটনাকে আসতে দেয় তবে ঘটনাগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলা হয়।

যেমন মুদ্রা টস্ কালে হেড এবং টেল পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

11.3.4.5 সমসম্ভাব্য ঘটনা

যে ঘটনায় সম্ভাব্য পরিণামগুলির প্রত্যেকে একই মাত্রায় উদ্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাদের সম-সম্ভাব্য ঘটনা বলা হয়। যেমন লুডোর ঘুঁটির চালে 1, 2, 3, 4, 5, 6 সমসম্ভাব্য ঘটনা।

11.3.4.6 অনপেক্ষ ও সাপেক্ষ ঘটনা

যদি একটি যে-কোনো পর্যবেক্ষণের দ্বিতীয় প্রচেষ্টার ঘটনা প্রথম প্রচেষ্টার ঘটনার উপর নির্ভর না করে তবে ঘটনাগুলিকে পরস্পর অনপেক্ষ বলা হয়। অপরদিকে দ্বিতীয় প্রচেষ্টার ঘটনার সম্ভাব্যতা যদি প্রথম প্রচেষ্টার ঘটনার সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করে তবে ঘটনাগুলিকে পরস্পর সাপেক্ষ ঘটনা বলে।

উদাহরণস্বরূপ 52 টি তাসের মধ্য থেকে যেকোনো একটি তাস টানলে তারা সম্ভাব্যতা, সেই তাসটিকে পুনরায় তাসগুলির মধ্যে রেখে আবার একটি তাস টানলে তার সম্ভাব্যতা পরস্পর অনপেক্ষ ঘটনা। কিন্তু প্রথমবার তাসটি টানার পর সেটি যথাস্থানে না রেখে পুনরায় অপর একটি কার্ড টানলে দ্বিতীয় ঘটনাটি প্রথম ঘটনার উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে ঘটনা দুটি পরস্পর অনপেক্ষ।

11.3.4.7 শর্তসাপেক্ষ সম্ভাবনা (Conditional probability) ও পরস্পর অনপেক্ষ ঘটনা (Mutually independent event)

একটি ঘটনা ঘটেছে এইরূপ শর্তে অপর ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনাকে শর্তসাপেক্ষ সম্ভাবনা বলে।

$P(A/B)$ হল A ঘটনার শর্তসাপেক্ষ সম্ভাবনা, যেখানে B ঘটনাটি ইতিমধ্যে ঘটেছে।

বা, $P(B/A)$ হল B ঘটনার শর্তসাপেক্ষ সম্ভাবনা, যেখানে A ঘটনাটি ইতিমধ্যে ঘটেছে।

দুটি ঘটনায় একটি ঘটার সম্ভাবনা অন্যটির ঘটার উপর নির্ভরশীল না হলে ঘটনাদুটিকে পরস্পর অনপেক্ষ ঘটনা বলে।

A ও B দুটি পরস্পর অনপেক্ষ ঘটনা বলে A ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা B-এর ঘটার সম্ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয় না, তাকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়, $P(A/B) = P(A)$.

11.4 সম্ভাবনার সংজ্ঞা (Definition of probability)

সম্ভাবনাকে কিভাবে পরিমাপ (quantify) করা যায় তা নিয়ে রাশি বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ্‌গণ দীর্ঘদিন ধরে চিন্তাভাবনা করেছেন। সম্ভাবনাকে পরিমাপযোগ্য করলে তবেই বিভিন্ন ঘটনার (events) পারস্পরিক তুলনা নির্ণয় সম্ভব হয়। সম্ভাবনার সংজ্ঞা নির্ণয় সাধারণত নিম্নলিখিতভাবে করা হয়—

সম্ভাবনার ধ্রুপদী সংজ্ঞা (Classical or Mathematical definition of probability) : কোনো একটি ঘটনার সম্ভাব্যতার গাণিতিক পরিমাপকেই সম্ভাবনা বলে। অর্থাৎ সম্ভাবত্যার সংখ্যায়নই হল probablity।

যদি একটি পরীক্ষায় n সংখ্যক পরস্পর বিচ্ছিন্ন, সম সম্ভাব্য ও সামগ্রিক ঘটনা থাকে এবং এই n সংখ্যা ঘটনার মধ্যে m সংখ্যায় ঘটনা উদ্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে,

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{\text{সম্ভাব্য ঘটনার সংখ্যা}}{\text{ঘটনার মোট সংখ্যা}}$$

এখানে A হল সেই ঘটনা যার সম্ভাবনা [P(A)] পরিমাপ করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ একটি লুডোর ঘুঁটিকে একবার চাল দিলে ঘুঁটির জোড় সংখ্যাগুলির দৃশ্যমান হওয়ার সম্ভাবনা কিরূপ হওয়া উচিত ?

এখানে দৃশ্যমান হওয়ার সকল সম্ভাব্য ঘটনা হল 6 (অর্থাৎ 1, 2, 3, 4, 5 এবং 6)। এখন জোড় সংখ্যাগুলি যা দৃশ্যমান হতে পারে তা হল 2, 4 ও 6 অর্থাৎ 3

$\therefore$ জোড় সংখ্যার দৃশ্যমান হওয়ার সম্ভাবনা $= \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$

11.5 সম্ভাবনা সম্পর্কিত উপপাদ্য সমূহ (Theorems on probability)

সম্ভাবনা বিষয়ে বেশ কয়েকটি উপপাদ্য প্রচলিত। তবে এগুলির মধ্যে দুটি উপপাদ্য সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। এগুলি হল সংযোজন উপপাদ্য ও গুণন উপপাদ্য।

11.5.1 সংযোজন উপপাদ্য (Addition theorem or theorem on total probability)

A ও B যদি দুটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয় তবে এদের যে-কোনো একটি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা প্রতিটি এককভাবে ঘটার সম্ভাবনার যোগফলের সমান। অর্থাৎ $P(A + B) = P(A) + P(B)$

প্রমাণ : ধরি, n সংখ্যক পরস্পর বিচ্ছিন্ন, সম সম্ভাব্য ও সামগ্রিক ঘটনার মধ্যে A ঘটনাটি m ও B ঘটনাটি সম্ভাব্যতায় আবির্ভূত হয়।

তবে $P(A) = \frac{m}{n}$ ও $P(B) = \frac{p}{n}$

সুতরাং, A বা B এর সামগ্রিক সম্ভাব্যতা হল $m + P$ (যেহেতু A ও B পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা)

$\therefore P(A+B) = \frac{m+p}{n} = \frac{m}{n} + \frac{p}{n} = P(A) + P(B)$

সংযোজন উপপাদ্যটি থেকে নিম্নলিখিত অনুসিদ্ধান্ত পাওয়া যায়—

যদি $E_1, E_2, E_3 \ldots\ldots E_n$, n সংখ্যক পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয় এবং তাদের সম্ভাবনা যথাক্রমে $P(E_1), P(E_2), P(E_3) \ldots\ldots P(E_n)$ হয় তবে,

$P(E_1 + E_2 + E_3 \ldots\ldots E_n) = P(E_1) + P(E_2) + P(E_3) + \ldots\ldots P(E_n)$.

উদাহরণ ঃ লুডোর ঘুঁটি দ্বারা একটি চাল দেওয়া হল। 1 বা 6-এর দৃশ্যমান হওয়ার সম্ভাবনা কিরূপ ?

ধরি, 1-এর দৃশ্যমান হওয়ার সম্ভাবনা $P(A) = \frac{1}{6}$

6 ,, ,, ,, ,, $P(B) = \frac{1}{6}$

$\therefore$ 1 বা 6-এর দৃশ্যমান হওয়ার সম্ভাবনা $= P(A+B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

11.5.2 গুণন উপপাদ্য (Multiplicative theorem)

যৌগিক ঘটনার ক্ষেত্রে দুটি ঘটনার একসঙ্গে ঘটার সম্ভাবনা একটি ঘটনার সম্ভাবনা এবং অপর একটি ঘটনার শর্তসাপেক্ষ সম্ভাবনার গুণফলের সমান। যেখানে প্রথম ঘটনাটি ইতিমধ্যে ঘটেছে বলে অনুমান করা যায়।

যদি A এবং B দুটি এরূপ ঘটনা হয় তবে

$P(AB) = P(A).P(B/A)$ [P(B/A) হল B-এর শর্তসাপেক্ষ সম্ভাবনা]

$= P(B).P(A/B)$ [যেখানে P(A/B) হল A-এর শর্ত সাপেক্ষ সম্ভাবনা]

উদাহরণ ঃ একটি থলিতে 6টি নীল বল এবং 4টি লাল বল আছে। দুটি বল না দেখে একটির পর একটি থলে থেকে বার করা হল প্রতিস্থাপন না করে, দুটি লাল বলের একসঙ্গে আসার সম্ভাবনা কিরূপ ?

সমাধান ঃ ধরি, প্রথম চেষ্টায় লাল বল আসার সম্ভাবনা P(A)

$\therefore P(A) = \frac{\text{সম্ভাব্য ঘটনা}}{\text{সামগ্রিক ঘটনা}} = \frac{4}{10}$

দ্বিতীয় লাল বলের আসার সম্ভাবনা যখন, প্রথম বলটি ইতিমধ্যেই লাল হয়েছে

$\therefore P(B/A) = \frac{\text{সম্ভাব্য ঘটনা}}{\text{সামগ্রিক ঘটনা}} = \frac{3}{9}$

$\therefore$ দুটি লাল বলের এক সঙ্গে আসার সম্ভাবনা $= P(AB) = P(A).P(B/A) = \frac{4}{10} \times \frac{4}{9} = \frac{2}{15}$

গুণন উপপাদ্যের অনুসিদ্ধান্ত ঃ

(1) যদি A এবং B দুটি অনপেক্ষ ঘটনা হয় তবে

$P(A/B) = P(A)$

$P(B/A) = P(B)$

$\therefore P(AB) = P(a).P(B)$

(2) যদি $E_1, E_2, E_3 \ldots\ldots E_n$, n সংখ্যক ঘটনা হয়, তবে $P(E_1, E_2, E_3 \ldots\ldots E_n) = P(E_1).P(E_2/E_1), P(E_3/E_1 E_2) \ldots\ldots P(E_1/E_1 E_2 \ldots\ldots E_{n-1})$

$\therefore$ যদি $E_1, E_2, E_3 \ldots\ldots E_n$, n সংখ্যক অনপেক্ষ ঘটনা হয়, তবে $P(E_2/E_1) = P(E_2)$ এবং $P(E_3/E_1 E_2) = P(E_3)$ এবং $P(E_n/E_1 E_2) \ldots\ldots E_{n-1}) = P(E_n)$

$\therefore P(E_1 E_2 E_3 \ldots\ldots E_n) = P(E_1).P(E_2).P(E_3) \ldots\ldots P(E_n)$

11.6 সারাংশ

মূলত জুয়াখেলার তত্ত্ব থেকে সম্ভাবনা তত্ত্বের জন্ম। সম্ভাবনাকে পরিমাপ করা রাশি বিজ্ঞানী এবং গণিত বিজ্ঞানের কাছে সহজসাধ্য নয়। সম্ভাবনাকে পরিমাপ যোগ্য করলে বিভিন্ন ঘটনার পারস্পরিক তুলনা করা সম্ভবপর হয়। গণিতবিদ্গণের মতে কোনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন সমসম্ভাব্য ও সামগ্রিক ঘটনার সম্ভাবনা সম্ভাব্য ঘটনার সংখ্যা ও ঘটনার মোট সংখ্যার অনুপাতের সমান। এছাড়াও রাশি বিজ্ঞানীগণ সম্ভাবনার সংজ্ঞা একটু অন্যভাবে নির্ণয় করেন। যে ভাবেই হোক্ না কেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক ঘটনাই সম্ভাব্যতার খেলা মাত্র। সম্ভাবনা তত্ত্বের বিভিন্ন গাণিতিক সূত্রের দ্বারা এটিকে বাণিজ্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

11.7 অনুশীলনী

(1) সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(a) আবশ্যিকতা (Necessity) ও সম্ভাব্যতা (Chance) বলতে কি বোঝায় ?

(b) প্রচেষ্টা (Trial) ও ঘটনা (Event)-র উদাহরণসহ সংজ্ঞা দিন।

(c) যৌগিক ঘটনা (Compound event) কি ?

(d) সামগ্রিক, পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সমসম্ভাব্য ঘটনা কি ?

(e) শর্তসাপেক্ষ ঘটনা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(f) সম্ভাবনার (Probablity) সংজ্ঞা দিন।

(2) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(a) একটি মুদ্রা টস করে হেড পাওয়া গেল। একে সম্ভাবনা তত্ত্বে ..... বলে।

(b) দুই বা ততোধিক সাধারণ সম্পর্কিত ঘটনাকে ..... ঘটনা বলে।

(c) A ও B দুটি যৌগিক ঘটনার একসঙ্গে ঘটার সম্ভাবনা $P(AB) = P(A)$ .....

[যেখানে A ঘটনাটি ইতিমধ্যে ঘটেছে]

(d) একটি প্রচেষ্টায় A ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা $P(A) = \frac{\text{.....}}{\text{.....}}$

(3) দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্নাবলী

(a) সম্ভাবনার সংজ্ঞা দিন। সম্ভাবনা সম্পর্কিত উপপাদ্যগুলি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(b) সুমন ও সঙ্গীতা দুটি চাকুরীপদে দরখাস্ত করে ইন্টারভিউ দিয়েছিল। সুমনের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা $\frac{1}{3}$ এবং সঙ্গীতার $\frac{4}{5}$ তবে, তাদের যে-কোনো একজনের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবন কত ?

(c) সম্ভাবনা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত পরিভাষার ব্যাখ্যা করুন ঃ প্রচেষ্টা, নমুনা দেশ, গণনসাধ্য ও অবিচ্ছিন্ন নমুনা দেশ, সাধারণ ঘটনা ও যৌগিক ঘটনা, সম্পূর্ণ ঘটনা, অনপেক্ষ ও সাপেক্ষ ঘটনা।

11.8 উত্তরমালা

[1] (a) 11.2 দেখুন (b) 11.3.1 ও 11.3.4 দেখুন
(c) 11.3.4.2 দেখুন (d) 11.3.4.3, 11.3.4.4 ও 113.4.5 দেখুন
(e) 11.3.4.7 দেখুন (f) 11.4 দেখুন

[2] (a) ঘটনা (Event) (b) যৌগিক ঘটনা
(c) P(B/A) (d) $\frac{\text{সম্ভাব্য ঘটনার সংখ্যা}}{\text{ঘটনার মোট সংখ্যা}}$

[3] (a) 11.4 ও 11.5 দেখুন (b) $\frac{2}{5}$ (c) 11.3 দেখুন।

একক 12 ❐ প্রস্তাবনা পরীক্ষণ (Hypothesis testing)

গঠন ঃ

12.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

12.2 বাস্তব চলের সম্ভাবনা

12.3 পরিক্ষণীয় প্রস্তাবনা গঠন

12.4 অনুশীলনী–1

12.5 এক নমুনাভিত্তিক পরীক্ষা

12.6 ছোট প্রশ্ন

12.7 পিয়ারসনের কাই-বর্গ পরীক্ষা

12.8 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

12.9 উত্তরমালা

12.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা ঃ

এই অধ্যায়ের পূর্বে একটি চল (Variable) দ্বারা গৃহীত কতগুলি মানের ভিত্তিতে চলটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিরূপণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কতগুলি মান (Value) দেওয়া থাকলে তাদের গড় (Average), ভেদমান (Variance), পরিঘাত (Moment) ইত্যাদি নির্ণয় এবং তাদের সাহায্যে চলটির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ (Characterization) সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সম্ভাবনাময় চলার ক্ষেত্রে অনুরূপ কোনো বৈশিষ্ট্যের সম্ভাব্য মান দেওয়া থাকলে তার সত্যতা বিচারের পদ্ধতি নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য ঃ

এই অংশটি পড়লে আপনি যা যা শিখতে পারবেন ঃ

- বাস্তবক্ষেত্রে কোন চল সম্ভাবনাময় চল কিনা তার যৌক্তিকতা বিচার।
- পরীক্ষণীয় প্রস্তাবনা গঠন।
- পরীক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণ।
- পরীক্ষার ফলের বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ।

12.2 বাস্তব চলের সম্ভাবনা

প্রথমে একটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা কোনো বাস্তব চলের সম্ভাবনাময় চল হবার যৌক্তিকতা বিচার করি।

উদাহরণ 1. মনে করা যাক পূর্ণবয়স্ক রুইমাছের দৈর্ঘ্য গড়ে 3'6" কিনা তা আমরা জানতে চাই, এক্ষেত্রে সমষ্টি (Population) হল—

μ = অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মিলিয়ে মোট যত পূর্ণবয়স্ক রুইমাছ ছিল, আছে বা থাকবে।

ধরা যাক, X = পূর্ণবয়স্ক রুইমাছের দৈর্ঘ্য, X-এর মান দুটি রুইমাছের ক্ষেত্রে দুইরকম হতে পারে। সুতরাং রুইমাছ পরিবর্তন করলে X-এর মান পরিবর্তিত হতে পারে। অতএব X একটি চল (Variable)।

এখন পরিমাপের পূর্বেই আমরা X চলটির সম্ভাব্য মানগুলি বলে দিতে পারি (1' থেকে 7')। কিন্তু কোনো একটি মাছের দৈর্ঘ্য কত তা পরিমাপের পূর্বে বলা অসম্ভব। সুতরাং, X চলটি সম্ভাবনাময় চল (Random variable)। অতএব X-চলটির সম্ভাবনা বিস্তারও রয়েছে।

আমরা X-চলটির গড় মান 3'6" কিনা তা পরীক্ষা করতে চাই।

পরীক্ষার একটি পদ্ধতি হল যে সমষ্টির সব গাছের দৈর্ঘ্যের গড় নির্ণয় করে তা প্রদত্ত মানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, যা এক্ষেত্রে অসম্ভব। সুতরাং সমষ্টি থেকে সমসম্ভাবনা পদ্ধতিতে (random sampling) কয়েকটি রুইমাছ সংগ্রহ করে তাদের দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে সমষ্টিতে মাছের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত করা যায় কিনা তা দেখতে হবে।

X যেহেতু সম্ভাবনাময় চল, সুতরাং এই চলের সম্ভাবনা বিস্তার (Probability sampling) থাকবে যা সমষ্টিতে চলটির সম্ভাবনা বিস্তারকে (Population probablity distribution) নির্দেশ করবে। অতএব X-চলটির সম্ভাবনা বিস্তার সমষ্টির যে-কোনো মাছের ক্ষেত্রেই একই থাকবে।

ধরা যাক, X_i = সমষ্টি থেকে সংগৃহীত i-তম মাছের দৈর্ঘ্য। $i = 1, 2, \ldots\ldots, 5$। অতএব $X_1, X_2 \ldots\ldots, X_5$ চলগুলি সম্ভাবনাময় চল যাদের সম্ভাবনা বিস্তার X-চলটির মতোই। $X_1, X_2 \ldots\ldots, X_5$ চলগুলি হল X-চলটির অভিন্ন, স্বাধীন অনুলিপি (Identically & independently distributed as X)। এই চলগুলির সম্ভাবনা বিস্তারের রূপ (Functional form) জানা গেছে কিন্তু কয়েকটি বৈশিষ্ট্য অজানা থাকতে পারে। এই চলগুলিকে সমষ্টি সম্ভাবনা বিস্তার থেকে গৃহীত নমুনা বলে (Random sample)।

12.3 পরীক্ষণীয় প্রস্তাবনা গঠন

প্রস্তাবনা পরীক্ষণের ক্ষেত্রে আমরা কোন বৈশিষ্ট্যের মান প্রদত্ত মানের সঙ্গে সমান কিনা তা পরীক্ষা করার পদ্ধতি শিখব।

সংজ্ঞা ঃ

(a) অনুমিতি প্রকল্প (Hypothesis) : সমষ্টি সম্ভাবনা বিস্তারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে-কোনো বিবৃতিকে প্রস্তাবনা বলে।

(b) নেতি প্রস্তাবনা (Null hypothesis) : পরীক্ষাধীন প্রস্তাবনায় অনুমান করা হয় যে সমষ্টির বিস্তারের প্রাপ্ত গড় মান (M_1) সম্ভাব্য বিস্তারের গড় মান (M_2)-এর অনুরূপ অর্থাৎ উভয়ের অন্তর $(M_1 - M_2)$ শূন্য। এই কারণে পরীক্ষাধীন প্রস্তাবনাকে নেতি প্রস্তাবনা বা নাল (Null) হাইপোথেসিস বলা হয়।

(c) বিকল্প প্রস্তাবনা (Alternative hypothesis) : পরীক্ষাধীন নেতি প্রস্তাবনার কোন পরিবর্ত প্রস্তাবনাকে বিকল্প প্রস্তাবনা বলে। পরিবর্ত প্রস্তাবনায় $M_1 \neq M_2$ $(M_1 > M_2$ অথবা $(M_1 < M_2)$।

উদাহরণ 2. উদাহরণ 1-এর ক্ষেত্রে আমরা জানতে চাই সমষ্টিতে রুইমাছের (পূর্ণবয়স্ক) গড় দৈর্ঘ্য 3'6" কিনা। যদি X-চলটির সম্ভাবনা বিস্তারের গড় (Mean)μ হয় তবে আমাদের বিচার্য প্রস্তাবনা হবে—

$H_0 : \mu = 3'6"$ কিংবা $H_a : \mu \neq 3'6"$, H_0-কে পরীক্ষাধীন নেতি প্রস্তাবনার সংকেত এবং H_a-কে বিকল্প প্রস্তাবনার সংকেত বলে।

● **দ্রষ্টব্য ঃ** একটি পরীক্ষাধীন প্রস্তাবনার দুটি বিকল্প থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, উদাহরণ 2-এর ক্ষেত্রে $H_0 : \mu = 3'6"$-এর আরও দুটি বিকল্প প্রস্তাবনা হল $H'_a : \mu > 3'6"$ এবং $H''_a : \mu = < 3'6"$। কিন্তু একটি সমস্যা (Problem)-এর সম্পর্কিত নেতি প্রস্তাবনা (Associated null hypothesis) থেকে সঠিক বিকল্পটি স্থির করতে হবে। উদাহরণ 2-এর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র $\mu = 3'6"$ কিনা তা পরীক্ষণীয়। অর্থাৎ রুইমাছের গড় দৈর্ঘ্য 3'6" অথবা তা নয় $(\neq 3'6")$, সেটি পরীক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। তাই বিকল্প প্রস্তাবনাটি হল $H_a : \mu \neq 3'6"$।

12.4 অনুশীলনী—1

নীচের উদাহরণটি পড়ুন ও সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর করুন ঃ

ধর্মতলার মোড়ে বায়ুদূষণের মাত্রা নির্ণয় করার জন্য বাতাসে CO, NO, NO_2, O_3 এবং HC পরিমাপ করা হল। যদি এই উপাদানগুলির মধ্যে CO-এর পরিমাণ 3 এককের বেশি অথবা NO-এর পরিমাণ 2 এককের বেশি অথবা NO_2-এর পরিমাণ 9 এককের বেশি অথবা O_3-এর পরিমাণ 6 এককের কম অথবা HC-এর পরিমাণ 2 একক না হয় তবে বায়ুদূষণ হয়েছে বলা হবে।

(i) বায়ু দূষণ নির্ধারণের জন্য কোনো প্রস্তাবনা পরীক্ষার প্রয়োজন আছে কি ?

(ii) এক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় চল (Random variable) বা চলগুলি কি হতে পারে ?

(iii) দূষণ পরিমাপের জন্য পরীক্ষাধীন প্রস্তাবনাগুলি কি হবে ?

(iv) প্রতিটি ক্ষেত্রে বিকল্প প্রস্তাবনাগুলি লিখুন।

12.5 এক নমুনাভিত্তিক পরীক্ষা (One sample test)

ধরা যাক $X_1 \ldots\ldots, X_n$ একটি নর্ম্যাল বিস্তার থেকে গৃহীত n সংখ্যক নমুনা (Random sample)। সুতরাং চলগুলি স্বাধীন ও অভিন্ন বিস্তারযুক্ত (*iid*)।

$$X_i \overset{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2), i = 1,2 \ldots\ldots, n$$

এবং μ = সমষ্টিতে নর্ম্যাল বিস্তারের গড়,

σ^2 = সমষ্টিতে নর্ম্যাল বিস্তারের ভ্যারিয়েন্স।

(a) নেতি প্রস্তাবন ও বিকল্প প্রস্তাবনা ঃ

$(\mu = \mu_0) = M_1 \text{ vs. } H_a : \mu = \mu_0$ যেখানে μ, σ^2 জ্ঞাত (known)।

পরীক্ষা পদ্ধতি গঠন ঃ

বিকল্প প্রস্তাবনাটি গৃহীত হবে যদি $(\mu = \mu_0)$ এর মান বড় হয়। কিন্তু μ অজানা। যেহেতু নমুনাগুলি সবাই $N(\mu, \sigma^2)$ থেকে গৃহীত, সুতরাং নমুনাগড় (Sample mean)μ-এর ঘনিষ্ঠ (Close) হবে (কোন একটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে)। নমুনাগড় $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

$\overline{X}$-এর μ-এর ঘনিষ্ঠতা (প্রত্যাশিত সম্ভাব্যতার বিচার থেকে) নীচে দেওয়া হল ঃ

$$E(\overline{X}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i)$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mu_i = \mu$$

অতএব $(\mu = \mu_0)$-এর বদলে আমরা $(\overline{X} = \mu_0)$ নিয়ে গণনা করে দেখতে পারি।

কিন্তু $(\overline{X} = \mu_0)$-এর একক (Unit) রয়েছে। রাশিটিকে একক নিরপেক্ষ করার জন্য $(\overline{X} = \mu_0)$-কে $\overline{X}$-এর ভ্যারিয়েন্স দিয়ে ভাগ করা হল, যেখানে

$$v(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$\therefore t = \dfrac{\overline{X} - \mu}{\sigma^2 / n}$ এবং H_0 সত্য হলে, $t \sim N(0, 1)$ ।

T-এর মান খুব বেশি হলে H_0 বাতিল হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে T কত বড় হলে H_0 বাতিল হবে? এক্ষেত্রে দুটি লক্ষ্যণীয় ভ্রান্তি ঘটতে পারে।

(a) যখন H_0 প্রস্তাবনা যথার্থ নয়, কিন্তু পরীক্ষার ভিত্তিতে H_0 বাতিল গণ্য হয়। এই উদাহরণটি হল "প্রথম জাতির ভ্রান্তি" (Type-I error)।

(b) যখন H_0 যথার্থ নয়, কিন্তু পরীক্ষার ভিত্তিতে গণ্য করতে হয়। এই উদাহরণগুলি হল "দ্বিতীয় জাতির ভ্রান্তি" (Type-II error)।

সুতরাং প্রস্তাবনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই দুটি ভ্রান্তির সম্ভাবনা কম হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু একই সঙ্গে দুটি ভ্রান্তির সম্ভাবনাকে কমান যায় না। তাই প্রথম জাতির ভ্রান্তির সম্ভাবনাকে নির্দিষ্ট করে দ্বিতীয় জাতির ভ্রান্তির সম্ভাবনাকে কমান হয়।

ধরা যাক,

P[প্রথম জাতির ভ্রান্তি] = α (জ্ঞাত) ; সেক্ষেত্রে T-এর মান γ_α-থেকে বেশি হলে H_0 বাতিল হবে।

$\gamma_\alpha = N(0, 1)$ বিস্তারের একটি মান যার জন্য $P[X > \gamma_\alpha] = \alpha$

γ_α-এর মান বিভিন্ন α-এর জন্য Biometrika Vol-I-এর গণনা করা হয়েছে।

উদাহরণ ঃ উদাহরণ 1-এর ক্ষেত্রে, নীচের তথ্যের ভিত্তিতে পরীক্ষাটি নিম্নরূপ হবে ঃ

নমুনাগড় $(\bar{X}) = 50''$, $\sigma^2 = 3$ বর্গ ইঞ্চি $n = 5, \alpha = 0{\cdot}05$ ।

$$\therefore \quad \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 0{\cdot}3464''$$

$$t = \frac{(50-42)}{0{\cdot}3464''} = 23{\cdot}094$$

$$t_\alpha = 0{\cdot}5 = 1{\cdot}645.$$

$$t >= t_\alpha \equiv 0{\cdot}05 \rightarrow 1.646$$

সুতরাং, H_0 বাতিল হল।

অতএব সিদ্ধান্ত করা যায় যে ($\alpha = 0{\cdot}05$-এর জন্য) রুইমাছের গড় দৈর্ঘ্য 3'6" অপেক্ষা বেশি।

দ্রষ্টব্য ঃ (a) α-কে তাৎপর্যমাত্রা (Level of significance) বলা হয়।

(b) পরীক্ষাটির সিদ্ধান্ত $100\alpha\%$ তাৎপর্যমাত্রায় গৃহীত বলা হয়।

(c) H_0 বাতিল হলে, পরীক্ষাটি $100\alpha.\%$ দ্বিতীয় জাতির মাত্রায় তাৎপর্যপূর্ণ বলা হবে। এক্ষেত্রে ভ্রান্তির সম্ভাবনা সর্বনিম্ন।

(d) সাধারণত ঃ $\alpha = 0{\cdot}01$ বা $\alpha = 0{\cdot}05$ নেওয়া হয়।

(b) পরীক্ষণীয় ও বিকল্প প্রস্তাবনা হল ঃ $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu < \mu_0$.

আগের পদ্ধতি অনুসরণ করে দেখান যায়, $t = \dfrac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / S_n}$ এবং H_0 সত্য হলে T চলটি নর্ম্যাল বিস্তারযুক্ত হবে। সুতরাং, H_0 সত্য হলে $t \sim N(0, 1)$ ।

5% তাৎপর্যমাত্রায় (অর্থাৎ $\alpha = 0{\cdot}05$) H_0 বাতিল হবে যদি, $t < \gamma_\alpha$ হয়।

উদাহরণ ঃ উদাহরণ 1-এর ক্ষেত্রে, মনে করি নিম্নোক্ত মানগুলি প্রদত্ত ঃ

নমুনা গড় $(\overline{X}) = 41"$, ভ্যারিয়েন্স $(\sigma^2) = 5{\cdot}01$। বর্গহিষ্ণি, $n = 5$ পরীক্ষণীয় প্রস্তাবনা হল ঃ

$H_0 : \mu = 3'6"$ vs. $H_1 : \mu < 3'6"$

$$\therefore \quad t = \left(\frac{41-42}{\sqrt{5{\cdot}01}} \times 5\right)$$

$$= -2{\cdot}214$$

$$T_{0{\cdot}05} = 1{\cdot}645$$

$\therefore T < -1{\cdot}645$ অর্থাৎ $T < -t_\alpha$

সুতরাং, H_0 বাতিল অর্থাৎ রুইমাছের গড় দৈর্ঘ্য 3'6"(42") অপেক্ষা কম (5% তাৎপর্যমাত্রায়)।

(c) পরীক্ষাধীন ও বিকল্প প্রস্তাবনাগুলি হল ঃ

$H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_0 : \mu \neq \mu_0$ এবং $\mu_0 = \sigma^2$ জ্ঞাত।

(a)-তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে দেখান যায় যে, $t = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ এবং H_0 সত্য হলে t চলটি $N(0, 1)$ বিস্তারযুক্ত হবে। সেক্ষেত্রে T-এর মান খুব বড় বা ছোট হলে H_0 বাতিল হবে। সুতরাং, প্রথম জাতির ভ্রান্তির সম্ভাবনা α হলে,

$$P[T < C_1 \text{ বা } T > C_2] = \alpha^2$$

দেখান যায় যে $C_1 = -T_{\alpha/2}$ ও $C_2 = T_{\alpha/2}$ হলে দ্বিতীয় জাতির ভ্রান্তির সম্ভাবনা সবচেয়ে কম হবে। সুতরাং $T < -T_{\alpha/2}$ বা $T > T_{\alpha/2}$ হলে $100\alpha\%$ তাৎপর্যমাত্রায় H_0 বাতিল হবে।

দ্রষ্টব্য ঃ (a) কেবলমাত্র প্রতিসম সম্ভাবনা বিস্তারের ক্ষেত্রে C_1 ও C_2-এর এইরূপ মান $(-t_{\alpha/2}, t_{\alpha/2})$ পাওয়া যাবে (Symmetric probability distribution of T under H_0)। নতুবা C_1 ও C_2 নির্দিষ্ট মান নির্ধারিত সারণী দেখে স্থির করতে হবে।

(d) পরীক্ষাধীন ও বিকল্প প্রস্তাবনাগুলি হল ঃ

$H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$

যেখানে μ_0 জ্ঞাত এবং σ^2 অজ্ঞাত।

এক্ষেত্রে, H_0 সত্য হলে $T = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$; চলটি $N(0, 1)$ বিস্তার যুক্ত হবে। কিন্তু σ অজ্ঞাত। তাই নমুনা ভ্যারিয়েন্স (Sample variance), s' দ্বারা σ-কে পরিবর্তন করা হল। সুতরাং,

$T = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{s' / \sqrt{n}}$ এবং H_0 সত্য হলে T চলটির সম্ভাবনা বিস্তার হবে t_{n-1}

যেখানে $s' = \dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$, $\overline{X} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

সুতরাং H_0, $100\alpha\%$ তাৎপর্যমাত্রায় বাতিল হবে যদি T চলটির মান $(t) - t_{n-1}\ \alpha/2$ অপেক্ষা ছোট বা $t_{n-1},\alpha/2$ অপেক্ষা বড় হয়।

সুতরাং, H_0 বাতিল হবে যদি, $t < t_{n-1}, \alpha/2$ বা, $t > t_{n-1}, \alpha/2$ হয়।

উদাহরণ ঃ উদাহরণ 1-এ নীচের তথ্য দেওয়া আছে ঃ

নমুনা গড় $(\overline{X}) = 41{\cdot}5"$

নমুনা ভ্যারিয়েন্স $(s'^2) = 5{\cdot}29"; n = 5$

পরীক্ষাধীন ও বিকল্প প্রস্তাবনাগুলি হল ঃ $H_0 : \mu = 42"$ vs. $H_1 : \mu \neq 42"$.

সেক্ষেত্রে $T = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{s'/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ (H_0 সত্য হলে)।

T-এর মান, $t = 1{\cdot}087$।

5% তাৎপর্যমাত্রায় $t_{n-1}, 0{\cdot}05/2 = t_4, 0{\cdot}025$

$= 2{\cdot}776$

$\therefore -2{\cdot}776 < 1{\cdot}087 < 2{\cdot}776$

অর্থাৎ $-t_4, 0{\cdot}025 < 1{\cdot}087 < t_4, 0{\cdot}025$

সুতরাং, 5% তাৎপর্যমাত্রায় H_0 গৃহীত হল। অতএব সিদ্ধান্ত করা যায় 5% তাৎপর্যমাত্রায় রুইমাছের গড় দৈর্ঘ্য 42" বা 3'6"।

দ্রষ্টব্য ঃ (a) T চলটিকে পরীক্ষা অপেক্ষক (Test statistic) বলা হয়।

(b) 1·7 (d) পরীক্ষাটি স্টুডেন্টের t-পরীক্ষা (Student's test) নামে পরিচিত।

12.6 ছোট প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন ঃ

1·5 অংশটির উদাহরণটি পড়ুন। বায়ুদূষণে CO-এর প্রভাব রয়েছে কি না তা পরীক্ষার জন্য নীচের তথ্যগুলি দেওয়া রয়েছে ঃ 15টি নমুনা (n), নমুনা গড় $= 3{\cdot}15$

নমুনা ভ্যারিয়েন্স $(s'^2) = 1{\cdot}76$ বর্গ একক।

এবং নমুনাগুলি সবাই $N(\mu, \sigma^2)$ বিস্তারযুক্ত।

(a) H_0 ও H_1 কি হবে লিখুন। আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

(b) পরীক্ষা অপেক্ষকটি লিখুন।

(c) H_0 সত্য হলে অপেক্ষকটির সম্ভাবনা বিস্তার কি হবে ?

(d) পরীক্ষার নিয়মটি (Rule) নির্ণয় করুন। ($\alpha = 0{\cdot}01$)

(e) এক্ষেত্রে, প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে কি সিদ্ধান্ত হবে ? ($t_{14,\,0{\cdot}005} = 2{\cdot}977, T_{0{\cdot}005} = 2{\cdot}576$)।

12.7 পিয়ারসনের কাই-বর্গ (Chi-square বা χ^2) পরীক্ষা

এই পরীক্ষাটি শ্রেণীবিভাগের উপযুক্ততা বিচারের জন্য করা হয় (Test for goodness of fit)।

মনে করি, সমষ্টিতে (Population) K-খানি শ্রেণী রয়েছে এবং প্রস্তাবনা অনুযায়ী i-তম শ্রেণীর অনুপাত p_i^0 (তাত্ত্বিক এবং জ্ঞাত)। সমষ্টি থেকে সমসম্ভাবনা পদ্ধতিতে n সংখ্যক নমুনা সংগৃহীত হল। নমুনাগুলির মধ্যে f_i সংখ্যক নমুনা i-তম শ্রেণীভুক্ত। এই তথ্যের ভিত্তিতে পরীক্ষা করতে হবে যে প্রস্তাবনাটি সঠিক কিনা। যদি সমষ্টিতে শ্রেণী অনুপাতগুলি $p_1, p_2, \ldots\ldots, p_k$ হয়, তবে পরীক্ষা করতে হবে।

$$H_0 : p_1 = p_1^0, p_2 = p_2^0, \ldots\ldots, p_x = p_k^0 \text{ vs.}$$

$$H_1 : H_0 \text{ অসত্য।}$$

এক্ষেত্রে $np_i^0 = i$-তম শ্রেণীর (expected frequency) $= E$

$f_i = i$-তম শ্রেণীর নমুনা সংখ্যা (observed frequency of the i-th class) $= 0$

দেখান যায় যে,

$$\chi^2 = \frac{f_2^1}{np_1^0} + \frac{f_2^3}{np_2^0} + \ldots\ldots\ldots + \frac{f_k^2}{np_k^0} - n$$

$$= \sum_{i=1}^{k} \frac{f_i^2}{np_i^0} - n$$

$$= \sum_{i=1}^{k} \frac{0^2}{E} - \sum_{i=1}^{k} E = \frac{\sum (0-E)^2}{E}$$

$$= \sum_{i-1}^{k} \frac{0^2}{E} - n$$

এবং H_0 সত্য হলে, χ^2 চলটি বিস্তার একটি কাই-বর্গ বিস্তার (χ^2 distribution) হবে যার স্বাধীনতামাত্রা (degress of freedom, df) হবে $K-1$।

সুতরাং χ^2-এর মান খুব বড় হলে f_i এবং np_i^0-এর দূরত্ব বাড়বে। অর্থাৎ χ^2 বড় হলে H_0 অসত্য বলা হবে। এক্ষেত্রে χ^2-এর মান যদি $\chi^2_{\alpha,k-1}$ অপেক্ষা বড় হয় তবে $100\alpha\%$ তাৎপর্যমাত্রায় H_0 বাতিল হবে।

উদাহরণ ঃ স্মলপক্সের টীকার কার্যকারিতা বিচারের জন্য একটি সমীক্ষায় নীচের তথ্যগুলি পাওয়া গেছে ঃ

	রোগাক্রান্ত	সুস্থ্য	মোট
টীকা প্রদত্ত	33	120	153
টীকা প্রদত্ত নয়	18	51	69
মোট	51	171	222

প্রস্তাবনা অনুযায়ী টীকা প্রদত্ত এবং রোগাক্রান্ত (p_1^0), টীকা প্রদত্ত এবং সুস্থ (p_2^0), টীকা প্রদত্ত নয় এবং রোগাক্রান্ত (p_3^0), টীকা প্রদত্ত নয় এবং সুস্থ (p_4^0), এই চারটি শ্রেণীর অনুপাত 1 : 5 : 2 :2। প্রদত্ত তথ্য কি এই অনুপাতকে সমর্থন করে ?

এক্ষেত্রে 222টি নমুনা নেওয়া হয়েছে। সুতরাং, $n = 222, f_1 = 33, f_2 = 120, f_3 = 18, f_4 = 51$।

পরীক্ষাধীন প্রস্তাবনা ও বিকল্প প্রস্তাবনা হল ঃ

$H_0 : p_1 = 0{\cdot}1, p_2 = 0{\cdot}5, p_3 = 0{\cdot}2\ p_4 = 0{\cdot}2$

$H_1 : H_0$ অসত্য।

অতএব, $p^0{}_1 = \frac{1}{10}, p_2 = \frac{5}{10}, p^0{}_3 = \frac{2}{10}, p^0{}_4 = \frac{2}{10}$ এবং

$$x^2 = \frac{f_1^2}{np_1^0} + \frac{f_2^2}{np_2^0} + \frac{f_3^2}{np_3^0} + \frac{f_4^2}{np_4^0} - n$$

$$= \frac{33^2}{222 \times 0{\cdot}1} + \frac{120^2}{222 \times 0{\cdot}5} + \frac{18^2}{222 \times 0{\cdot}2} + \frac{57^2}{222 \times 0{\cdot}2} - 222$$

$$= 1190{\cdot}2297$$

$$x^2_{0{\cdot}05,\,3} = 7{\cdot}185$$

$$x^2_{0{\cdot}01,\,3} = 11{\cdot}345$$

$\therefore H_0$ 5% তাৎপর্যমাত্রায় বাতিল হল। অতএব প্রদত্ত তথ্য, তাত্ত্বিক অনুপাতকে সমর্থন করে না।

12.8 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

(a) নীচে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুশীলনী 1-এ বিবৃত সমস্যাটিতে HC দ্বারা বায়ুদূষণ হচ্ছে কি না তা বলুন এবং উত্তরটির স্বপক্ষে যুক্তি দিন ঃ

95টি নমুনার ভিত্তিতে গণনা করে নমুনাগড় পাওয়া গেছে। 1·75 একক এবং নমুনা ভ্যারিয়েন্স পাওয়া গেছে 11·01 বর্গ একক। ($t_{0{\cdot}025,\,60} = 2,\ t_{0{\cdot}025,\,120} = 1{\cdot}98$)

(b) একজন উদ্ভিদবিদ 556টি মটরগাছের উপর সংকরায়ন পরীক্ষা করে নীচের ফলাফল পেয়েছেন ঃ

রং/আকৃতি	গোলাকৃতি (A)	কুঞ্চিত (B)
হলুদ (a)	315	101
সবুজ (b)	108	32

জিনতত্ত্ব অনুযায়ী Aa : Ab : Ba : Bb হওয়া উচিত 9 : 3 : 3 : 1। পরীক্ষার ফল কি এই তত্ত্ব সমর্থন করে ($\chi^2_{0\cdot05,\,4} = 7\cdot815$).

12.9 উত্তরমালা

অনুশীলনী 1

[i] হ্যাঁ

[ii] X = বাতাসে CO-এর পরিমাণ

Y = বাতাসে NO-এর পরিমাণ

Z = বাতাসে NO_2-এর পরিমাণ

W = বাতাসে O_3-এর পরিমাণ

T = বাতাসে HC-এর পরিমাণ

[iii] (a) $H_0 : \mu_X = 3$

(b) $H_0 : \mu_Y = 2$

(b) $H_0 : \mu_Z = 9$

(d) $H_0 : \mu_N = 6$

(e) $H_0 : \mu_r = 2$

যেখানে $\mu^* = *$ চলটির এক্সপেক্টেশন বা সমষ্টিতে গড় (Population mean).

[iv] (a) $H_1 : \mu_X > 3$

(b) $H_1 : \mu_Y > 2$

(c) $H_1 : \mu_Z > 9$

(d) $H_1 : \mu_N > 6$

(e) $H_1 : \mu_T \neq 2$

অনুশীলনী 2

(a) অনুশীলনী 1-এর উত্তরমালায় (iii) (a) এবং (iv) (a) দেখুন।

(b) $T = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{8'\sqrt{n}}$

(c) 1·6 (d) দেখুন।

(d) 1·6 (a) দেখুন।

(e) বায়ুদূষণে CO-এর প্রভাব নেই।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

(a) $t = 2{\cdot}20$

(b) $x^2 = 0{\cdot}470$

একক 13 ❐ সহগতি ও নির্ভরণ (Correlation and regression)

গঠন ঃ

13.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

13.2 সহগতি (Correlation)

13.3 নির্ভরণ

13.4 প্রশ্নাবলী

13.5 উত্তরমালা

13.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা ঃ

আগের পরিচ্ছেদগুলিতে একচল ভিত্তিক বিশ্লেষণ সম্বন্ধীয় আলোচনা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদে দ্বিচল ভিত্তিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে। ধরা যাক দুটি চল, X ও Y সম্বন্ধে রাশিতথ্য জানা গেছে। এধরনের দ্বিচলভিত্তিক রাশিতথ্য থেকে প্রধানত দুটি জিজ্ঞাসা আসতে পারে ঃ

(a) এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে কিনা ; থাকলে তা কি ধরনের ও কতখানি ঘনিষ্ঠ।

(b) এদের মধ্যে একটির সম্বন্ধে কোনো রাশিতথ্য জানা থাকলে তার ভিত্তিতে অপরটির মান নির্ণয় করা যায় কিনা।

এই পরিচ্ছেদে এই দুটি সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হবে।

উদ্দেশ্য ঃ

এই অধ্যায়ে আমরা প্রথমে উদাহরণের সাহায্যে প্রথম সমস্যা সংক্রান্ত কিছু সংজ্ঞা ও তাদের ব্যবহারিক পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করব। তারপরে সমস্যাটির সমাধান করার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব। দ্বিতীয় সমস্যাটির সমাধান সম্বন্ধেও অনুরূপ আলোচনা করা হবে। আলোচনাগুলির শেষে কতগুলি বাস্তব উদাহরণ থেকে অনুশীলনী দেওয়া থাকবে যার সাহায্যে মূল্যায়ন করা হবে।

13.2 সহগতি (Correlation)

ধরা যাক, X এবং Y দুটি চল। (x_i, y_i) ওই চলদুটির দ্বারা গৃহীত n সংখ্যক মান $i = 1, 2 \ldots\ldots, n'$ নীচের সারণীতে (x_i, y_i)-গুলিকে দেখান হল ঃ

একক	x_i	y_i
1	x_1	y_1
2	x_2	y_2
...		
n	x_n	y_n

যেখানে $x_i = i$-তম এককের $\leftrightarrow$ X চলটির পরিমাপ।

$y_i = i$- তম এককের $\leftrightarrow$ Y চলটির পরিমাপ।

$i = 1, 2, ..., n$

সহগতি বলতে বোঝায় যে Y চলটির মানগুলি মোটামুটিভাবে X-চলটির সঙ্গে আনুপাতিক। যদি তা না হয় তবে X এবং Y-এর মধ্যে সহগতি নেই বলা হয় (Uncorrelated)।

যদি Y-চলটির মানগুলি গড়ে X-চলটির মানবৃদ্ধির সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, তবে এই ঘটনাটিকে ধনাত্মক সহগতি (Positive orcrelation) বলে। অনুরূপভাবে, Y-চলটির মান X-চলটির মানবৃদ্ধির সঙ্গে হ্রাস পেলে, ঋণাত্মক সহগতি ঘটেছে বলা হয় (Negative correlation)। তবে দুটিক্ষেত্রেই Y-চলটির মান পরিবর্তনের হার ধ্রুবক।

দুটি চলের মধ্যে সহগতির মাপক হল সহগাঙ্ক (r)।

ধরা যাক, X এবং Y দুটি চল এবং $(x_1, y_1), (x_2, y_2), ..., (x_n, y_n)$ ঐ চলদুটির n সংখ্যক মান এবং x_i ও y_i মানদুটির i-তম ব্যষ্টির জন্য (i-th individual)। সেক্ষেত্রে সহগতির মাপক বা সহগাঙ্ক r_{xy} (Correlation co-efficient) (সংক্ষেপে r) হল

$$r_{xy} = r = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{s_x s_y}$$

যেখানে $s_x = \sqrt{(\text{X - চলটির ভেদমান (variance)}}$ এবং অনুরূপে s_y।

$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$-কে X ও Y-এর সহভেদমান (covariance) বলে।

r_{xy}-এর ব্যবহারিক সূত্র ঃ

$$r_{xy} = \frac{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i\, y_i - \bar{x}.\bar{y}}{s_x s_y}$$

দ্রষ্টব্য ঃ ● সহগাঙ্ক r, ধনাত্মক সহগতির ক্ষেত্রে ধনাত্মক, ঋণাত্মক সহগতির ক্ষেত্রে ঋণাত্মক এবং কোনো সহগতি না থাকলে শূন্য হবে।

● r_{xy}-এর মান সর্বদা -1 অপেক্ষা বেশি এবং $+1$ অপেক্ষা কম হবে।

উদাহরণ ঃ নীচের উদাহরণে কয়েকটি পরিবারে পিতা ও তার জ্যেষ্ঠপুত্রের দৈহিক ওজনের হিসেব দেওয়া আছে। পিতা ও পুত্রের ওজনের মধ্যে সহগাঙ্ক আছে কি না তা নির্ণয় করতে হবে।

সারণী-I

ক্রমিক সংখ্যা	পিতার ওজন (kg) (x_i)	পুত্রের ওজন (kg) (y_i)	$x_i y_i$
1	53·82	47·94	2580·13
2	76·02	59·11	4493·54
3	59·01	64·03	3778·41
4	57·33	51·76	2967·40
5	66·02	71·23	4702·60
6	55·19	57·03	3147·49
7	50·59	51·31	2595·77
8	57·35	53·47	3066·50
	$\sum_{i=1}^{8} x_i = 475·33$	$\sum_{i=1}^{8} y_i = 445·88$	$\sum_{i=1}^{8} x_i y_i = 27332$

$n = 8$

$\bar{x} = 59·416,\ \bar{y} = 56·985$

$\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8} x_i y_i = 3416·5$

$$s_x = \sqrt{\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8} x^2{}_i - \bar{x}^2} = 8·0637$$

$$s_y = \sqrt{\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8} y^2{}_i - \bar{y}^2} = 7·6601$$

$$r_{xy} = \frac{\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{8} x_i\, y^2{}_i - \bar{x}\,\bar{y}}{s_x s_y} = 0·567.$$

মন্তব্য ঃ (1) দুটি চলের মধ্যে সহগতি আছে কি না তা বোঝার সহজ উপায় হল বিক্ষেপণ চিত্র Y চলটিকে X চলের সাপেক্ষে চিত্রিত করলে (plot Y against X) যে চিত্র পাওয়া যায় তা থেকে y ও x-এর মধ্যে সহগতি আছে কি না তা বোঝা যায়। Fig. 1-এ Y ও X চলদুটির মধ্যে সহগতি নেই। Fig. 2-এ y চলটি X-এর সাপেক্ষে মোটামুটি ভাবে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এক্ষেত্রে ধনাত্মক সহগতি আছে বলে ধারণা করা যায়। Fig.3-এ Y ও X চলদুটির মধ্যে অনুরূপ কারণে ঋণাত্মক সহগতি রয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

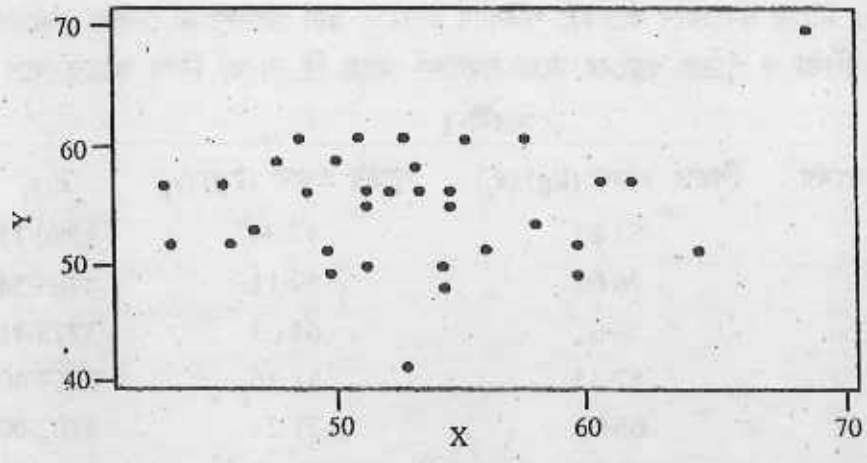

Figure 1

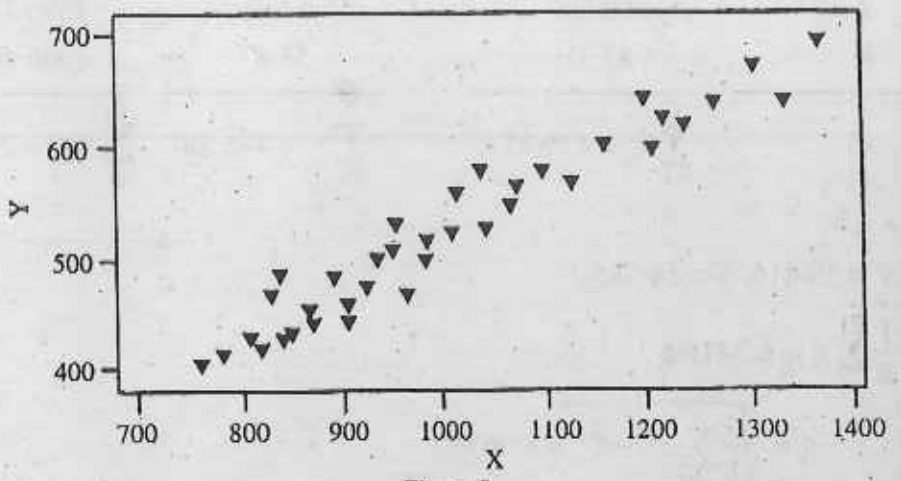

Figure 2

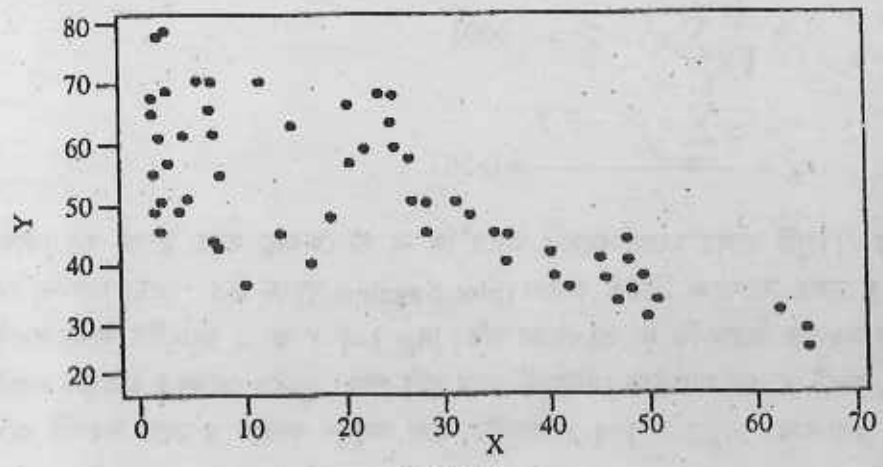

Figure 3

13.3 নির্ভরণ

অনেক সময় আলোচ্য দুটি চল, X এবং Y একে অপরের উপর নির্ভরশীল বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ মাছের ওজন জলাশয়ের জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন এবং মাছের খাদ্যের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল বলে মনে করা হয়। এক্ষেত্রে যে চলটি অন্যটির উপর নির্ভরশীল তাকে নির্ভরী (Dependent) চল এবং অপরটিকে অনপেক্ষ বা স্বাধীন (Independent) চল বলে উল্লেখ করা হয়। উপরের উদাহরণে মাছের ওজন নির্ভরী চল এবং জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন অনপেক্ষ চল। এই নির্ভরতার পরিপ্রেক্ষিতে অনপেক্ষ চলটির কোন জ্ঞাত মানের ভিত্তিতে বিজ্ঞানসম্মত ও সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতিতে নির্ভরী চলের মান নির্ণয় করার পদ্ধতিকে বলে নির্ভরণ।

মনে করি Y ও X নীচের ঋজুরৈখিক সমীকরণটি দ্বারা যুক্ত ঃ

$y = \alpha + \beta X$, α ও β অজ্ঞাত, Y এবং X-এর n খানি নমুনামান, $(x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$ -এর ভিত্তিতে লঘিষ্ঠ বর্গনীতি (least square principle) অনুযায়ী α ও β -এর প্রাক্কলক (estimate) হবে ঃ

$$\hat{\alpha} = \bar{y} - \hat{\beta}\bar{x}$$

এবং $\hat{\beta} = r\frac{s_y}{s_x}$

যেখানে, $r = X$ ও Y-এর সহগাঙ্ক,

$\therefore$ Y-এর X-এর উপর অনুমতি নির্ভরণ সরলরেখাটি হল—

$$\hat{Y}_i = \hat{\alpha} + \hat{\beta}xi_i$$

যেখানে $\hat{Y}_i = i$-তম ব্যষ্টির জন্য x_i-এর ভিত্তিতে Y-এর অনুমতি মান।

অতএব X-এর কোন মান x^* হলে এক্ষেত্রে Y-এর অনুমতি মান হবে

$$\hat{Y}^* = \hat{\alpha} + \hat{\beta}x^*$$

উদাহরণ 2. উদাহরণ 1-এর প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে X (পিতার ওজন)-এর মানের ওপর Y (পুত্রের ওজন)-এর অনুমিত নির্ভরণ সরলরেখাটি হল ঃ

$$\hat{Y}_i = 25{\cdot}4 + 0{\cdot}597 \times i$$

যেখানে α-এর প্রাক্কলক $= \hat{\alpha} = 25{\cdot}4020$

β-এর প্রাক্কলক $= \hat{\beta} = 0{\cdot}5969$

মন্তব্য ঃ

(1) দুটি চলের মধ্যে নির্ভরণ আছে কি না, তা বোঝার সহজ উপায় হল বিক্ষিপ্ত চিত্র (Scatter diagram)। Fig. 1-এ Y ও X-এর মধ্যে কোনো নির্ভরণ নেই। Fig. 2 ও Fig.3-এ Y ও X-এর নির্ভরণ রয়েছে।

(2) Y-এর X-এর উপর নির্ভরণ রেখা এবং X-এর Y-এর উপর নির্ভরণ রেখা দুটি ভিন্ন।

(3) দুটি চলের মধ্যে সহগাঙ্ক শূন্য না হলে বোঝা যায় যে চলদুটির মধ্যে ঋজুরৈখিক নির্ভরণ রয়েছে। যদি চলদুটির মধ্যে সহগাঙ্ক শূন্য হয় তবে চলদুটির মধ্যে কোনো নির্ভরণ নেই তা বলা যায় না। চলদুটি অঋজুরৈখিক নির্ভরণ মেনে চললেও তাদের মধ্যে সহগাঙ্ক শূন্য হবে। সুতরাং দুটি চলের মধ্যে সহগাঙ্ক শূন্য হলে তাদের মধ্যে অঋজুরৈখিক নির্ভরণ রয়েছে কিনা তা দেখতে হবে।

(4) X-এর Y চলের উপর নির্ভরণ রেখাটি হল ঃ

$X = \delta + \gamma Y$.

δ এবং γ-এর প্রাক্কলকগুলি হল ঃ

$$\hat{\delta} = \bar{x} - \delta\bar{y}$$

$$\hat{\gamma} = r\frac{s_x}{s_y}$$

∴ অনুমতি সরলরেখাটি হল—

$$\hat{X}_i = \hat{\delta} + \hat{\gamma} y_i \ (i\text{-তম ব্যষ্টির জন্য})$$

সুতরাং, y-এর যে-কোনো মান y^* হলে, তার সংলগ্ন x-এর অনুমিত মান হবে

$$\bar{x}^* = \delta + \hat{\gamma}\, y^*$$

13.4 প্রশ্নাবলী

(1) নীচে দেওয়া সারণীর তথ্যের ভিত্তিতে X এবং Y-এর বিক্ষেপণ চিত্রটি কিরূপ ?

(2) এই চিত্রের ভিত্তিতে Y এবং X-এর মধ্যে কি ধরনের সহগতি রয়েছে বলে ধারণা করা যায় ?

(3) Y এবং X-এর মধ্যে সহগাঙ্ক কত ?

(4) X চলটির Y-এর উপরে নির্ভরণ রেখাটি কিরূপ ? (বিক্ষেপণ চিত্র অনুযায়ী)

(5) X চলটির Y-এর উপর অনুমিত নির্ভরণরেখাটি লিখুন।

(6) Y চলটির মান 0.108-এর জন্য X চলটির অনুমিত মান কত ?

Y	X
0·123	0·109
0·109	0·111
0·110	0·110
0·109	0·110
0·112	0·105
0·109	0·110
0·110	0·111
0·110	0·110
0·110	0·110
0·112	0·111
0·110	0·109
0·101	0·111
0·110	0·109
0·110	0·112
0·110	0·109

13.5 উত্তরমালা

(3) $-0{\cdot}308774474$

(5) $x = 0{\cdot}20083 - 0{\cdot}82418y$

(6) 0·11182.

একক 14 ❐ ডেস্কটপ প্রক্রিয়া পরিগণনা (Desktop computing devices)

গঠন ঃ

14.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

14.2 কম্পিউটারের অংশ

14.2.1 ইনপুট ডিভাইস

14.2.2 প্রসেসিং ইউনিট

14.2.3 মেমারী ইউনিট

14.2.4 আউটপুট ডিভাইস

14.3 ইন্টারনেট

14.4 প্রশ্নাবলী

14.1 প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

প্রস্তাবনা ঃ

বর্তমান যুগে তথ্য আহরণ সংরক্ষণ ও তার বিশ্লেষণের অন্যতম সহায়ক হল কম্পিউটার। এই অধ্যায়ে আমরা ডেস্কটপ কম্পিউটার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। কম্পিউটার-এর গঠনের উপর কিছু প্রাথমিক আলোচনা করা হবে এবং তারপর ইন্টারনেট ও তথ্য আহরণ সম্বন্ধে কিছু প্রাথমিক আলোচনা থাকবে।

উদ্দেশ্য ঃ

এই অংশটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- কম্পিউটারের মূল অংশগুলির পরিচিতি।
- তথ্য আহরণের ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের প্রয়োগ।

14.2 কম্পিউটারের অংশ

একটি কম্পিউটারের মূলত তিনটি অংশ থাকে ঃ

(1) ইনপুট ডিভাইস্ (Input device),

(2) প্রসেসিং ইউনিট (Processing unit),

(3) মেমোরী ইউনিট (Memory unit)

(4) আউটপুট ডিভাইস (Output device)

14.2.1 ইন্‌পুট ডিভাইস

তথ্য সরবরাহ করার জন্য যে অংশগুলি ব্যবহৃত হয় তদের সামগ্রিক নাম ইন্‌পুট ডিভাইস। নীচে কতগুলি ইন্‌পুট ডিভাইস সম্বন্ধে আলোচনা করা হল ঃ

(a) কি-বোর্ড ঃ এই অংশটি অনেকটা টাইপরাইটার মেশিনের মতো দেখতে। এর মধ্যে 1–10 সংখ্যা, A – Z অক্ষর এবং কিছু বিশেষ কি (key) বা চাবি রয়েছে। চাবিগুলি কম্পিউটারকে তথ্য সরবরাহ করে। যেমন, 'A' চাবিটি কম্পিউটারকে 'a' এই অক্ষরটিকে বোঝায়, আবার "Shift" + "A" কম্পিউটারকে "A" অক্ষরটি সরবরাহ করে।

(b) মাউস ঃ মাউস একটি হাতে চালিত নির্দেশকারী যন্ত্র, যার সাহায্যে সহজে কম্পিউটার চালনা করা যায়। বিভিন্ন সফ্‌টওয়্যার যা "Graphical User Interface" ব্যবহার করে এবং মেনুভিত্তিক, তাদের ক্ষেত্রে মাউস অত্যন্ত উপকারী একটি যন্ত্র। মাউসের তীর চিহ্নটিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা বাক্স (icon)-এর উপর স্থাপন করার পর ডানদিকে বোতামটি দ্বারা ঐ নির্দেশিকা সম্পন্ন করা যায় (click to excute)।

14.2.2 প্রসেসিং ইউনিট

এই ইউনিটের আরেকটি নাম হল সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU)। এই CPU-এর মূল অংশগুলি হল ঃ

(a) মাইক্রোপ্রসেসর,

(b) রেজিষ্টার,

(c) ম্যাথ কোপ্রসেসর।

(a) মাইক্রোপ্রসেসর ঃ ইন্‌পুট ইউনিট দ্বারা প্রদত্ত নির্দেশ পালন করাই এই অংশের কাজ। এই অংশটি বিভিন্ন ধরনের গণনা, সংখ্যাভিত্তিক তুলনা এবং তথ্য আদান-প্রদান করে। মাইক্রোপ্রসেসরের দুটি মূল অংশ হল ঃ

(i) অ্যারিথমেটিক লজিকাল ইউনিট (ALU)।

(ii) কন্ট্রোল ইউনিট।

(i) **ALU :** এই অংশটি গাণিতিক কাজগুলি করে।

(ii) **কন্ট্রোল ইউনিট ঃ** এই অংশটি কম্পিউটার-এর বাকী অংশগুলিকে চালনা করে।

(b) রেজিষ্টার ঃ মাইক্রোপ্রসেসরের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণের জন্য যে আভ্যন্তরীণ সংরক্ষিত "এলাকা" থাকে তাকে রেজিষ্টার বলে। মাইক্রোপ্রসেসর যে তথ্যই বিশ্লেষণ করুক তা আগে এই অংশগুলিতে সংরক্ষিত হয়। তারপর সেখান থেকে মাইক্রোপ্রসেসরে যায়।

(c) ম্যাথ কোপ্রসেসর ঃ এই অংশটি জটিল গাণিতিক হিসেবের জন্য ব্যবহৃত হয়।

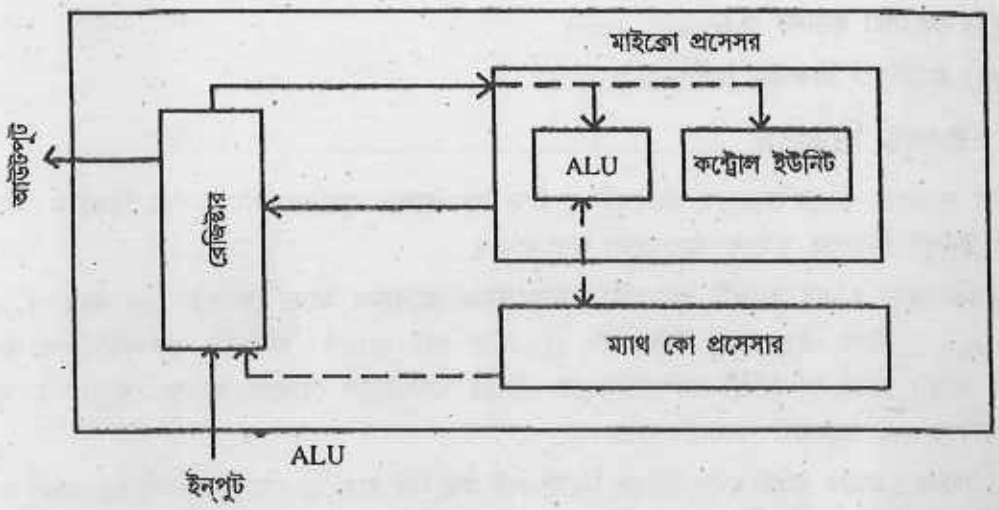

14.2.3 মেমোরী ইউনিট

কম্পিউটারের ব্যবহার্য তথ্য ও নির্দেশিকা সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ "সংরক্ষণ এলাকা" (Storage area) প্রয়োজন। এই সংরক্ষণ এলাকাকে কম্পিউটারের মেমোরী বলে। মেমোরী মূলত তিন রকমের ঃ

(a) মেইন মেমোরী (Main memory)

(b) ক্যাশে মেমোরী (Cache memory)

(c) অক্সিলারী মেমোরী (Auxiliary memory)

(a) **মেইন মেমোরী ঃ** কম্পিউটারর যে অংশটি সরাসরি CPU-এর সঙ্গে সংযোগ করে তাকে মেইন মেমোরী বলে। মেইন মেমোরী মূলত দুই প্রকার ঃ

(i) র‍্যাম (RAM)

(ii) রোম (ROM)

(i) র‍্যাম বা র‍্যান্ডম অ্যাকসেস মেমোরী ঃ

এই মেমোরীতে সংরক্ষিত তথ্য কম্পিউটারের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলে নষ্ট হয়ে যায়।

(ii) রোম বা রীড্ ওনলি মেমোরী (ROM) ঃ

এই অংশের তথ্যগুলি স্থায়ী। এই অংশের তথ্য নষ্ট করা যায় না।

(b) **ক্যাশে মেমোরী ঃ** এই মেমোরী অংশটি খুব দ্রুতগতির ক্ষমতা সম্পন্ন। সাধারণত CPU-এর কাজের গতি মেইন মেমোরী অপেক্ষা দ্রুততর। তাই ক্যাশে মেমোরী থাকলে CPU-কে দ্রুততর গতিতে তথ্য সরবরাহ করে CPU-এর কাজ ত্বরান্বিত করা যায়।

(c) **অক্সিলারী মেমোরী :** মেইন মেমোরী-এর সাহায্যকারী অংশ হিসেবে অক্সিলারী মেমোরী কাজ করে। এই মেমোরী মেন মেমোরী-এর থেকে অনেক বড় কিন্তু ধীরগতিসম্পন্ন। অক্সিলারী মেমোরী অংশ ম্যাগনেটিক ডিস্ক নির্ভর।

ম্যাগনেটিক ডিস্ক মূলত প্লাস্টিক নির্মিত গোলাকৃতি চাকৃতি। এই উপর চৌম্বক পদার্থের প্রলেপ থাকে। যদি ডিস্কের উভয় দিক ব্যবহারযোগ্য হয়, তবে এধরনের ডিস্ককে দ্বিমুখী (Double sided) ডিস্ক বলা হয়। ডিস্কের চৌম্বকীয় পার্শ্বতলের উপর সমকেন্দ্রিক কতগুলি বৃত্তের পরিধি বরাবর তথ্য সংরক্ষিত হয়। এই সমকেন্দ্রিক বৃত্তগুলিকে ট্র্যাক (Track) বলে। ট্র্যাকগুলি আবার কতগুলি ভাগে বিভক্ত হয়। এই ভাগগুলিকে বলে সেক্টর।

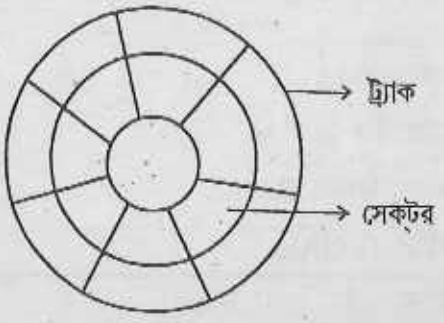

সাধারণত প্রতিটি তলে লেখা বা তথ্য পড়ার জন্য একটি বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রটিকে হেড বলে। ডিস্ক খুব দ্রুত একটি অক্ষের উপর ঘুরতে থাকে। ডিস্কের ট্র্যাকের যে সেক্টরে তথ্য লিখতে হবে তা ঐ অংশটির হেডের মধ্যে সঞ্চিত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ নির্দিষ্ট অংশটি হেডের নিচে আসছে।

হার্ডডিস্ক : একটি অক্ষের উপর অনেকগুলি ডিস্ক লাগিয়ে যে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন মেমোরী তৈরি করা হয় তাকে হার্ডডিস্ক বলে। এটি কম্পিউটারে যুক্ত থাকে এবং একে সহজে খোলা যায় না।

কমপ্যাক্ট ডিস্ক (CD) : একটি ডিস্ক যার ক্ষমতা মাঝারি মানের (600 MB থেকে 750 MB) তাকে কমপ্যাক্ট ডিস্ক বলে। এই ডিস্কের হেড আলাদাভাবে ব্যবহার করতে হয়। এই ডিস্ক কম্পিউটার থেকে খোলা যায়।

ফ্লপি ডিস্ক (Floppy disk) : এটি একটি নিম্ন ক্ষমতাসম্পন্ন ডিস্ক যা কম্পিউটারের ইচ্ছানুযায়ী জোড়া বা খুলে ফেলা যায়।

মেমোরী পরিমাপ :

একটি বিট (Bit) বলতে একটি অক্ষরকে বোঝায়।

1 বাইট = 8 বিট
1024 বাইট = 1 কিলোবাইট (Kb)
1024 কিলোবাইট = 1 মেগাবাইট (Mb)
1024 মেগাবাইট = 1 গিগাবাইট (GD)
1024 গিগাবাইট = 1 টেরাবাইট (Tb).

14.2.4 আউটপুট ডিভাইস

আউটপুট ইউনিট অংশে তথ্য প্রদর্শিত হয়। একটি আউটপুট ডিভাইস হল ভিডিও ডিসপ্লে ইউনিট (Video Display Unit or VDU)।

VDU-এর দুটি অংশ খুব গুরুত্বপূর্ণ ঃ

(a) একটি পর্দা যেখানে তথ্য প্রদর্শিত হয়।

(b) একটি বিশেষভাবে তৈরি সার্কিট বোর্ড যার নাম ভিডিও ডিসপ্লে অ্যাডাপ্টার। এটি কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত থাকে। অনেকসময় একে ভিডিও কার্ড-ও বলা হয়। নীচে কতগুলি অ্যাডাপ্টারের নাম দেওয়া হল ঃ

(i) মেনোক্রোম অ্যাডাপ্টার (MA),

(ii) কালার গ্রাফিক্স অ্যাডাপ্টার (CGA),

(iii) এলহ্যান্স গ্রাফিক্সড অ্যাডাপ্টার (EGA),

(iv) ভিডিও গ্রাফিক অ্যারে (VGA),

(v) সুপার ভিডিও গ্রাফিক অ্যারে (SVGA)।

পর্দায় প্রদর্শিত তথ্যগুলি কতগুলি সূক্ষ্মবিন্দু দিয়ে তৈরি হয়। এই বিন্দুগুলিকে বলে "পিক্সেল"। প্রদর্শনের রেজোলিউশন (Resolution), কতগুলি আনুভূমিক রেখা (স্ক্যান রেখা) এবং রেখাগুলির উপর (উল্লম্বভাবে) অবস্থিত পিক্সেল সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট হয়।

উদাহরণস্বরূপ, রেজোলিউশন 800×600 বলতে বোঝায় প্রদর্শনপর্দায় উপর থেকে নীচে 800টি স্ক্যান রেখা আছে এবং বামদিক থেকে ডানদিকে প্রতিটি রেখার উপর 600 পিক্সেল আছে।

14.3 ইন্টারনেট

ইন্টারনেট বলতে বোঝায় টেলিফোন, অন্তর্বর্তীভাবে যুক্ত বা উপগ্রহের মাধ্যমে যুক্ত কতগুলি কম্পিউটারের সমষ্টিকে। ইন্টারনেটে সংযুক্ত কম্পিউটারগুলি নিজেদের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে।

একটি কম্পিউটারকে ইন্টারনেটে যুক্ত করতে গেলে টেলিফোন লাইন এবং বিশেষ একটি যন্ত্র (মোডেম) প্রয়োজন। এছাড়াও ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযোগকারী সফট্ওয়্যার থাকা আবশ্যিক। ইন্টারনেট সফট্ওয়্যার সরবরাহকারী (Internet Software Provider বা ISP) যে বিশেষ টেলিফোন নাম্বার, ব্যবহারকারীর পরিচিতি নাম এবং সংকেত দেবেন তার সাহায্যে ইন্টারনেটে সংযোগস্থাপন করা যাবে।

14.4 প্রশ্নাবলী

ছোট প্রশ্ন ঃ

(1) প্রসেসিং ইউনিটের কটি অংশ ?

(2) মেইন মেমোরী কত রকমের ?

(3) 1·44 Mb ফ্লফি ডিস্কে কতগুলি বিট সংরক্ষণ করা যাবে ?

(4) অক্সিলারী এবং মেইন মেমোরীর মধ্যে কে বেশি দ্রুততর ?

(5) 1024×780 রেজোলিউশন পর্দায় কতগুলি পিক্সেল আছে।

বড় প্রশ্ন ঃ

(1) কম্পিউটারের দ্রুততর মেমোরীগুলি সম্বন্ধে লিখুন।

(2) মাইক্রোপ্রসেসরের কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(3) ইনপুট ডিজাইস সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে মাউস এবং কি বোর্ডের কার্যের মধ্যে তফাৎ কি লিখুন।

NOTE

মানুষের জন্য ও মানুষে পরিচালিত সংস্থা সঠিকভাবে কতিপয় যে কাজটি চেতনা সৃষ্টিতে আছে, সে কথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু সেই সৃষ্টিধর্মী সাধু সংস্থা আন্তরিক শক্তিকে একেবারেই অবজ্ঞা করিয়া সেবিয়ে বুদ্ধিকে বাদ করিয়া তোলা হয়।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা বৈশিষ্ট্যের ভবিষ্যৎ আছে; সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নতুন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অস্বীকার করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে গুঁড়িয়ে দিতে পারি।

—সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any national support.

—*Subhas Chandra Bose*

Price : Rs. 225.00

(NSOU-র ছাত্রছাত্রীদের কাছে বিক্রয়ের জন্য নয়)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I, Salt Lake, Kolkata-700 064
and Printed at SEVA MUDRAN, 43, Kailash Bose Street, Kolkata-700 006